উৎসর্গ

বঙ্গ সংস্কৃতির বিচিত্র সুন্দর পরিচয় উদ্‌ঘাটনের জন্য যাঁরা
আত্মনিবেদন করেছেন

অধ্যাপক সুবোধ বসুরায়
অধ্যাপক সনৎকুমার মিত্র
ডঃ দুলাল চৌধুরী
শ্রীশিবেন্দু মান্না

নিবেদন

রাঢ় তথা বাঁকুড়া সংস্কৃতি সম্বন্ধে আমাদের প্রথম গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে (তুষু ব্রত ও গীতি সমীক্ষা) কয়েক বছর আগে। বাঁকুড়া সংস্কৃতির অন্য এক মহান 'সূত্রধর' যামিনী রায় সম্বন্ধে গ্রন্থ 'শিল্পী মানুষ যামিনী রায়'ও প্রকাশিত হয়েছে। বর্তমান গ্রন্থে রাঢ় তথা বাঁকুড়া সংস্কৃতির অন্যান্য দিক তুলে ধরার চেষ্টা হয়েছে। দীর্ঘ বারো বছর ধরে যে সব মন্দির দেখেছি বার বার, যে সব গান শুনেছি, যে সব শিল্পনিদর্শন মুগ্ধ করেছে, সেগুলিকেই প্রবন্ধের আকারে দেখাতে ও শোনাতে চেয়েছি। এই দেখা শোনার পালা যে এখানেই শেষ হল তা নয়। আমার দেখা শোনার কাজে, গবেষণার নীতি নিয়মের মধ্যে যাঁদের সাহায্য পেয়েছি তাঁদের সকলকে পুনরায় সকৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ করি। গ্রন্থ প্রকাশের প্রাক্কালে সশ্রদ্ধ প্রণাম জানিয়ে রাখি বাঁকুড়া-প্রেমিক শ্রীযুক্ত অমিয় কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত মাণিকলাল সিংহকে। আর স্মরণ করি সেই কিশোরী মেয়েটিকে, দারুণ খরায় পুড়তে থাকা দ্বারকেশ্বর নদ ও ধূ ধূ মাঠ পার হয়ে যাদের দাওয়ায় উঠে দাঁড়াতে না দাঁড়াতে, যে ছুটে গিয়ে একঘটি জল ও একটু গুড় এনে দিয়ে বাঁচিয়েছিল এই লেখককে। নাম তার জানা হয়নি। কিন্তু তার চোখের সেই ব্যাকুল উদ্বেগ ও সমস্ত হৃদয় দিয়ে সেবা করার ইচ্ছা আমি আজও ভুলতে পারিনি। সে বাড়ীর ভিতর থেকে তার মাকে ডেকে এনেছিল, আমাকে তালাই মেলে দিয়েছিল বসবার জন্য, নিমন্ত্রণ করেছিল দুপুরে তাদের বাড়ীতে খাবার জন্য। কিন্তু আমি বেশিক্ষণ বসতে বা দাঁড়াতে পারিনি। ধরাপাটের পথেই শুধু নয়, বারবার এমন করে অযাচিত স্নেহ সাহায্য ও সেবা যাঁদের কাছে পেয়েছি তাঁরা আমার দ্বিতীয় জন্মস্থান বাঁকুড়ার প্রিয় মানুষ। এই গ্রন্থের প্রতিটি শব্দের সঙ্গে তাঁদের স্মৃতি অক্ষয় হয়ে রইলো। বাঁকুড়ার গ্রাম পথে পথে এমনি করে ঘুরতে ঘুরতে কত মানুষ দেখেছি। এই গ্রন্থ শুধু শুষ্ক প্রবন্ধ গ্রন্থ নয়, মানবতীর্থের পরিচয়ও এর মধ্যে লুকিয়ে আছে। আমাদের এই গ্রন্থ যদি সুধীজনকে, সৌন্দর্য পিপাসু পথিককে, বাঁকুড়ায় টেনে আনতে পারে তবেই আমাদের শ্রম সার্থক হবে।

আমার ছাত্র শ্রীমান দুর্গা দত্ত বিভিন্ন সময়ে ফিল্ড ওয়ার্কের কাজে আমাকে আন্তরিক সাহায্য করেছে, সঙ্গ দিয়েছে। পাণ্ডুলিপি তৈরীর ক্ষেত্রে আমার

সহকর্মী অধ্যাপিকা সুমনা চট্টোপাধ্যায় ও অগ্রজপ্রতিম শ্রীযুক্ত দুঃখভঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় সাহায্য করেছেন। অনুজপ্রতিম অনুপ মাহিন্দারের আন্তরিকতাও স্মরণ্য। প্রবন্ধগুলি পূর্বেই যে সব পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল সেই সব পত্র পত্রিকার সম্পাদক সুহৃদজনকে শ্রদ্ধা জানাই। দেশে বিদেশে আমার যে সব পাঠক/পাঠিকা আছেন তাঁদের সকলেরই সুন্দর জীবন, মঙ্গল ও সুখ কামনা করি।

রবীন্দ্রনাথ সামন্ত

সূচিপত্র

বাঁকুড়ার মাটি মানুষ সংস্কৃতি [এক-একুশ]

পাঠ নির্দেশ

ভ্রম সংশোধন

বাকুড়া জেলার সাধারণ মানুষের মুখের ভাষাকে বলে 'বাকুড়ি' ভাষা। এই ভাষার উচ্চারণ ও ধ্বনিবৈশিষ্ট্য বৈজ্ঞানিক চিহ্নে তুলে ধরার সুযোগ ও সামর্থ আমাদের নেই। তবু যতদূর সম্ভব উচ্চারণ-বৈশিষ্ট্য অটুট রাখার চেষ্টা হয়েছে। তবে 'শিল্পীর হাতের তাস' প্রবন্ধের 'নক্সা' শব্দটি সম্বন্ধে কিছু বলার আছে। বাঁকুড়ায় বলে 'লকস' বা 'নকস'। কথাটি 'নক্সা'র অপভ্রংশ। উচ্চারণ বৈচিত্র্যের মধ্যে না গিয়ে আমরা মূল শব্দটিকেই গ্রহণ করেছি।

অনবধান বশতঃ যে সব বানান ভুল হয়েছে তার জন্য পাঠক সাধারণের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিয়ে একটি সংশোধন তালিকা নিচে দিচ্ছি পৃষ্ঠা-সংখ্যা সহ—

১৭ এ কাড়া বাগালি গেছে। পাতার পোঙাতে। জাতের বোঙার নামে। ২০ এবং বামনে বিস্ময়। ২১ হিরণ্যকশিপুর গাত্রবর্ণ। ২৬ ঐ কাইটা ভালো ভাবে। ৩০ গঞ্জিফা তাদের ১৪৪টি। ৩৯ এলাউ চুল করে নারী গুয়ালে প্রবেশে। গুয়ালের ছাতায় যেবা। উড়া-বসন্ত রোগ। ৪৭ এক গুয়াল গরু ছিল। ৫১ প্রস্তাবনাকে বলে। ৫৫ কামিক্ষির আজ্ঞায়। ৫৯ আমি মধ্য-রাঢ়ের মানুষ,।

মনসামঙ্গলের আসর (রামপুর)
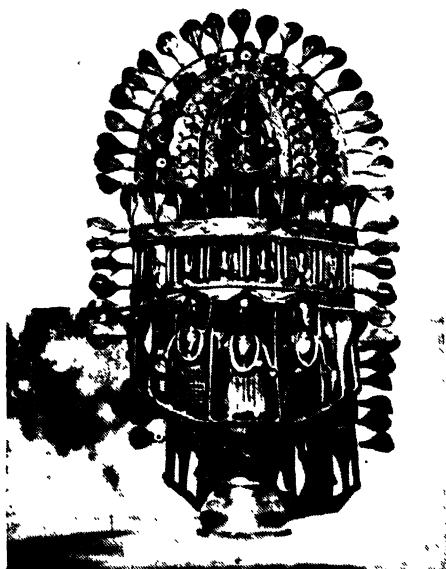
মনসার চালি

নক্সা তাসের পরী

নক্সা তাসের পালোয়ান
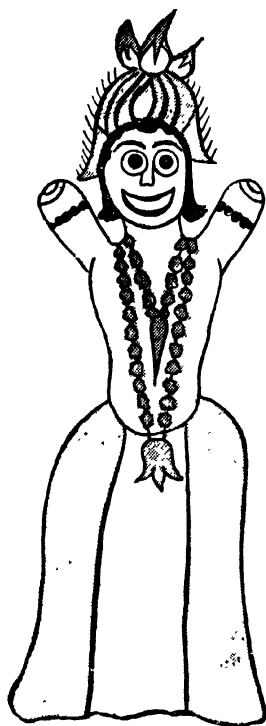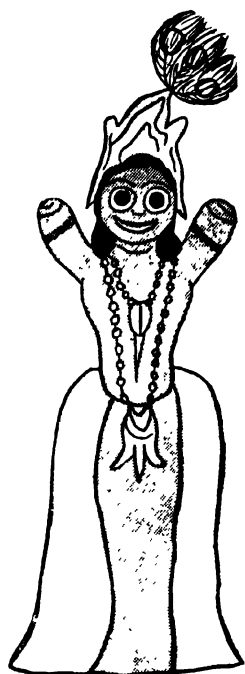
বিষ্ণুপুর মন্দিরগাত্রের পোড়ামাটির কাজ (জোড়বাংলা)
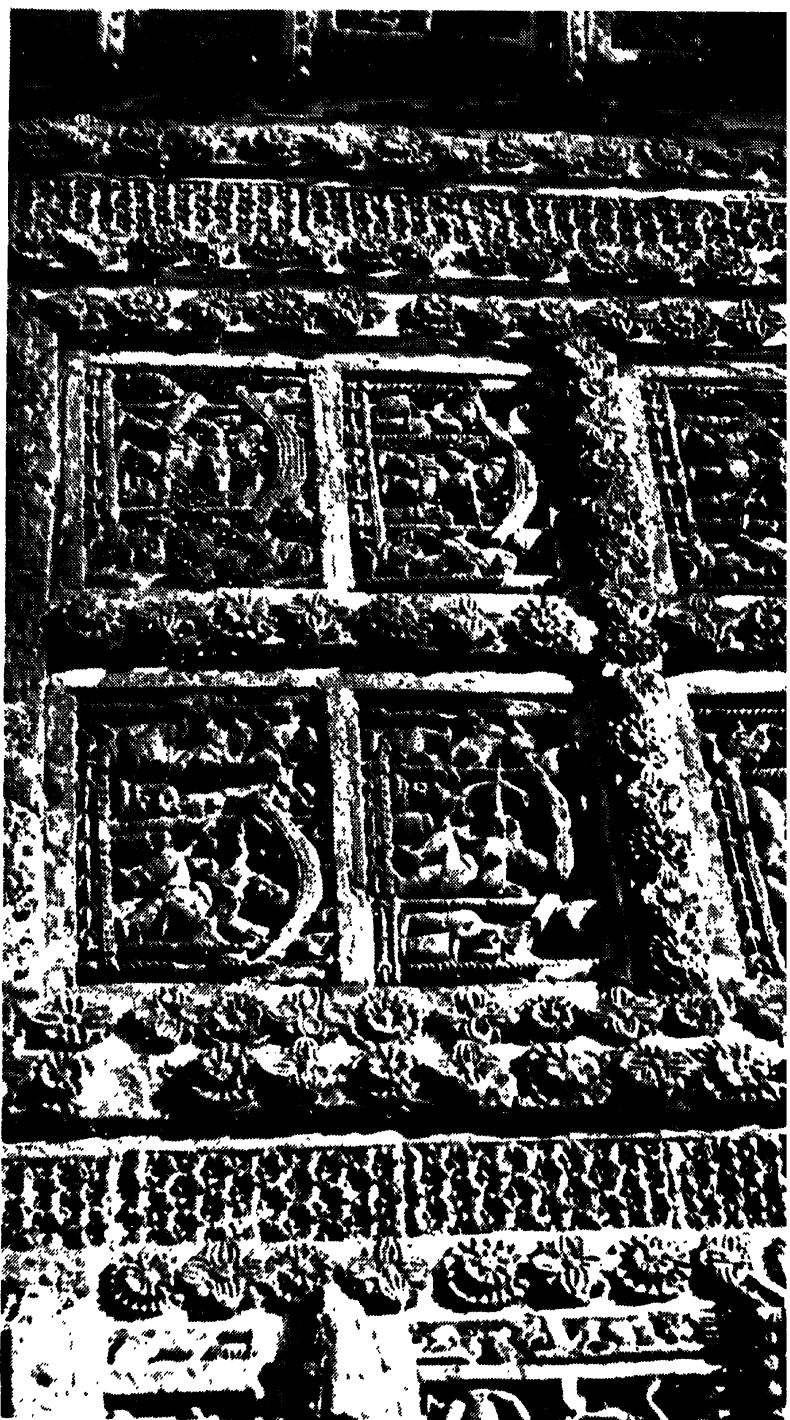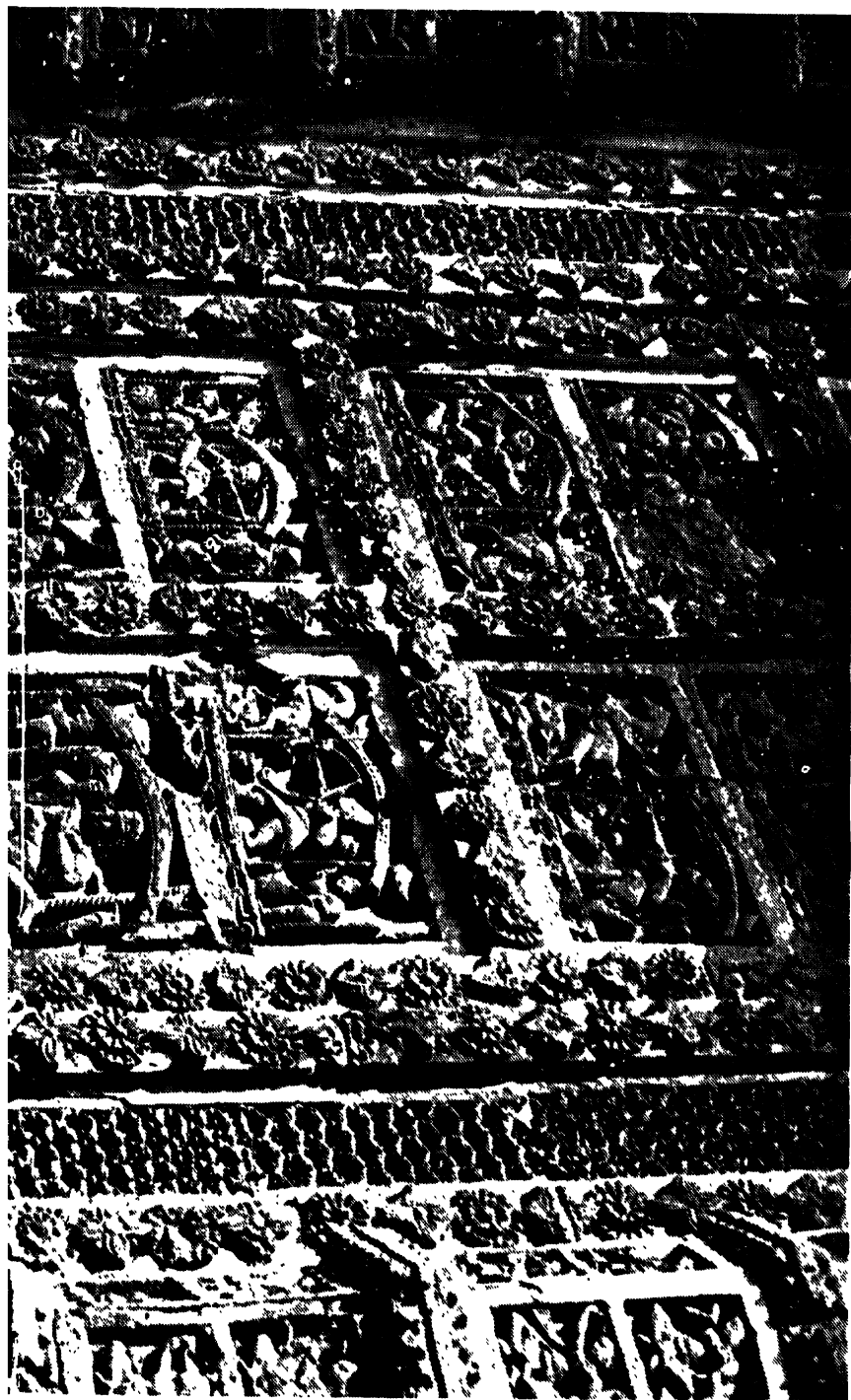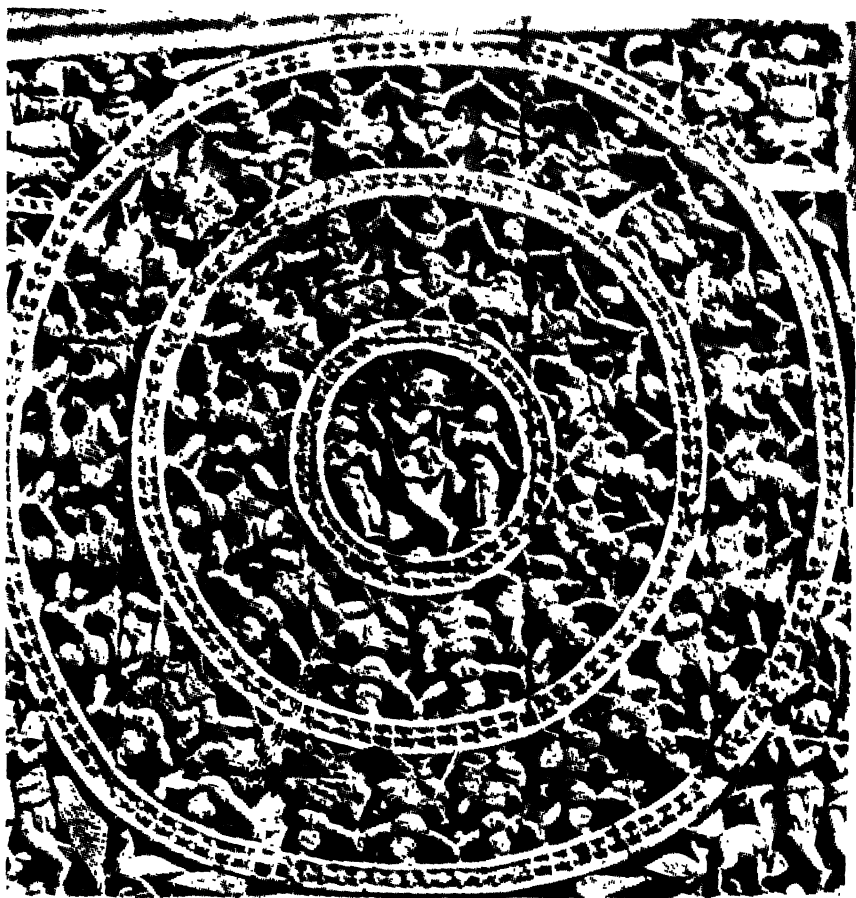
শ্যামরায় মন্দিরের গর্ভগৃহের 'রাসমণ্ডল'

জোড়বাংলা মন্দিরের 'নৌ-অভিযান'

বেলেতোড়ের পটেরি পাড়ায় লেখক
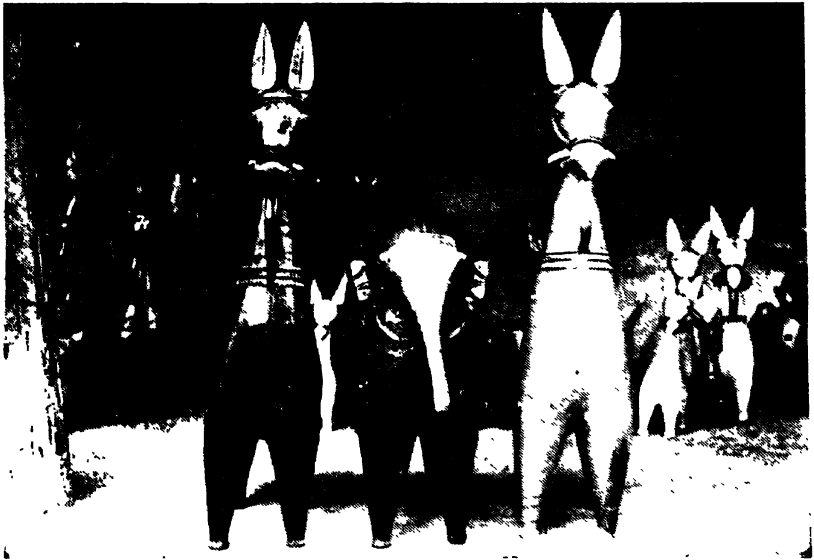
পাঁচমুড়ার মৃৎশিল্পের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন

সোনাতোপলের মৃত মন্দির
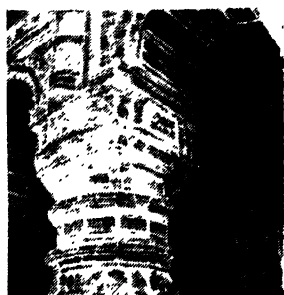
কারুকার্যময় মন্দিরস্তম্ভ

অযোধ্যার দশহরা উৎসব

কথারম্ভ

বাঁকুড়ার মাটি মানুষ সংস্কৃতি

জীবনকে সম্পূর্ণ করে পাবার আগ্রহেই সভ্যতার অগ্রগতি, সংস্কৃতির জন্ম। সংস্কৃতি ও সভ্যতার বৈশিষ্ট্যগুলি গড়ে ওঠে মাটির সঙ্গে লগ্ন পরিবেশ ও আবহাওয়ার প্রভাবে। যেমন মাটি তেমনি তার মানুষ, তার সংস্কৃতি। মানুষ মাটির কাছ থেকে পায় তার প্রাণরস, সেই প্রাণরসের বিচিত্র সঞ্চয় তার সংস্কৃতিতে। তাই সে আনন্দে আনত হয়ে বলে—'ও আমার দেশের মাটি তোমার পরে ঠেকাই মাথা'। যুগে যুগে ঐ একই কথা বলে।

বাঁকুড়া জেলার অবস্থান মধ্যরাঢ়ে। গঙ্গার পশ্চিম উপকূল থেকে মানভূমের কোল পর্যন্ত রাঢ় অঞ্চলের বিস্তার। এই বিস্তৃত রাঢ় অঞ্চলের মাটির প্রকৃতি ও পরিচয় এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে ভিন্নতর হয়ে গেছে। এক প্রান্তে পলি সঞ্চিত উর্বর শস্যশ্যামলিমা, অন্যদিকে রুক্ষ শুষ্ক খরাপীড়িত ধূসরতা। বাঁকুড়া জেলার মোট আয়তন ৬৮৮১ কিলোমিটার। এই জেলার ভৌগোলিক অবস্থান —২২°৩৮′—২৩°৩৮′ উত্তর অক্ষরেখা এবং ৮৬°৩৬′—৮৭°৪৬′ পূর্ব দ্রাঘিমারেখার মধ্যস্থলে। জেলাটি দেখতে প্রায় ত্রিভুজাকৃতি। এই জেলার উত্তরে ও উত্তর-পূর্বে বর্ধমান, দক্ষিণ-পূর্বে হুগলী, দক্ষিণ-পশ্চিমে মেদিনীপুর ও পুরুলিয়া জেলা। ভূপ্রকৃতির বৈশিষ্ট্য এই জেলাটিকে মোটামুটি তিন ভাগে ভাগ করেছে। এক. উত্তর পশ্চিমের পার্ব্বত্য অঞ্চল—যে ভূমিভাগ ছোটনাগপুরের মালভূমির অন্তর্গত। এই অঞ্চলেই আছে ৪৪০ মিটার উচ্চতা বিশিষ্ট শুশুনিয়া পাহাড় এবং ৪৪৮ মিটার উচ্চতাবিশিষ্ট বিহারীনাথ পাহাড়। দুই. জেলার মধ্যবর্তী ভূমি ভাগ বন্ধুর উচ্চাবচ, ল্যাটারাইট পাথর দিয়ে গড়া, উপত্যকা সমন্বিত। তিন. পূর্বদিকের বিষ্ণুপুর—বিশেষ করে—বর্ধমান প্রান্তিক দামোদর অধ্যুষিত অঞ্চল পলিমাটির দ্বারা গঠিত নিম্ন গাঙ্গেয় সমভূমির অন্তর্গত। অন্যভাবে বলা যায়, লাল কাঁকুরে মাটি, 'নৈহলিক' পলমাটি ও দামোদর সমভূমি—এই তিন প্রকার মৃত্তিকা স্তরের দ্বারা বাঁকুড়া জেলার অঙ্গ গঠিত হয়েছে। ইতিহাস নির্ভর বৈজ্ঞানিক সমীক্ষা অনুযায়ী "জেলাটির পশ্চিমাংশে প্রাচীন আর্কিয়ান যুগের নীস

বা শিষ্ট শিলা দেখা যায়। উত্তরাংশে এঁটেল মাটি ও অন্যত্র বেলেমাটি ও ল্যাটারাইট শ্রেণীর কাঁকরযুক্ত লাল মাটি দেখা যায়।"

বাঁকুড়া জেলার আবহাওয়া শুষ্ক ও উষ্ণ এই জেলার জলবায়ুর বৈশিষ্ট্য —গ্রীষ্মকালে অত্যধিক গরম, মাঝামাঝি রকমের বৃষ্টিপাত এবং সংক্ষিপ্ত শীতকাল। গ্রীষ্মকালে সর্ব্বোচ্চ তাপমাত্রার গড় ৪৭° সেন্টিগ্রেড এবং শীতকালে সর্ব্বনিম্ন গড় তাপমাত্রা ১২° সেন্টিগ্রেড। বার্ষিক বৃষ্টিপাতের গড় ১৩০৪ মিঃ মিটার। এই বর্ষণের সবটাই প্রায় জুন থেকে সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যে হয়ে থাকে।

বাংলাদেশ নদীমাতৃক। বাঁকুড়াকেও সেই অর্থে নদীমাতৃক বলতে হয়। কিন্তু বাঁকুড়া জেলার সব নদীই মাতার মত জনপদ ও জনজীবনকে লালন করে না। এই জেলার অধিকাংশ নদীই বর্ষাকালীন জলরেখা ছাড়া বৎসরের অধিকাংশ সময়েই শুষ্ক থাকে। এখানে নদীগুলির শুষ্কতা বর্তমানে যতখানি প্রকট অতীতে অবশ্য ততখানি ছিল না। দামোদর, দ্বারকেশ্বর, গন্ধেশ্বরী, বোদাই, বিড়াই, শিলাবতী, কংসাবতী, ভৈরববাঁকী, তারাফেনী, জয়পাণ্ডা, আমোদর, অর্কশা, ডাংরা, ধনকোড়া, কুমারী, রেবাই, শালী প্রভৃতি ছোটবড় নদনদী বাঁকুড়া জেলার নদীনাম তালিকার অন্তর্গত। তার মধ্যে দামোদর, দ্বারকেশ্বর, কংসাবতী ও শিলাবতীই প্রধান।

দ্বারকেশ্বর নদ পুরুলিয়া থেকে বাঁকুড়া জেলায় প্রবেশ করেছে ছাতনা থানার দামূদা গ্রাম দিয়ে। তারপর ওন্দা বিষ্ণুপুর কোতলপুরকে স্পর্শ করে প্রবেশ করেছে হুগলী জেলায়। বাঁকুড়ায় এই নদীর গতিপথের দৈর্ঘ্য ১০৭ মি. মি.। দামোদর নদ প্রবাহিত হয়েছে বাঁকুড়ার উত্তর সীমা ধরে। বিহারের রামগড় অঞ্চল থেকে বার হয়েছে এই নদ। বাঁকুড়ায় প্রবেশ করেছে শালতোড়া থানায়। তারপর মেজিয়া, বড়জোড়া, সোনামুখী, পাত্রসায়ের ও ইন্দাস থানার সীমা চিহ্নিত করে ৯০ কি. মি. প্রবাহিত হয়েছে। অবশেষে বর্ধমান জেলায় প্রবেশ করেছে। বাঁকুড়ার অন্তর্গত শুশুনিয়া পাহাড়ের নিকটে গন্ধেশ্বরী নদীর উৎপত্তিস্থল। এই নদীটি পূর্ববাহিনী এবং দৈর্ঘ্য ৩২ কি. মি.। দ্বারকেশ্বর নদটির সঙ্গে গন্ধেশ্বরী মিলিত হয়েছে তপোবন নামক স্থানের সন্নিকটে, তপোবন বাঁকুড়া শহরের একপার্শ্বে অবস্থিত।

দ্বারকেশ্বরের উপনদী বিড়াই—ব্রীড়াবতী। শালী ও বোদাই নামক নদী দুটি দামোদরের উপনদী। শিলাই বা শিলাবতী নদী পুরুলিয়া থেকে উৎপন্ন হয়ে বাঁকুড়া জেলায় প্রবেশ করেছে ইন্দপুর থানায়। কংসাবতী বা কাঁসাই বাঁকুড়ার আর একটি বড় নদী। পুরুলিয়া থেকে এসে বাঁকুড়ায় প্রবেশ করেছে খাতড়া

থানায়। তারপর রাইপুর অতিক্রম করে মেদিনীপুরে প্রবেশ করেছে। আমোদর নামক ক্ষুদ্র নদটির জন্ম জয়পুর থানায়। নদটি ২৭ কি. মি. দীর্ঘ। জয়পাণ্ডা নদী শিলাবতী নদীর প্রধান উপনদী। কুমারী নামক নদীটি অম্বিকা নগরের কাছে কংসাবতীতে মিশেছে।

এই জেলার মাত্র দুটি নদী নদী-প্রকল্পের অন্তর্গত হয়েছে—দামোদর ও কংসাবতী। দামোদর নদের উপর দুর্গাপুর জলাধার আর কংসাবতী নদীর উপর মুকুটমণিপুর জলাধার এই জেলার অল্প অংশই কৃষিসেচে সাহায্য করে। সেচ সহায়ক অনেকগুলি পুরানো খালও এই জেলায় আছে। যেমন শুভংকর দাঁড়া, আমজোড়, বাঁকাজোড, কালিঘাটা, পুরন্দর, মেজিয়া বিল, অসুর পাঁজ, চাঁপাখাল প্রভৃতি। তালবেড়িয়া, বসরাজোড়, জুনকুড়িয়া, দিগরকানালিও স্মরণীয়। আর সারা বাঁকুড়া জেলা জুড়ে ছড়িয়ে আছে অজস্র 'বাঁধ'। 'বাঁধ' অর্থ সুবৃহৎ জলাশয়। প্রাচীনকাল থেকেই উচ্চাবচ ও উপত্যকাময় বাঁকুড়া জেলার নানা স্থানে বাঁধ নির্মাণ করে বর্ষার জল ধরে রাখার চেষ্টা হয়েছে। এই জলাধারগুলিই এখানে 'বাঁধ' নামে খ্যাত। শুধু মল্ল রাজধানী বিষ্ণুপুরেই এই রকম একাধিক সুবৃহৎ বাঁধ আছে। যেমন—লাল বাঁধ, যমুনাবাঁধ, পোকা বাঁধ, শ্যামবাঁধ প্রভৃতি।

বাঁকুড়া জেলা এককালে 'জঙ্গলমহল' নামক খ্যাত অঞ্চলের অন্তর্গত ছিল। জঙ্গলমহলের স্মৃতি আজও জাগরুক আছে। ঝাড়খণ্ড থেকে আরম্ভ করে বীরভূম বর্ধমান পর্যন্ত বনভূমির একটানা অস্তিত্ব অবশ্য আজ আর নেই। বাঁকুড়া জেলায় মোট ভূমিভাগের ২০ শতাংশ বনাঞ্চল। এই বনাঞ্চল তেরটি 'রেঞ্জে' বিভক্ত। যথা—বাঁকুড়া, বিষ্ণুপুর, জয়পুর, সোনামুখী, বেলিয়াতোড়, সারেঙ্গা, গঙ্গাজলঘাটি, রাণীবাঁধ, মটগোদা, খাতড়া, ইন্দপুর, তালডাংরা, শালতোড়া প্রভৃতি। শালই প্রধান বনবৃক্ষ। তাছাড়া আছে পলাশ, পরসি, ভঁডক, সিধা, মহুয়া, ভালাই, সুচাকুলতা, কেঁদ, পিয়াশাল, বয়ড়া, আশন, মুর্গা, শিমুল, অর্জুন, আমলকী, বাবলা, নিম, কদম, সেগুন প্রভৃতি। জেলার খরাপ্রবণ ভূমিভাগে আম, জাম, কাঁঠাল, খেজুর, তাল, বাঁশ প্রভৃতিও লক্ষণীয় বৃক্ষ। ইদানীং শিশু, আকাশমণি, ইউক্যালিপটাস প্রভৃতি গাছও প্রচুর জন্মাচ্ছে।

বাঁকুড়ার বনাঞ্চলে ও পাহাড় অঞ্চলে বন্যপ্রাণীর আধিক্য না থাকলেও চিতাবাঘ, নেকড়ে, হায়না, চিতাবিড়াল, ভালুক, বন্যশূকর, বন্যকুকুর, হাতি,

হরিণ প্রভৃতি দেখা যায়। রাণীবাঁধ ঝিলিমিলি অঞ্চলে প্রায় প্রতি বছর বন্য হাতির পাল আসে। পার্শ্ববর্তী ময়ূরভঞ্জ থেকে আসে। এছাড়াও আছে গৃহপালিত মহিষ, গরু, বিড়াল, ছাগল, শূকর প্রভৃতি। পাখীদের মধ্যে সাধারণ সব রকম পাখীই এখানে দেখা যায়। তাছাড়া সোনামুখীর জঙ্গলে ময়ূর দেখা যায়। বর্তমানে কংসাবতী জলাধারে বিদেশাগত পরিযায়ী পাখীদের দেখা যাচ্ছে শীতকালে।

দুই.

জেলার নাম বাঁকুড়া। বাঁকুড়া জেলার পত্তন হয়েছে মাত্র একশ' বছর আগে। ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দ বাঁকুড়া জেলার শতবর্ষ পূর্তি বৎসর। একশ বছর আগে এই জেলার নাম ছিল পশ্চিম বর্ধমান। ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে বাঁকুড়া শহরের নামে জেলাটির নামকরণ করা হয়। বাঁকুড়া বর্তমানে জেলার সদর শহর। মল্ল রাজাদের আমলে বা মধ্যযুগে এই জেলা প্রধানতঃ মল্লভূম, সামন্তভূম নামে পরিচিত ছিল। বাঁকুড়া জেলার প্রায় সমস্ত অংশ, বীরভূম ও মেদিনীপুর ও পুরুলিয়ার অংশ বিশেষ ছিল 'জঙ্গলমহল'। জঙ্গলমহল বিস্তৃত ছিল ছোটনাগপুর পর্যন্ত।

'বাঁকুড়া' নামকরণ বিষয়ে নানা পণ্ডিতের নানা মত। লৌকিক দেবতা বা ধর্মঠাকুর 'বাঁকুড়া রায়' নামক দেবতার নামে নাম হয়েছে বাঁকুড়া। মল্লরাজ বীর হাম্বিরের এক পুত্রের নাম ছিল বাঁকুড়া। তাঁর অধীনে পড়েছিল যে অঞ্চল সেই অঞ্চলের নাম রাখা হয় বাঁকুড়া—এমন মতও শোনা যায়। স্থানীয় সর্দার বঙ্কু রায়ের নামানুসারে 'বাঁকুড়া'—এ মতও কেউ কেউ পোষণ করেছেন। আর একটি মত স্মরণীয়—সদর শহরের সন্নিকটে বিখ্যাত এক্তেশ্বর নামক মন্দিরের অভ্যন্তরস্থ এক্তেশ্বর শিবলিঙ্গটি বাঁকাভাবে অবস্থিত, তার জন্য এ স্থানের নাম বাঁকুড়া।

ভাষাতাত্ত্বিক বিচারও করা হয়েছে। বাঁকু+ডা=বাঁকুডা। বক্র>বাঁকা> বাঁকু। শ্রেষ্ঠ অর্থে অথবা সংরক্ষিত স্থানার্থে 'ডা'। বৃহৎ অর্থেও 'ডা'। কোল অথবা মুণ্ডা ভাষায় 'ওড়া' বা 'ড়া' শব্দের অর্থ বাড়ী অথবা বাড়ীর সমষ্টি। অন্য ভাবেও বিচার বিশ্লেষণ করা হয়েছে—"বাঁকুড়া অনার্য ভাষার শব্দ নয়। সংস্কৃত 'বক্র' শোক থেকে উৎপন্ন 'বঙ্ক' 'বঙ্কিম' (স্বতোনাসিকাভবন) আদরার্থক উ-প্রত্যয় যোগে 'বাঁকু' অর্থ শ্রীকৃষ্ণ। মধ্য ভারতীয় আর্য ভাষায় স্বার্থিক ট—টক প্রত্যয় থেকে জাত 'ড়া' প্রত্যয় যোগে বাঁকুড়া শব্দের উৎপত্তি।"

বাঁকুড়া শহরের ভৌগলিক অবস্থানের দিকে দৃষ্টি দিয়ে নামকরণের তাৎপর্যটি কেউ কেউ বিশ্লেষণ করতে চেয়েছেন। বাঁকুড়া শহরটি ব-দ্বীপ বিশেষ। দ্বারকেশ্বর ও গন্ধেশ্বরী—এই দুটি নদীর সঙ্গমস্থলে বাঁকুড়া শহরটি অবস্থিত। এককালে এই শহরের ভূমিভাগ ছিল জলাভূমি। উক্ত দুই নদীর পলিসঞ্চয়ে ধীরে ধীরে জেগে উঠেছে উচ্চ স্থলভূমি। নদীর বাঁকের চরভূমি এবং চাষের বড় খণ্ডের জমিকে 'বাকুড়ি' বলে। আদিবাসীদের উচ্চারণে 'বাকুড়ি' হয়েছে 'বাঁকুড়ি', তার থেকে এসেছে বাঁকুড়ি বা বাঁকুড়া। নদীর 'বাঁক' থেকেও 'বাঁকুড়া' শব্দটি আসতে পারে। একদিকে রাজগ্রাম, অন্যদিকে এক্তেশ্বর—এর মধ্য দিয়ে প্রবাহিত দ্বারকেশ্বর নদের বাঁকে বাঁকুড়া শহরের অবস্থান। নদীর বাঁকের 'বাঁক' এবং 'ওড়া' (বাসস্থান বা গৃহসমষ্টি অর্থে) মিলে 'বাঁকুড়া'।

তিন.

বাঁকুড়া জেলা রাঢ় অঞ্চলের মধ্যমণি। নানা সংস্কৃতির মিলনক্ষেত্র এই মধ্য রাঢ়। বেদ পুরাণ কথিত অসুর জাতিদের বাসস্থান এই রাঢ় অঞ্চল। এই জেলাতেও প্রাগৈতিহাসিক সভ্যতার নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে। আবিষ্কৃত হয়েছে শুশুনিয়া পাহাড় অঞ্চলে, ছান্দাড় অঞ্চলে।

অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, সৌরাষ্ট্র, মগধ—এই সব স্থাননাম বিভাগের আগে-পরে আরও নামবিভাগ ঘটেছে। যথা—পুণ্ড্র, বঙ্গ, রাঢ়, সুহ্ম প্রভৃতি। সাধারণ ভাবে বলা যায়, গঙ্গা নদীর পশ্চিম ও দক্ষিণ অংশ রাঢ়। অবিভক্ত বাংলার উত্তর ভাগের নাম পুণ্ড্র, বরেন্দ্র ও গৌড়। আর পূর্ব্ব অংশে ছিল বঙ্গ, বঙ্গাল, হরিকেল, সমতট প্রভৃতি নামবিভাগ। রাঢ় অঞ্চল বিভক্ত হয়েছিল—দুই ভাগে —বজ্জভূমি ও সুব্বভূমি। বজ্জভূমি অর্থাৎ বজ্রভূমি, পাথুরে মাটির দেশ। এই অনার্য অধ্যুষিত রাঢ় অঞ্চলে আর্যীকরণের দ্বারা ধীরে ধীরে কয়েক শতাব্দী ধরে যে সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে তা মূলতঃ যৌথ সংস্কৃতি বা মিশ্র সংস্কৃতি। এখানে লোক সংস্কৃতি বা অভিজাত সংস্কৃতি নামক কোন অচল-অচল পৃথক সংস্কৃতি নেই। এই ভাবেই যারা পরাজিত হয়েছিল অতীত কালে, রাষ্ট্রিক বা সামাজিক কারণে, তারাই জয়ী হয়েছে এক নবসংস্কৃতির সৃষ্টিবিশ্বে। রাঢ় তথা বাঁকুড়া সাংস্কৃতিক অভিনবত্বে আজও প্রাণবন্ত। বাঁকুড়ায় সেই আদি অভিনবত্ব এখনো বহুল পরিমাণে অটুট আছে, কারণ এই রাঙামাটির দেশে, মাকড়া পাথরের দেশে,

শাল মহুলের দেশে, দুরন্ত যান্ত্রিক সভ্যতার স্পর্শ আজও তেমন করে ঘটেনি।

অবশ্য একথা কখনই বলা যায় না যে বাঁকুড়া জেলার ত্রিভুজাকৃতি সীমানার মধ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ একটি সংস্কৃতিধারা গড়ে উঠেছিল। বাঁকুড়ার সংস্কৃতি মূলতঃ মধ্য রাঢ়ের সংস্কৃতি। বাঁকুড়া সংস্কৃতির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী মিল তাই পুরুলিয়া বীরভূম ও মেদিনীপুর জেলার সংস্কৃতির। অবশ্য এও সত্য, নিছক বাঁকুড়া জেলার আয়তনের সীমারেখার মধ্যে সংস্কৃতি পরিচয় অন্বেষণের একটি সানন্দ সংযত সার্থকতা আছে। তা খণ্ড হলেও অখণ্ড মহিমায় মহিমান্বিত।

ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার মশায় বলেছেন—"বহু প্রাচীন প্রাগৈতিহাসিক যুগেও যে বাংলায় মনুষ্যের বসতি ছিল প্রত্নপ্রস্তর, নব্যপ্রস্তর এবং তাম্রযুগের অস্ত্র-শস্ত্র হইতে তাহা জানা যায়। সম্ভবতঃ কোল, শবর, পুলিন্দ, হাড়ি, ডোম, চণ্ডাল প্রভৃতি জাতির পূর্বপুরুষেরাই ছিল বাংলার আদিম অধিবাসী। ইহাদের সাধারণ সংজ্ঞা—নিষাদ জাতি। ইহারা প্রধানতঃ কৃষিকার্য দ্বারা জীবনধারণ করিত। আরও কয়েকটি জাতি বঙ্গদেশে বাস করিত—ইহাদের ভাষা ছিল দ্রাবিড় ও ব্রহ্মতিব্বতীয়। ইহাদের পরে অপেক্ষাকৃত উন্নততর সভ্যতার অধিকারী একশ্রেণীর লোক বাংলাদেশে বাস করে। ইহাদের সহিত পরবর্তী-কালে আর্যদের মিশ্রণের ফলেই বর্তমান বাঙালী জাতির উৎপত্তি হইয়াছে, ইহাই প্রচলিত মত। মস্তিষ্কের গঠন প্রণালী অনুসারে বিচার করিয়া দেখা গিয়াছে যে বাংলার সকল শ্রেণীর হিন্দুরাই প্রশস্ত শির (Brachycephalic) কিন্তু আর্যাবর্তের অন্যান্য হিন্দুগণ দীর্ঘশির (Dolechocephalic)"। অন্য-দিকে, কেবল মাত্র বাঁকুড়া জেলার প্রত্নতাত্ত্বিক ঐতিহ্য ধারার বিবরণ দিতে গিয়ে শ্রীযুক্ত মাণিকলাল সিংহ বলেন—"ঐতিহাসিক যুগে মহাবীরের চরণ চিহ্ন অনুসরণ করিয়া আর্য সংস্কৃতি জৈন ধর্মের বাহনে এই রাঢ়ভূমিতে প্রবেশ করিয়া সার্ধ-দ্বিসহস্র বৎসর ধরিয়া জোয়ার ভাটার নিয়মে এ জেলার সংস্কৃতি ক্ষেত্রকে প্লাবিত করিয়াছে। কিন্তু তাহারও পূর্বে মানব সংস্কৃতির ঊষা লগ্নের অস্ফুট আলোকে, মানবের অস্ফুট কাকলিতে বাঁকুড়ার বৃদ্ধভূমি যে একদিন জাগিয়া উঠিয়াছিল তাহার প্রমাণ সারা জেলায়, বিশেষতঃ কাঁসাই, কুমারী আর দ্বারকেশ্বরের উপত্যকায় মুদ্রিত, শুশুনিয়ার বয়োপ্রাচীন প্রস্তর-পঞ্জরে উদ্গত এবং রাঢ়ের উপভাষায় প্রতিধ্বনিত। মানবের আদিমতম জীবন সংগ্রামের প্রযত্ন প্রয়াসের সুস্পষ্ট চিহ্ন জেলার কাঁসাই, দ্বারকেশ্বর উপত্যকার হাজার হাজার প্রত্নাশ্মর, ক্ষুদ্রাশ্মর আয়ুধে বর্তমান।"

হরপ্পার পূর্ববর্তী বা সমসাময়িক কালে বাঁকুড়া-মেদিনীপুর-পুরুলিয়ায় যে এক অনার্য সভ্যতার উদ্ভব হয়েছিল তা আজ আর অস্বীকার করা যায় না। ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দ থেকে খোঁড়াখুঁড়ি করে বাঁকুড়া জেলার বিভিন্ন স্থানে প্রস্তর নির্মিত নানাবিধ আয়ুধ, কুঠার, কর্তরী, পাষাণচক্র, ছেদক প্রভৃতি আবিষ্কৃত হয়েছে লক্ষণীয় পরিমাণে। Copper Hoard Culture বা তাম্রাশ্ম যুগের আয়ুধ-নিদর্শন প্রভূত পরিমাণে পাওয়া গেছে বাঁকুড়া জেলার সীমান্তবর্তী মেদিনীপুরের অন্তর্গত গড়বেতা থানার আগুইবনী গ্রামে। ঐ ধরণের নিদর্শন বাঁকুড়ার জামবেদা বা ভূতশহর নিকটবর্তী অডরা গ্রাম থেকেও পাওয়া গেছে। বাঁকুড়ার ডিহর গ্রামে পাওয়া গেছে তামার মালাদানা, পিতলের বালা, চুড়ি, আংটি, কৃষ্ণ ও লোহিত কৌলাল প্রভৃতি। মৎস্যজীবী শিকারী মানুষের বাসস্থান হিসাবে এই অঞ্চলকে চিহ্নিত করেছে এই সব নিদর্শন। দক্ষিণ ভারত থেকে আগত এই সব মানুষেরা প্রাগৈতিহাসিক যুগেই হয়তো দ্বারকেশ্বর কাঁসাই শিলাই দামোদর অধ্যুষিত অঞ্চলে বসতি স্থাপন করেছিল। আজও এই সব অঞ্চলে লায়েক, খয়রা, মাঝি বাগদী, কেঅট, ধীবর প্রভৃতি জাতির মানুষের প্রাচুর্য লক্ষ্য করা যায়।

জৈন তীর্থংকর মহাবীর 'কেবলজ্ঞান' লাভ করবার পূর্বে কিছুদিন প্রাচ্য-দেশের শুব্বভূমি, লাঢ় ও বজ্জভূমি প্রভৃতি অঞ্চলে পরিভ্রমণ করেছিলেন। রাঢ় অঞ্চলের অধিবাসীরা ছিল রূঢ় স্বভাব। তারা জৈন মহাবীরের দিকে কুকুর লেলিয়ে দিয়েছিল। মহাবীরের আবির্ভাব কাল খৃষ্টপূর্ব ৫৪০-৪৬৮ অব্দ। জৈন মহাগ্রন্থ 'আচারঙ্গ সুত্ত' অনুযায়ী বলা যায়, আজ থেকে আড়াই হাজার বছর আগে আর্য সভ্যতা রাঢ অঞ্চলে প্রবেশাধিকার না পেলেও ধীরে ধীরে প্রতিকূলতা অতিক্রম করে পরবর্তীকালে প্রথম আর্য-প্রতিভূ জৈন তীর্থংকরদের প্রচার কার্য এই অঞ্চলে সফল হয়েছিল। রাঢ ভূখণ্ডে এই জৈন প্রভাব অষ্টম নবম শতাব্দী পর্যন্ত অটুট ছিল। বাঁকুড়া জেলায় জৈন ধর্মের জীবন্ত প্রভাব প্রতিক্রিয়া ছিল প্রায় দেড় হাজার বছর। বাঁকুড়া জেলার অদূরবর্তী পরেশনাথ পাহাড় ছিল জৈন সাধকদের 'সমেত শিখর'। এই পাহাড়ের বিভিন্ন চূড়ায় ধ্যানরত প্রায় ২০ জন জৈন তীর্থংকর সিদ্ধিলাভ করেন। তাঁরা তারপর ধর্মপ্রচার মানসে দামোদর, কংসাবতী, দ্বারকেশ্বর, শীলাবতী প্রভৃতি নদীপথে নেমে আসেন রাঢ় অঞ্চলের মধ্যমণি বাঁকুড়া জেলাতেও। এই সব নদীতীরে জৈন তীর্থের, জৈন অধ্যুষণের প্রত্নচিহ্নগুলি আজও অজস্র পরিমাণে বিদ্যমান। রেখ দেউলে, শিলামূর্তিতে সেই

চিহ্ন চিনে নিতে কোন চেষ্টার প্রয়োজন হয় না, জৈন প্রত্নপ্রাচুর্য এত অধিক। বাঁকুড়া জেলার একেশ্বর, বহুলাড়া, ধরাপাট, হাড়মাসড়া, অম্বিকানগর, চিৎগিরি, চেয়াদা, বরকোনা, কেন্দুয়া, দেউলভিড়া, গোকুল, পরেশনাথ. শালতোড়া, ওন্দা, ইন্দপুর, কেচন্দা প্রভৃতি গ্রামে জৈন অধ্যুষণের প্রমাণ চিহ্নগুলি সংখ্যাতীত প্রাচুর্যে বিদ্যমান। ইন্দপুর থানার ভালাইডিহা গ্রামে খনন কার্যের মাধ্যমে যে আবিষ্কার সম্ভব হয়েছে তাও জৈন সংস্কৃতির প্রমাণ বহন করছে। শালতোড়া গ্রামের সন্নিকটে 'শরাবক' বা 'সরাক' শ্রেণীর মানুষের বাস। শ্রাবক>শরাবক >সরাকরা জৈন। বাঁকুড়া জেলা জুড়ে বহু জৈন মূর্তি বাবা ভৈরব, কাল ভৈরব, বাঘাহট বোঙা থাঁদারাণী, মনসা, এমন কি কালীমূর্তি রূপেও পূজিত হচ্ছেন।

জৈন ধর্ম-সংস্কৃতির নিদর্শনের প্রাচুর্যের তুলনায় বাঁকুড়ায় বৌদ্ধ ধর্ম সংস্কৃতির চিহ্ন নিতান্তই অল্প। বিশুদ্ধ বৌদ্ধ মূর্তি, বৌদ্ধ ভাস্কর্য ও বৌদ্ধ পুরাকীর্তির এই স্বল্পতা বিস্ময় জাগায়। হীনযান, মহাযান, বজ্রযান প্রভৃতি বৌদ্ধধর্মের পরিবর্তনের ধারাটি কি ভাবে হিন্দু-ব্রাহ্মণ্য ধর্মের সঙ্গে মিলেমিশে গেছে, বৌদ্ধতন্ত্র ও শাক্ততন্ত্রের মূল ও মৌল উপাদান কতখানি অভিন্ন, সে প্রসঙ্গেও পণ্ডিতেরা নানা উপাদেয় আলোচনা করেছেন। গৌতম বুদ্ধ ভারত পরিক্রমা করেছিলেন, রাঢ় অঞ্চলেও বিহার করেছিলেন, বৌদ্ধগ্রন্থে সে সংবাদ লিপিবদ্ধ আছে।

বাঁকুড়ায় ডিহর-জয়া অঞ্চলে বৌদ্ধ ধর্ম সংস্কৃতির পীঠস্থান গড়ে উঠেছিল মৌর্যপূর্ব যুগে। ছান্দাড়-বেলিয়াতোড় অঞ্চলেও বৌদ্ধ অধ্যুষণের চিহ্ন বর্তমান। ছান্দাড়ের 'জম্ভালসিনি' নামক গ্রামদেবী প্রকৃতপক্ষে বৌদ্ধতন্ত্রের 'জম্ভলদেব', যিনি ছিলেন ধনৈশ্বর্যের দেবতা। পাঁচাল গ্রামের চুণ্ডাসিনিও বৌদ্ধদেবী। ডিহর পরিমণ্ডলে নানা সময়ে খনন কার্যের ফলে বৌদ্ধনিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে। একাধিক বুদ্ধ মূর্তিও পাওয়া গিয়েছিল পূর্বে। বৌদ্ধতন্ত্রের আর এক দেবী রাউৎখণ্ডের 'জগৎ গৌরী'। বৈতাল গ্রামের 'ঝগড়াইসিনি' বৌদ্ধ দেবাংশী অর্থাৎ দেয়াসী। এই ধরনের সিনি-অন্তিক দেবদেবী বাঁকুড়ায় প্রচুর। কয়েকটি গ্রাম নামে—জয়া (অজন্তা), অবনটিকা (অবন্তিকা) এবং কয়েকটি পদবীতে—রক্ষিত, দত্ত, পাল, দে, পালিত, সিংহ, নন্দী, মিত্র, কুণ্ডু প্রভৃতিতে বৌদ্ধ স্মৃতি আজও বিদ্যমান। বাঁকুড়ার শুশুনিয়া নামক পাহাড়টির নামকরণ করেছিলেন হয়তো বৌদ্ধরা। বৌদ্ধ শব্দ 'সংসুমারো' থেকে এসেছে শুশুনিয়া। 'শুশুনিয়া' নামটি গ্রাম ও স্থাননাম হিসাবেও বাঁকুড়ার নানা অঞ্চলে পাওয়া যায়। শুশুনিয়া পাহাড় বৌদ্ধ ধর্মের পীঠস্থান ছিল, ঐতিহাসিকদের এই অভিমত উপেক্ষণীয় নয়।

ঐ পর্বতগাত্রে রাজা চন্দ্রবর্মার শিলালিপিটি আদিতে হয়তো বৌদ্ধলিপি ছিল। শুশুনিয়ার নিকটবর্তী কটরা গ্রামের 'সেনাপতি' পদবীধারী অধিবাসীরা বৌদ্ধধর্মাবলম্বী। সোনামুখী শহরের দেবী স্বর্ণমুখীর মন্দিরে একটি বুদ্ধমূর্তি আছে, আর একটি বুদ্ধমূর্তি ছিল জয়পুরের একটি গাছের তলায়।

বাঁকুড়ায় জৈন-বৌদ্ধ ধর্ম-সংস্কৃতির প্রভাব প্রতিপত্তির মতো হিন্দু-ব্রাহ্মণ্য ধর্মের নানা শাখার সম্প্রসারণও ধীরে ধীরে ঘটেছিল অবধারিত গতিতে। জৈন-বৌদ্ধ ধর্মসংস্কৃতির অমোঘ স্বাক্ষরের মতো ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির স্বাক্ষরও এখানে সুস্পষ্ট। শুশুনিয়া পর্বতগাত্রের শিলালিপিটি আবিষ্কারের দ্বারা জানা গেল, কিভাবে বাঁকুড়ার জনজীবন রাজকীয় সুযোগ সামর্থের মাধ্যমে বিষ্ণু-বাসুদেব cult-এর দ্বারা অনুরঞ্জিত হয়েছিল। মহাস্থানের মৌর্যলিপিটি আবিষ্কারের আগে পণ্ডিতদের ধারণা ছিল, শুশুনিয়ার প্রত্নলিপিটিই বঙ্গদেশের প্রাচীনতম লিপি। লিপিটি ব্রাহ্মীলিপি এবং ভাষা সংস্কৃত। শুশুনিয়ার লিপিটিতে খোদিত আছে—

পুষ্করণাধিপতে মহারাজ শ্রীসিংহবর্মণঃ
পুত্রস্য মহারাজ শ্রীচন্দ্রবর্মণঃ কৃতিঃ
চক্রস্বামিনঃ দাসাগ্রেণতি সৃষ্টঃ

সিংহবর্মণের পুত্র চন্দ্রবর্মণ। পুষ্করণার অধিপতি। চক্রস্বামীর দাসদের অগ্রগণ্য। বিশেষ কোন কীর্তি উৎসর্গ করলেন। চক্রস্বামী অর্থাৎ বিষ্ণু। বিষ্ণু-উপাসক ছিলেন রাজা চন্দ্রবর্ম। রাজা যেখানে বিষ্ণুপূজারী, প্রজারাও সেখানে বিষ্ণুপূজারী ছিলেন নিঃসন্দেহে। অরণ্য সংকুল শুশুনিয়ায় খনন কার্যের ফলে প্রাগৈতিহাসিক নিদর্শন যেমন মিলেছে তেমনি পরিচিত প্রাচীন ইতিহাসের নিদর্শনও এইভাবে মিললো। পুষ্করণা এখন 'পোখরনা' নামে পরিচিত বাঁকুড়ার একটি বিশেষ গ্রামাঞ্চল। এই গ্রাম থেকেও একাধিক বিষ্ণুমূর্তি পাওয়া গেছে। দামোদর নদ ও দ্বারকেশ্বর নদের মধ্যবর্তী অঞ্চল থেকেই বাঁকুড়ার অধিকাংশ বিষ্ণুমূর্তি আবিষ্কৃত হয়েছে।

বাঁকুড়ায় বিষ্ণু-বাসুদেব মূর্তির প্রাচুর্য এই সত্য প্রমাণ করে যে এখানে ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির নির্ভরযোগ্য প্রভাব বিস্তৃত হয়েছিল, যেমন পরবর্তীকালে বিস্তৃত হয়েছিল শৈব cult ও গৌড়ীয় বৈষ্ণব cult-এর প্রভাব। খৃষ্টীয় তৃতীয়-চতুর্থ শতক থেকেই বাঁকুড়া তথা মধ্য রাঢ়ে বিষ্ণু-বাসুদেব পূজার প্রচলন হয়েছিল। জৈন-বৌদ্ধ প্রভাবেও সে প্রভাব মুছে যায় নি। জৈন-বৌদ্ধ প্রভাব লুপ্ত হবার পর বিষ্ণু-বাসুদেব cult-এর পুনর্জাগরণ ঘটে। শৈব cult-এর ক্ষেত্রেও একই

অভিমত প্রযোজ্য। জৈন ও বৌদ্ধ মূর্তিগুলিকে ব্রাহ্মণ্য ধর্মসংস্কৃতি কি ভাবে আত্মস্থ করেছে এবং করতে চেষ্টা করেছে তার বহুল উদাহরণ বাঁকুড়ায় সর্বত্র। খৃষ্টীয় ষোড়শ শতকে চৈতন্য-প্রবর্তিত রাধাকৃষ্ণ cult পূর্ববর্তী বিষ্ণু cult-এর সঙ্গে মিলিত হয়। শ্রীনিবাস আচার্যের বিষ্ণুপুরে আগমন ও মল্লরাজ বীর হাম্বিরের বৈষ্ণবধর্ম গ্রহণ করার সঙ্গে সঙ্গে বাঁকুড়া তথা মল্লভূমিতে নতুন সংস্কৃতির জোয়ার এসেছিল। খৃষ্টীয় তৃতীয়-চতুর্থ শতক থেকে সপ্তদশ-অষ্টাদশ-উনবিংশ শতক পর্যন্ত ব্রাহ্মণ্য ধর্মসংস্কৃতির দুর্বার স্রোতধারা শুধু আর্য সমাজকেই পরিপুষ্ট করেছিল তা নয়, অনার্য বা আদিবাসী সমাজের মধ্যেও নবপ্রাণের ও প্রেরণার সঞ্চার করেছিল। বড়ু চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্য থেকে উপজাতি 'শ্রীধর্মী' সম্প্রদায় পর্যন্ত ধর্ম ও জনগোষ্ঠীর ইতিহাস পাঠ করলে বোঝা যাবে বৈষ্ণব cult এখনও কতখানি সজীব হয়ে আছে।

বিষ্ণু-বাসুদেবের শয়ান ও দণ্ডায়মান মূর্তির সংখ্যা বাঁকুড়ায় কম নয়। এক্তেশ্বরের শিবমন্দির প্রাঙ্গনের দ্বাদশভুজ ও সপ্তনাগছত্র সমন্বিত লোকেশ্বর বিষ্ণুমূর্তি উল্লেখযোগ্য। এই মূর্তিটি এখন 'খাঁদারাণী' নামে পূজা পাচ্ছে। ধরাপাটের রেখদেউলের এখানকার গর্ভগৃহে আর একটি বিষ্ণুমূর্তি আছে। আর এখানের একটি জৈন তীর্থংকর মূর্তিকে কিভাবে বিষ্ণুমূর্তিতে রূপান্তরিত করার চেষ্টা হয়েছিল তার কথা বলেছি পরবর্তী একটি নিবন্ধে। বাসুদেবপুর ও রাধানগরের বিষ্ণুমূর্তি, বহুলাড়ার শয়ান বিষ্ণুমূর্তি, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ—বিষ্ণুপুর শাখার অনন্তশায়ন বিষ্ণুমূর্তি, বিহারীনাথের দ্বাদশভুজ লোকেশ্বর বিষ্ণুমূর্তি যাঁরা দেখেছেন তাঁরাই একাধারে ভক্তিতে ও ভাস্কর্যকলাসৌন্দর্যে অভিভূত হবেন।

শিব ও রুদ্র দেবতাকে ভারতবর্ষের আর্য ও অনার্য ধর্মচিন্তার নিয়ামক বলা যায়। কোথাও বা তিনি লিঙ্গরূপী। সিন্ধু উপত্যকার লিঙ্গ-প্রতীক শিব, বেদের রুদ্রদেবতা, আগমান্ত শৈব সম্প্রদায়, কাপালিক কালামুখ অঘোরপন্থী শৈবসম্প্রদায়, হরগৌরী এবং গৌরীপট্ট, ভৈরব ও নটরাজের মূর্তি, মহাকাল ও বটুক মূর্তি প্রভৃতির সূত্র ধরে বাঁকুড়ার শৈবক্ষেত্রগুলি অন্বেষণ ও পর্যটন করলে দেখা যাবে যে বাঁকুড়া জেলাতেও শৈবধর্মের অনন্ত প্রসার ঘটেছিল। তুলনামূলক ভাবে এই জেলাতেও শিবমন্দিরের সংখ্যা বেশি। এক্তেশ্বর, বহুলাড়া, ছিহর, বিহারীনাথ, শলদা, দেউলভিড়া, কাস্তোড়, ভাটরা প্রভৃতি বাঁকুড়া জেলার বিখ্যাত শৈবক্ষেত্র রূপে আজও পরিচিহ্নিত হয়ে আছে। স্মরণীয় সোনবনার

মৌলেশ্বর শিব, ওন্দার ডুংশ্বর শিব। ছাতনার সন্নিকটে দেউলভিড়া ও পাত্রসায়রের সন্নিকটে কাস্তোড়ে আছে দক্ষিণ ভারতীয় পরিকল্পনার অনুসারী নটরাজ মূর্তি। কাস্তোড়ের নটরাজ মূর্তিটি খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীর পরের নয়। শালদায় আছে দুটি বৃহদাকার শিবলিঙ্গ। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ—বিষ্ণুপুর শাখাতেও সংগৃহীত হয়েছে অনেকগুলি শিবমূর্তি। ভৈরব বা মহাকাল নামে প্রচলিত বাঁকুড়া জেলার অসংখ্য মূর্তি মূলতঃ জৈন তীর্থংকর মূর্তিগুলিকে শৈব সংস্কৃতির দ্বারা স্বায়ত্ব করে নেওয়ার উদাহরণ বহন করছে। শৈব মূর্তির মতো শক্তিমূর্তিও বাঁকুড়া জেলায় কম নয়। নারিচার সর্বমঙ্গলা মন্দিরের দুটি অষ্টভুজা মহিষমর্দিনী, আটবাইচণ্ডী গ্রামের অষ্টভুজা (দশভুজা ?) চামুণ্ডা মূর্তি, বিষ্ণুপুরের মৃন্ময়ী মূর্তি, বহুলাডার দশভুজা মহিষমর্দ্দিনী মূর্তি প্রসঙ্গক্রমে স্মরণীয়।

রাধাকৃষ্ণ বাঁকুড়ারও প্রাণের দেবতা। বৃন্দাবন থেকে নবদ্বীপে প্রেরিত হারানো পুঁথিপত্রের অন্বেষণে বৈষ্ণবাচার্য শ্রীনিবাস মহাপ্রভু বিষ্ণুপুরে এসে পৌঁছালেন, মল্লরাজ দরবারে ভাগবত পাঠ করলেন, শ্রেষ্ঠ মল্লাধিনাথ বীর হাম্বিরকে বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষা দিলেন। রাধাকৃষ্ণ cult-এর জয়যাত্রা শুরু হল বাঁকুড়া-বিষ্ণুপুরে। বৃন্দাবনের অনুকরণে স্থাপন করা হল গুপ্ত-বৃন্দাবন। সহস্রাধিক বৈষ্ণব পুঁথি রচিত এবং অনূদিত হল। নির্মিত হল সহস্রাধিক রেখদেউল, চালা মন্দির, রত্ন মন্দির। শুধু বিষ্ণুপুর তীর্থক্ষেত্রটিতে পরিভ্রমণ করলে বোঝা যায় একটি নতুন ধর্ম-অভিযান, মানব জীবনের প্রতিটি স্তরে, প্রতিটি আচারে সংস্কারে, চারু ও কারুশিল্প সৃষ্টিতে কতখানি কলাসৌন্দর্যের আবেগ সঞ্চার করতে পারে, কতখানি আনন্দের উৎসার ঘটাতে পারে। The Temples of Mallabhum সম্বন্ধে ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয় বলেছেন—"Many of the beautiful temples of the middle age which are still in a fair state of preservation are situated in Mallabhum (Bankura District and the adjoining region). This is not an accident; the Hindu Malla Kings ruled in this region virtually independently, and Muslim authority was never firmly established there. This encouraged the Hindus to build temples, which also escaped the ravages of man. The turbulent Damodar river and the deep extensive Sal forests protected this small Hindu Kingdom

from the onslaught of the Muslim emperors. The contribution of the brave savage aborigines and of the Malla Kings accepted nominally the suzerainty of the Emperor of Delhi or of the Sultans of Bengal, they were on the whole independent so far as the internal administration of their territory was concerned. It was because of the survival of this Hindu Kingdom that many Hindu temples of the 17th and 18th centuries are still standing in Mallabhum, specially in Bishnupur, the capital of the Malla Kings"

শুধু বিষ্ণু শিব রাধাকৃষ্ণ নয়, রামায়ণ সংস্কৃতি ও রাম cult-এর নিদর্শনও বাঁকুড়ায় কম নয়। বাঁকুড়ায় মহাভারতের তেমন প্রভাব পড়েনি, কিন্তু রামায়ণের প্রভাবে জনজীবন, লোকসাহিত্য, লোকউৎসব এখানে অনেকাংশে নিয়ন্ত্রিত হয়। মন্দির টেরাকোটায়, রামায়ণ কথকথায়, গিন্নীপালন উৎসবে, রাবণকাটা উৎসবে, ভাদু ও তুষু গানে, কিছুটা ছৌ-নৃত্যে, রাসযাত্রায়, সাঁওতালী গানে, সর্বোপরি রামায়ণ অনুবাদে এই রাম cult এখনও জীবন্ত হয়ে আছে বাঁকুড়া জেলায়। কৃত্তিবাসী রামায়ণের মতই এখানে বিষ্ণুপুরী রামায়ণ ও জগৎরামী রামায়ণের সবিশেষ প্রচলন আছে এবং এই দুটি রামায়ণের অনুবাদক-রচয়িতা বাঁকুড়ার সন্তান। শুধু বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ-বিষ্ণুপুর শাখাতেই নয়, বাঁকুড়ার গ্রামে গঞ্জে বহু পরিবারেই এখনো বহু রামায়ণ পুঁথি সংরক্ষিত অথবা অবহেলিত হয়ে পড়ে আছে।

অবশেষে মুসলমান ধর্ম সংস্কৃতি ও খৃষ্টান ধর্ম সংস্কৃতির কথাও বলতে হয়। নবাব আমলে বা মোঘল আমলে মল্লরাজারা প্রায় স্বাধীন রাজা রূপেই একটানা রাজ্য শাসন করে গেছেন। তবু পীর-দরগা বাঁকুড়াতেও কম নয়, মুসলমান ধর্মাবলম্বী জনসংখ্যাও কম নয়। ইউরোপীয় মিশনারীদের আগমনী বার্তা বাঁকুড়ায় পৌঁচেছিল, গত শতাব্দীতে। বাঁকুড়া শহর ও সারেঙ্গা অঞ্চলে খৃষ্টান জনগোষ্ঠীর বিশেষ সমাবেশ ঘটেছে। এ জেলায় বিদেশী খৃষ্টান মিশনারীদের কার্যকলাপ আচার অনুষ্ঠান এখনো ভালো ভাবেই চলছে। বাঁকুড়া জেলায় মুসলমান জনসংখ্যা ৭৩০০৭ এবং খৃষ্টান ২০৯০—১৯১৩ খৃষ্টাব্দের লোকগণনা অনুযায়ী।

[তের]

এমনি করেই শত মানুষের ধারা এই রাঢ় মধ্যমণি বাঁকুড়ায় শতাব্দীতে শতাব্দীতে এসে মিলিত হয়েছিল এবং অনার্য আদিবাসী জনজীবন ও লোক-সংস্কৃতির সঙ্গে নানা মেলবন্ধনে বাঁধা পড়ে নানা রূপে রূপবান হয়ে উঠেছিল।

চার.

১৯১৩ খৃষ্টাব্দের লোক গণনার হিসাবে দেখা গেছে বর্তমান বাকুড়া জেলার মোট লোক সংখ্যার শতকরা ৪২ ভাগ আদিবাসী উপজাতি ও হিন্দু সমাজভুক্ত তফসিলী সম্প্রদায়। অর্থাৎ মোট জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক আদিবাসী ও তফসিলী। এই জনবিভাগের খুব বেশি হেরফের যে ১৯১৮ সালের জনগণনায় দেখা গেছে তা মনে করার কোন কারণ নেই। ১৯১৭ সালের জনগণনায় বাঁকুড়ার মোট জনসংখ্যা ছিল ১৬৬৪৫১৩ জন, ১৯২০ সালে সেই সংখ্যা বর্ধিত হয়ে হয়েছে ২০৩১০৩৯ জন। তার মধ্যে শুধু আদিবাসী ২০৮৭৩৫ জন।

প্রায় অর্ধ সংখ্যক জনগোষ্ঠীর উচ্চ ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির সঙ্গে অপর অর্ধ সংখ্যক জনগোষ্ঠীর লোক সংস্কৃতির মিলন ক্ষেত্র হিসাবে বাঁকুড়ার সংস্কৃতি সত্তা বৈশিষ্ট্যে ও বৈচিত্র্যে পূর্ণ। তবু সমীক্ষান্তে দেখা গেছে বাঁকুড়ার সংস্কৃতি মূলতঃ লোক-সংস্কৃতি কারণ মধ্য যুগে এ অঞ্চলে আদিবাসী ও তফসিলী মানুষের সংখ্যা অনেক বেশি ছিল। বর্তমানে সভ্য ও শিক্ষিত মানুষের আগমন বাঁকুড়ায় বেশি ঘটছে। মধ্যযুগে তফসিলী বা আদিবাসীদের কোন কোন দল বা গোষ্ঠী রাজ্য রাজধানী স্থাপন করেছে, বাঁকুড়া সংস্কৃতির নিয়ামক হয়ে উঠেছে। মল্লরাজ বা গোপরাজ, ধবলরাজ বা সামন্তরাজদের জীবনেতিহাস পড়লে বোঝা যায় তাঁরা বিশুদ্ধ আর্যরক্তের অধিকারী ছিলেন না।

বর্তমানে বাকুড়া জেলায় একদিকে যেমন ব্রাহ্মণদের সংখ্যা সর্বাধিক অন্যদিকে তেমনি বাউরীদের সংখ্যা সর্বাধিক। বাঁকুড়া গেজেটিয়ারের ভাষায় 'Bouries are the most numerous'. বাউরী, ভূমিজ, হাড়ি, ডোম, খয়রা, শুঁড়ি, বাগ্দি, মুচি, সবর, মাহাতো, সরাক, মাল, কোড়া, হো, সাঁওতাল, মাহালী, কোল, মুণ্ডা, খেড়িয়া প্রভৃতি জনগোষ্ঠীর মধ্যে বাউরীরাই উচ্চবর্ণ হিন্দু জনগোষ্ঠীর অতি নিকটে আসতে পেরেছে। আমরা বলি—'আসতেও বাউরী, যেতেও বাউরী'। জন্মের সময় বাউরী, মৃত্যুর সময়েও বাউরীদের প্রয়োজন আজও হিন্দু সমাজে বিশেষ ভাবে অনুভূত হয়। বাউরীদেরও শ্রেণী-

বিভাগ আছে। প্রধানতঃ আটটি বিভাগ। এদের নানা পরবের মধ্যে ভাদু ও টুসু বিখ্যাত।

ইংরাজ আমলে ভূমিজ সম্প্রদায়ের দ্বারাই জঙ্গলমহলে চূয়াড় বিদ্রোহ সংঘটিত হয়েছিল। এরা বাউরীদের ধরমপূজা এবং সাঁওতালদের জাহির পূজা করে, এরা যেমন গ্রাম দেবতার উপাসক তেমনি কালীরও উপাসক। ইন্দ পরব, ছাতা পরব, করম উৎসবে এরা ব্রাহ্মণ পুরোহিত নিয়োগ করে।

বাঁকুড়ার মোট জনসংখ্যার প্রায় ৯ ভাগ সাঁওতাল। সাঁওতালরা মোটামুটি বারোটি উপবিভাগে বিভক্ত। মাঝি, মুর্মু, কিসকু, সোরেণ, টুডু, মাণ্ডি, হেমব্রম, হাঁসদা, বাস্কে প্রভৃতি উপবিভাগ। এদের সূর্যদেবতা শিঙবোঙা, পর্বতদেবতা মারাংবুরু। এদের জাহের এরা, শিব দুর্গা। পরগণাবোঙা এদের আর এক দেবতা। এদের মাঝি সম্প্রদায় অনেক ক্ষেত্রে ব্রাহ্মণ পুরোহিতদের ডেকে পূজা করায়। হিন্দুদের যেমন পবিত্র নদী গঙ্গা, এদের তেমনি দামোদর। বাঁদনা, ধরম, এখান্, বাহা, সিম্‌জন, দাঁসাই, সেহরাই, নাইকি, নাউবাই, তীর বেঁধা এদের পরব ও উৎসব। এদের সাংস্কৃতিক জীবনের অনেকখানি জুড়ে আছে এই সব পরব বা উৎসব।

কোড়া উপজাতি হচ্ছে বাঁকুড়ার 'third largest population'. এরা শিব দুর্গা ও কালীর উপাসনাও করে। এককালে এদের একটা নিজস্ব ভাষা ছিল, কিন্তু এখন অধিকাংশ কোড়া উপজাতির মানুষ বাংলায় কথা বলে। প্রস্তর ও মৃত্তিকা খননে এরা ওস্তাদ। পাহাড় এদের প্রধান দেবতা। এরা প্রস্তর লিঙ্গেরও পূজা করে। মাল বা মল্ল জাতি ভূষণপ্রিয়, যোদ্ধা, কুসুমশিল্পী এবং মালাকার। এদেরই একশ্রেণী পটুয়া। মাহাতোরা নিজেদের ক্ষত্রিয় মনে করে, যেমন বাগ্‌দিরাও নিজেদের পরিচয় দিতে চায় বর্গ বা বাগ্রক্ষত্রিয় বলে। মাহাতো ও কুর্মিদের বাসস্থান এই জেলায় প্রধানতঃ রাণীবাঁধ, রাইপুর, খাতড়া থানায় বেশি। এদের ভাষা বাংলা। বড়াম, গেরোয়া, আসনপাট, কিয়াসিনি এদের দেবতা। ভাদু, টুসু, ছাতা, জিতা, মনসা, করম প্রভৃতি মাহাতো সম্প্রদায়ের প্রিয় ও বিশিষ্ট পূজা ও উৎসব।

সমস্ত শ্রেণীর আদিবাসী ও তফসিলী উপজাতির পরিচয় না নিয়েও দেখা যায়। অভিজাত ভাষা ও সংস্কৃতি কেমন করে এই সব ভূমিলগ্ন মানবগোষ্ঠীকেও আত্মস্থ করার চেষ্টা করেছে। অন্যদিকে এদের ভাষা ভাব উৎসব পার্বণ কেমন করে সভ্য শহরলগ্ন মানবগোষ্ঠীকেও প্রভাবিত করেছে। আমরা পূর্বেই বলেছি, বাঁকুড়ার সংস্কৃতি, বাঁকুড়ার জনজীবনের মতো মিশ্র পদ্ধতিতে গড়ে উঠেছে।

পাঁচ.

পৃথিবীর যে কোন প্রান্তেই হোক না কেন, যে কোন মানবগোষ্ঠীর নিজস্ব সাহিত্য ও সংস্কৃতি থাকে। সে সাহিত্য সংস্কৃতি কোথাও ঐশ্বর্যশালী, কোথাও বা রিক্ত ক্ষীণ অপূর্ণ। বাঁকুড়া জেলার জনগোষ্ঠী কোন সীমানাবদ্ধ স্বতন্ত্র জনগোষ্ঠী নয়। তবু এখানের ভূমিপ্রকৃতি, নিসর্গপ্রকৃতি ও মানব প্রকৃতির মধ্যে এমন এক বৈশিষ্ট্য বর্তমান, যার ফলশ্রুতি হিসাবে বঙ্গদেশের সামগ্রিক ঐতিহ্য-চেতনা থেকে একে পৃথকভাবে চিনে নিতে অসুবিধা হয় না। পূর্বেই বলেছি, এখানে 'ফোকলোর' অর্থাৎ লোকযান বা লোকসংস্কৃতি বলে কোন নিছক ও নিঃসঙ্গ সংস্কৃতি নেই। ধ্রুপদী বা অভিজাত সংস্কৃতির সঙ্গে লোকসংস্কৃতি এখানে এমনই ওতঃপ্রোত ভাবে জড়িত যে দুই ভিন্ন সংস্কৃতি বা সাহিত্যকে আলাদা আলাদা ভাবে চিনে নেবার কোন সুবিধা সুযোগ নেই।

আমরা সাহিত্যের কথাই প্রথমে বলি। রামায়ণ কি দরবারী সাহিত্যের নমুনা মাত্র? বাল্মীকি রামায়ণ অথবা কৃত্তিবাসী রামায়ণ কতখানি দরবারী সাহিত্য নমুনা বহন করছে? আমরা জানি প্রচলিত লোককথাকে লিখিত সাহিত্যের সংযমী রূপ দিয়েছিলেন বাল্মীকি। বাঁকুড়ার জগৎরামী রামায়ণ অথবা বিষ্ণুপুরী রামায়ণ মূল বাল্মীকি রামায়ণের অন্ধ অনুসারক নয়। এই দুই রামায়ণ আসরে অংশে অংশে যখন গীত ও ব্যাখ্যাত হয়, তখন বোঝা যায় না যে এর কোন্ প্রান্ত পর্যন্ত অভিজাত সাহিত্যের ধারক আর কোন্ প্রান্ত থেকেই বা এদের লোকসাহিত্য স্বভাব গঠিত হয়েছে। বাঁকুড়ায় ধর্মমঙ্গল ও মনসা-মঙ্গলের বহুল প্রচলন। মধ্যযুগীয় এই সাহিত্য ধারাটি এখনও বেগবান গতিতে প্রবাহিত হয়ে চলেছে বাঁকুড়ার মানসলোকে। চণ্ডীমঙ্গলের আসরও এখানে বসে। মনসামঙ্গলের আসর বাঁকুড়া বিষ্ণুপুরের মতো শহরে, বাঁকুড়ার ছোট বড় গ্রামে গঞ্জে সারা বছর ধরে বারবার বসে। বৈষ্ণবধর্মে বিশেষভাবে অধ্যুষিত বাঁকুড়া জেলায় মল্লাবনীনাথদের কল্যাণপ্রভাব লুপ্ত হয়ে যাবার পরও বৈষ্ণব পদগান, পালা কীর্তন, নামকীর্তন আজও সর্বত্র অসীম আবেগে অনুরাগে গীত হয়। অর্থাৎ শহর থেকে গ্রাম, সামন্ত রাজসভা থেকে বাউরী সাঁওতাল সমাজ, সর্বত্র কমবেশি একই সাহিত্যধারা প্রবাহিত হয়ে চলেছে। এই অবস্থায় এখানে ধ্রুপদী সাহিত্য ও লোকসাহিত্যের বিভাজন রেখাটি দেখতে চাওয়া বাতুলতা মাত্র। বিষ্ণুপুরের মন্দির টেরাকোটা ও পাঁচমুড়ার মাটির হাতি ঘোড়া, বিকনার ঢোকরা ও পিতলের রথ, বেলেতোড়ের পট ও যামিনী রায়ের চিত্রশিল্প, বহু

চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ও রাজা বীর হাম্বিরের পদাবলী—কোন্‌টিকে আমরা লোকসংস্কৃতি আখ্যা দেবো আর কোন্‌টিকেই বলবো অভিজাত সংস্কৃতির নমুনা? এর কোন পরিচ্ছন্ন উত্তর নেই। বাঁকুড়ার সংস্কৃতি এই দুয়ের সমাহারে জাত এবং এই দুয়ের সমান আকুতিতে সঞ্জীবিত। এবং লোক-সংস্কৃতির গুণ-পরিমাণ বাঁকুড়ায় বেশি। বাঁকুড়ার সংস্কৃতি মিশ্র সংস্কৃতি হলেও মূলতঃ লোকসংস্কৃতি।

লোকসাহিত্যের মৌল ধর্ম যেমন তেমনি বাঁকুড়া' লোকসাহিত্যও মূলতঃ গেয়। গানের আকারে, গানের জন্যই এগুলি রচিত। মনসার গান, ঝাঁপান গান, বৈষ্ণব পদ, বাউল সংগীত, পটগান, রামায়ণ গান, ভাদু ও টুসু, ঝুমুর, কোয়ালি গান, গিন্নীপালনের গান, বালক বালিকাদের গান, ইঁদ পরবের গান, হোলির গান, বিবাহ সংগীত, ছাদপেটানোর গান, হাপু গান, মাহুতের গান—এ সবই প্রথমে গান অর্থাৎ গেয় তারপর ইদানীংকালে পাঠ্য। মনসাযাত্রা ও কেষ্টযাত্রার চলও এখানে খুব। লোকসাহিত্যের এই দুটি নাটকীয় দিকও মূলতঃ গীতিনির্ভর, অপেরাধর্মী। সংলাপের সামান্য বাঁধন দিয়ে গানের ধারায় স্নান করানোর সুযোগ নিতেই এগুলি রচিত হয়। বাঁকুড়ায় নৃত্য-নির্ভর লোক-সাহিত্যের ধারাও বর্তমান। ছৌনাচ বাঁকুড়াতেও কিছু আছে, জেলার দক্ষিণ প্রান্তে। খেমটি নাচ, কাঠি নাচ, পাতা নাচ প্রভৃতির বহুল প্রচলন এ জেলায়। ভাদু বা টুসু গানের সঙ্গে নাচও চলে কখনো কখনো। ঝুমুর নাচ গানেরও প্রচলন আছে। আর আছে 'বুলবুলি' নাচ; একদল মেয়ে রাধা সাজে, অন্য দল ছেলে কৃষ্ণ সাজে, বাদ্যি বাজনা সহযোগে নাচ ও গান চলে।

গান নয়, অথচ মনসামঙ্গল ও ঝাঁপানের সঙ্গে যুক্ত আছে অজস্র সর্পমন্ত্র, বিষ বৈদ্যদের কণ্ঠে। সাপের মন্ত্রের পাশাপাশি ভূত প্রেত ডাকিনী মন্ত্রও অনেক আছে। জলপড়া, তেলপড়া, নুনপড়া, ধুলাপড়ার মন্ত্রগুলিও প্রসঙ্গক্রমে স্মরণীয়। বাঁকুড়া জেলায় প্রবাদ-প্রবচনও সুপ্রচুর। খনার বচন বা শুভংকরীও আছে। বাঁকুড়ার শুভংকরীর গরিমা বিশেষভাবে স্মরণীয়। বিষ্ণুপুরের রাজারা অংকবিদ শুভংকরদের এককালে বিশেষ মর্যাদা দিতেন। যথারীতি হেঁয়ালি ও ছেলে ভুলানো ছড়াতেও এ জেলা বিশিষ্ট স্থানাধিকারী।

আর আছে লোককথা ও লোককাহিনী। এগুলি গেয় নয়, নয় কবিতার আকারে প্রচারিত। মানুষের মুখে মুখে কতশত কাহিনী যে ছড়িয়ে আছে তার সীমাসংখ্যা নেই। যেমন আদি মল্লরাজের উৎপত্তি, জয়পাণ্ডা ও শিলাবতী নদী, দামোদর ও শালী নদী, পরকুলের টুসু মেলা, বিষ্ণুপুরের মদনমোহন ও

দলমাদল কামান, ছাতনার বাসী চণ্ডীদাস, ছান্দারের বোধ পুকুর, বিষ্ণুপুরের সর্বমঙ্গলা প্রভৃতি বিষয়ে এক বা একাধিক লোককাহিনী মুখে মুখে প্রচলিত আছে। এমন কি কোনটি বা পুঁথি পত্রে লিখিত আছে। শুধু তাই নয়, বাঁকুড়া জেলার প্রায় প্রতিটি বিখ্যাত মন্দিরকে ঘিরেও এক একটি কাহিনী প্রচলিত আছে। যেমন হাড়মাসড়ার রেখদেউল, ধরাপাটের গ্যাংটো শ্যামচাঁদের মন্দির, সোনাতোপলের দেউল, ডিহরের ষাঁড়েশ্বর মন্দির, অযোধ্যার মনসা মন্দির, এক্তেশ্বর শিব মন্দির যেখানেই যান না কেন একটু ঔৎসুক্য প্রকাশ করলেই এক একটি কাহিনী শুনতে পাবেন মন্দির সম্বন্ধে বা মন্দিরের দেবতা সম্বন্ধে। দেবদেবীর প্রতিষ্ঠা নিয়েও অজস্র কাহিনী, যেমন ছাতনার বাশুলীকে নিয়ে, প্রচলিত আছে। এই সব কাহিনীর সঙ্গে বর্গী আক্রমণের যোগ কখনও কখনও উল্লিখিত হয়েছে। তারই সাক্ষ্যে এদের মধ্যে যে ঐতিহাসিক উপাদান-সত্য আছে তা অস্বীকার করা যায় না।

আর আছে জাতপাতের কাহিনী, cast legend—বিবাহ বাসরে বা শ্রাদ্ধ-আসরে প্রাচীন প্রবীণ মানুষেরা নিজ নিজ জাত উৎপত্তির কথা বলেন। সাঁওতালদের জাতউৎপত্তির কাহিনী, অনেকটা বাইবেলের আদম-ইভের কাহিনীর মতো। আর আছে 'রাতকথা'। গ্রামের বৃদ্ধবৃদ্ধা, কিশোর কিশোরী, বালক বালিকাদের সমবেত আসরে রাতের বেলা 'রাতকথা' বলার নিয়ম। এইসব রাতকথা একাধারে গল্পের সৌন্দর্যজগতের দরজা যেমন খুলে দেয় তেমনি উপদেশামৃতের পসরাও বহন করে। তবে রাতকথায় বাস্তব সমাজের উপাদান অনেক বেশি। এর মধ্যে হেঁয়ালি ব্যবহারের রীতিও আছে।

ব্রতকথার প্রচলন কোন্ দেশে নেই? বাঁকুড়া জেলাতেও ব্রতকথার ধারাপ্রবাহ অটুট ভাবে চলছে। শেয়াল-শকুনি, ষষ্ঠী, ইতু, পুন্নিপুকুর, ভাঁজো, জিতাষ্টমী প্রভৃতি ব্রতের যেমন বিশেষ আচার অনুষ্ঠান আছে তেমনি আছে 'কথা'। এক একটি ব্রতকে কেন্দ্র করে এক বা একাধিক কাহিনী আছে। বাঁকুড়ায় ষষ্ঠীব্রতের প্রচলন সর্বাধিক।

এই বিপুল লোকগান ও লোককথার পাশাপাশি আছে সাঁওতালী গান ও সাঁওতালী লোককথা। একদিকে বাংলা ভাষা অন্যদিকে সাঁওতালী ভাষা—এই দুই ভাষার মধ্যে এখানে প্রতিযোগিতা নেই, সহযোগিতা আছে। বাঁকুড়ার নিজস্ব যে শব্দসম্ভার তার প্রতিও পণ্ডিত ও গবেষকদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে। বাঁকুড়ার মৌখিক ও লৌকিক শব্দাবলীর বিজ্ঞান-সম্মত সংগ্রহ করলে বাংলা ভাষার সমৃদ্ধির নতুন পরিধি চোখে পড়বে।

ছয়.

নিত্য প্রয়োজনীয় বস্তুকে সুন্দর করে তোলার সাধনা মানুষের সহজাত সাধনা। এর সঙ্গে আর্থিক দিকটার যোগ যতখানি আছে তার থেকে অনেক বেশি আছে মনের যোগ। শিল্প ও সৌন্দর্যবোধের যোগ। খেতে শুতে, চলায় ফেরায়, সংরক্ষণে, প্রীতি আদান প্রদানে, অবকাশ যাপনে, ভক্তি নিবেদনে, জন্ম লাভে ও মৃত্যু সময়ে সামাজিক মানুষের যে সব দ্রব্যের ব্যবহার প্রয়োজন হয়, সেই সব দ্রব্যের চারুত্ব সম্পাদনের সাধনায় পিছিয়ে নেই বাঁকুড়া জেলা। এই জেলার মৃৎশিল্প, রেশম ও কার্পাস শিল্প, পিতল ও কাঁসা শিল্প, দারুশিল্প, প্রস্তর শিল্প, শংখ শিল্প, লৌহশিল্প প্রভৃতি স্থানীয় মহিমা যেমন বহন করছে তেমনি আবিশ্বের লোকশিল্পপ্রেমী মানুষের মনোরঞ্জন করতেও সমর্থ হয়েছে। ভালোবাসা চারুত্ব দেয় জীবনকে। ভালোবাসার স্পর্শে সৌন্দর্যময় চারুত্ব দেবার জন্য যুগ যুগ ধরে কত শিল্পী কত প্রকারের উপাদান গ্রহণ করেছে, তার সীমা-সংখ্যা নেই। গ্রহণ করা হয়েছে নিছক বস্তু, বস্তুর সঙ্গে মিশেছে রঙ, কখনো বা শৈত্য বা তাপ, কখনো শুধুই খোদাই করে তুলে ধরা হয়েছে রূপশ্রী।

বাঁকুড়ার মৃৎশিল্পের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন পোড়ামাটির ঘোড়া, হাতি, মনসার চালি, মনসার বারি, কাঁখে পুত কোলে পুত ষষ্ঠী ঠাকরুণ, প্রতিমার মুখ, বোঙা হাতি, ছাইদানী, বাইসন মূর্তি বা ষাঁড়, লক্ষ্মী সরা, লক্ষ্মী ভাঁড় ইত্যাদি। বাঁকুড়ায় যে অজস্র অনবদ্য মন্দির টেরাকোটার নিদর্শন আছে, তার শিল্পীগোষ্ঠী এখন সম্পূর্ণ লুপ্ত কেন লোপ পেলো, কেমন করে লোপ পেলো, সে আলোচনায় না গিয়েও বলা যায়, এই অভিজ্ঞতা গভীর বেদনার যে মল্লরাজাদের কাল শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে মন্দির-স্থপতি ও মন্দির-টেরাকোটা শিল্পীদের অবলুপ্তি ঘটেছে। বর্তমানে মৃৎশিল্পের গরিমায় শ্রেষ্ঠ পাঁচমুড়ার কালো হাতি ও লাল বা কালো ঘোড়া। ঊর্ধ্বগ্রীব, স্থির পদ, উৎকর্ণ হ্রস্বপুচ্ছ, সুস্থির অথচ চকিত গতির আমেজ নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা লাল বা কালো রঙের ঘোড়াগুলি বিস্মিত করে, মুগ্ধ করে, প্রশ্ন জাগায়। ক্ষুদ্র ও সুবৃহৎ নানা আকারেই ঘোড়াগুলি তৈরী হয়। এই ঘোড়ার খ্যাতি বিশ্বব্যাপী। JASLEEN DHAMIJA তাঁর INDIAN FOLK ARTS AND CRAFTS নামক গ্রন্থের Pottery and Terracotta অধ্যায়ে বলেছেন—"The clay Bankura horse of West Bengal is one such form. though even in Bankura district each village gives its own distinctly characteristic form to figure. The

Bankura horse which is well known in Delhi and other cities, actually hails from village Panchmorah, whereas another village five miles away, Rajagrahm has a distinctly different style of its own." তথ্যের সামান্য কিছু ভুল থাকলেও লেখক পাঁচমুড়া ও রাজগ্রামের খবর যে রাখেন তা বোঝা যায় এবং এও বোঝা যায় বাঁকুড়ার ঘোড়া এখন জেলার পরিধি পার হয়ে দিকদিগন্তে ছুটছে। টেরাকোটা ঘোড়া শুধু পাঁচমুড়াতেই হয় না, হয় বাঁকুড়া জেলার রাজগ্রাম, সান্দরা, সোনামুখী, মুরলু, কেয়াবতী প্রভৃতি অঞ্চলেও। এই সব ঘোড়ার গঠনগত স্থানিক বৈশিষ্ট্য আছে, বৈচিত্র্য আছে। তার মধ্যে রাজগ্রামের ঘোড়া অনেকটা স্থূল কিন্তু বলিষ্ঠ। সান্দরার ঘোড়া সৌখীন ও সুঅলংকৃত। শুধু কলাসৌন্দর্যের পিপাসা মেটানোর জন্যই নয়, দেবস্থানে মানত করার জন্য কোটি কোটি রকমারি সাইজে আদিম গুহাশিল্পের আদলে মাটির ঘোড়া এ জেলার সর্বত্র কমবেশি তৈরী হয়। এই সব ঘোড়া শিল্পের আরম্ভ কবে জানা নেই।

পাঁচমুড়ার আর একটি গৌরবের জিনিষ মাটির শংখ। যেমন সৌখীন, তেমনি কার্যকরী ও কারিগরী জ্ঞানের পরাকাষ্ঠা বহন করছে। পাঁচমুড়ার কালো রঙের বৃহদাকার স্থূল মাটির হাতিও নয়নলোভন। পাঁচমুড়ার সুবৃহৎ মনসার চালি যিনি না দেখেছেন তিনি মৃৎশিল্পের বিশ্বব্যাপী সৌন্দর্য দর্শন করলেও তাঁর অভিজ্ঞতা অনেকখানি অপূর্ণ থেকে যাবে। দেবী মনসার মন্দিরে যে সব মাটির ঘটে করে জল ভরে রাখা হয়, মনসাসিজ পাতা সহ, সেগুলিকে বলে মনসার 'বারি'। সর্পফণাযুক্ত এই ঘটগুলি ভারি সুন্দর। মৃৎশিল্পের আর একটি শাখা, দেওয়ালে টাঙিয়ে রাখার জন্য দেবদেবীর মুখ, সাধারণ নরনারীর মুখ, পশু পাখী প্রভৃতি এখানেও তৈরী হয়। তবে সেগুলির বর্ণরঞ্জিত গুণগরিমা খুব সূক্ষ্ম নয়। বাঁকুড়ার মাটির থালাবাটি, কুঁজো, কলসী, হাঁড়ি, পাই, টালি, খোলা, জলনালিও কারিগরী কৃতিত্ব বহন করছে।

পিতল ও কাঁসা শিল্পের জয়জয়কার এখনো বাঁকুড়া বিষ্ণুপুর সোনামুখী থেকে মিলিয়ে যায় নি। বাঁকুড়া জেলার পিতল শিল্পের শ্রেষ্ঠ নিদর্শনগুলি আজ পরিণত হয়েছে প্রত্নবস্তুতে—সেগুলি পিতলের রথ। কারুকার্যময় ও পৌরাণিক ঢালাই চিত্রসমন্বিত এই রথগুলি যাঁরা বাঁকুড়া শহরে, বিষ্ণুপুরে, অযোধ্যা বা নডরায়, ঝাঁটিপাহাড়ীতে দেখেছেন তাঁরাই বিস্ময়তাড়িত আনন্দে দোলায়িত হবেন। বিপুল অর্থ, অনবদ্য কারিগরী জ্ঞান, নিপুণ শিল্পবোধের সমন্বয় ঘটেছিল

এই সব রথের নির্মাণ কার্যে। এর অনেকগুলিই এখনো রাস্তায় বার হয় বিশেষ দেবপূজা উপলক্ষে বা রথের মেলা উৎসবে। এখন থালা বাটি গেলাস গামলা ঘটি গাড়ু তৈরীর হাত ঐ ধরণের মহাকাব্যিক সৌন্দর্য সৃষ্টি করতে পারে না। অবশ্য কাঁসা পিতল তরম্ শিল্পস্থান হিসাবে বাঁকুড়া, বিষ্ণুপুর, সোনামুখী ছাড়াও পাত্রসায়ের, কেঞ্জাকুড়া, অযোধ্যা, লক্ষীসাগর, মদনমোহনপুর প্রভৃতি আজও স্মরণীয় হয়ে আছে। প্রসঙ্গক্রমে ঢোকরা শিল্পের কথাও বলতে হয়। বাঁকুড়া শহরের সন্নিকটে বিগ্‌না গ্রামে ঢোকরা শিল্পীদের একটি বস্তি আছে। এদের নির্মিত শিল্পসম্ভার নিঃসন্দেহে মনোমুগ্ধকর।

বাঁকুড়া জেলার গ্রামে গঞ্জে অরণ্যে পর্বতে প্রান্তরে নদীতীরে অসংখ্য পাথরের মূর্তি ছড়ানো আছে। এগুলির মধ্যে জৈন তীর্থংকর ও জৈন দেবদেবীর মূর্তি, সূর্য শিব বা ভৈরব মূর্তি, রাধাকৃষ্ণ কালী দুর্গা, গণেশ বা যক্ষযক্ষিনী মূর্তিরই প্রাধান্য। আর আছে শিবলিঙ্গ। সবই যে কষ্টিপাথরের তৈরী তা নয়। বাঁকুড়া জেলায় ভালো পাথর নেই। তাই ঐ সব মূর্তিকলার সবগুলিই যে বাঁকুড়ার প্রাচীন শিল্প নিদর্শন বহন করছে তাও নয়। আবার এ সিদ্ধান্তও ঠিক নয় যে ঐ সব মূর্তিমালার সবই বঙ্গদেশের বাইরে থেকে আনীত। বেশ কিছু মূর্তি আবার মাকড়া পাথরে নির্মিত নানা মন্দিরের বহির্গাত্রে ও মন্দির অভ্যন্তরে সংযোজিত ও সংরক্ষিত হয়ে আছে। বর্তমানে শুশুনিয়া পাহাড় অঞ্চলে পাথরের হাতি ঘোড়া, ফুলদানী, ধূপদানী, থালা বাটি, ছাইদানী ও অন্য জীবজন্তুর মূর্তি তৈরী হচ্ছে। প্রস্তর শিল্পে বাঁকুড়ার স্থানস্থান এখন অনেক কমে গেছে।

দারুশিল্পের নিদর্শনও ছড়িয়ে আছে মন্দিরে মন্দিরে। কাঠের গৌর নিতাই, মৃন্ময়ী মূর্তি, জগদ্ধাত্রী, রাধাকৃষ্ণ, রামকৃষ্ণ সারদা প্রভৃতি মূর্তি বাঁকুড়ায় কম নয়। কাঠের পুতুলও তৈরী হয় অজস্র পরিমাণে। গামার ও সেগুন কাঠের পালিশ করা রঙ করা কাঠের দেবদেবী মূর্তি, এ্যালুমিনিয়ামের নকশা কাটা তাজ দেওয়া কাঠের ঘোড়া তৈরী হচ্ছে বাঁকুড়া শহরে। মাটির ঘোড়ার থেকে এই কাঠের ঘোড়াগুলির স্থায়িত্ব অধিক। তাই কাঠের ঘোড়ার প্রতি শিল্প রসিকদের আগ্রহ বিশেষ ভাবে দেখা দিয়েছে। তক্ষণ শিল্পের প্রাচীন নিদর্শন বাঁকুড়া জেলায় গৃহদ্বারে, দেবমন্দিরের কপাটে, ঘরের চালের কাঠামোয়, কাঠের রথে—কোথায় কোথায় দেখতে পাওয়া যাবে তার একাধিক তালিকা দিয়েছেন তারাপদ সাঁতরা মশায় তাঁর সুনির্মাণ-সুন্দর 'বাংলার দারু ভাস্কর্য' নামক গ্রন্থে। অবশ্য হুগলী জেলার আঁটপুরের শ্রীপুরের দুর্গামণ্ডপে যে ঐশ্বর্যশালী

STATE CENTRAL LIBRARY
TRIPURA
79779
16/2/0
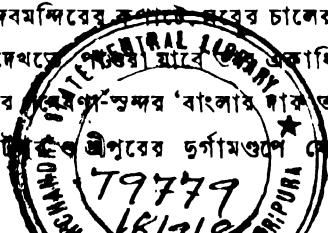
অত্যাশ্চর্য কাঠের কাজের নমুনা আছে তার তুল্য কোন নিদর্শন বাঁকুড়া জেলায় নেই।

শংখ শিল্পে বাঁকুড়া জেলা আজও সম্মানীয় স্থান অধিকার করে আছে। বাঁকুড়া বিষ্ণুপুর পাত্রসায়ের প্রভৃতি শহরে শংখ শিল্পীগোষ্ঠী আজও কর্মব্যস্ত। বিষ্ণুপুরের কোন কোন শিল্পী সর্ব-ভারতীয় খ্যাতি অর্জন করেছেন। শাখা, আংটি, হার, কানের গহনা, চুলের গহনা, লকেট প্রভৃতি নির্মাণের চিরাচরিত প্রথা অনুসরণ ছাড়াও শাঁখের উপর দুর্গাপ্রতিমা খোদাই, লেনিন বা গান্ধী মূর্তি খোদাই ও অন্যান্য ফুলকারী কাজ প্রথম শ্রেণীর শিল্পকলার নিদর্শন বহন করছে।

তাঁত শিল্পে বাঁকুড়া জেলার খ্যাতি এখনও সীমাস্বর্গ স্পর্শ করে আছে। বিষ্ণুপুরের সোনামুখীর তসর ও রেশম শিল্প, রাজগ্রাম কেঞ্জাকুড়া সোনামুখীর কার্পাস শিল্প নব নব উদ্ভাবনী প্রতিভায় আজও উদ্ভাসিত। বিষ্ণুপুরের রেশম বস্ত্রের পাশাপাশি বালুচরী শাড়ী প্রস্তুতির খ্যাতিও লক্ষণীয় হয়ে উঠেছে।

এই সব মূল লোকশিল্প ছাড়াও বেলখোলার মালা, ভুরা তামাক, মাছ ধরা বঁড়শি, তাসের কাঠি, ঝিনুকের সৌখীন দ্রব্য, তুষু থলা ও চৌদল, ভাদু মূর্তি, রাবণ মূর্তি, গৃহ সজ্জায় ফ্রেস্‌কো বা দেওয়াল চিত্রণ, গাত্রচিত্রণ বা উল্কি, বারব্রতের আলপনা, পিষ্টক ও মিষ্টান্ন শিল্প, সোনারুপার গহনা, সাঁওতালী অলংকার শিল্প, চর্মশিল্প, বাঁশের কারুকাজ, বিড়ি শিল্প, লাক্ষা শিল্প, ডাকের কাজ বা সোলা শিল্প, লণ্ঠন শিল্প প্রভৃতি বাঁকুড়ার লোকশিল্পের বৈচিত্র্যময় ইতিহাস আজও রচনা করে চলেছে। আমাদের মনে রাখতে হবে, বাঁকুড়ায় কোন বৃহৎ শিল্প বা কারখানা নেই। সেই অভাবের পরিপ্রেক্ষিতেও বাঁকুড়ার লোকশিল্পের মূল্য অনেক বেশি।

১

বাঁকুড়ার পটেরি

ক.

ছেলেটি মারা গেল। সুস্থ, সবল, বর্ধিষ্ণু, পরিবারের ছেলে। বয়স ১২/১৩ বছর। সে কাক দেখেছিল। তাই মারা গেল। কাকের কথা বলতে বলতে মারা গেল। 'কর' পাড়ায় কান্নার রোল উঠলো। ঐ কাক, অন্য কিছু নয়, অশুভ আত্মা। অশুভ আত্মা কাকের হাওয়া কেমন করে দূর হবে? সত্যই কি ছেলেটি কাকের জন্য মারা গেল? এই প্রশ্ন সবার মনে। খবর গেল পটেরি পাড়ার জনৈক পটেরির কাছে। সে তার নিজের বাড়ীতে কাঁসার থালায় এক সময় জল ঢেলে দেখতে পেল সেই মৃত ছেলেটির মুখ. যাকে সে পূর্বে কোন দিন দেখেনি।[১] ছেলেটি জলের ছবি হয়ে কথা বলতে লাগলো, কাকের কথা, তার মৃত্যুদিনের কথা। পটুয়া ছবি এঁকে আনলো। কিন্তু পটের ছবির মুখটা দেখালোনা 'কর' পরিবারের পরিজনদের। পটেরি[২] গড় গড় করে বলে গেল ছেলেটির সম্বন্ধে সব কথা, অভ্রান্ত সব কথা যা তার জানার কথা নয়। ছেলেটির উপর অপদেবতার ভর হয়েছিল। তা দূর করা হল সংসার-সীমা থেকে। দূর করা হল অদ্ভুত উপায়ে। ছবির মুখে চোখ ছিল না। এখন চোখ-আঁকা হল, চোখের তারা দেওয়া হল। পটের ছবিতে চক্ষুদানের সঙ্গে সঙ্গে অপদেবতার ভর কেটে যায়, গৃহশান্তি ঘটে, এই বিশ্বাস একান্ত।[৩] ঘটনাটি ঘটেছিল বাঁকুড়া জেলার ছাতাপাথর [বাঁকুড়া শহরের অদূরে] গ্রামে।

পোটোরা এমন করে রোগ তাপ অপদেবতার পারণ করে বেড়ায় সাঁওতাল পাড়াতেও। তারা গুটানো পট খুলে খুলে দেখিয়ে বেড়ায় উচ্চ বর্ণের হিন্দু পাড়ায়, নিম্ন হিন্দু পাড়ায়, বিশেষ করে সাঁওতাল পাড়ায়। সাঁওতালদের কারো দুরারোগ্য অসুখ হলে পটেরিরা এসে তার ছবি এঁকে চক্ষুদান করে, অসুখ ভালো

১। জনৈক লক্ষ্মণ মাণ্ডি [সাঁওতাল] বললেন, সাঁওতাল বাড়ীর কেউ মারা গেলে পটোরা কি করে খবর পেয়ে আসে ও থালায় হলুদ জল ঢেলে মৃতের সব বৃত্তান্ত বলে দেয়।

২। বাঁকুড়ায় পোটো বা পটুয়াদের বলে পটেরি।

৩। দেব-দেবী মূর্তিতে চক্ষুদান অনুষ্ঠানের গুরুত্ব স্মরণ করিয়ে দেয়।

হয়ে যায়, বহুল পরিমাণে ভেট নিয়ে বাড়ী ফেরে। গোরু, কাপড়, থালা-বাটি, টাকাপয়সা, গয়না যার যেমন সামর্থ্য।

এই পটেরিদের সম্বন্ধে জানতে গিয়ে বিস্ময়ের পর বিস্ময় জেগেছে। এমন একটি পটেরি পাড়া বাঁকুড়ার বেলিয়াতোড় গ্রামে আছে। শিল্পী যামিনী রায়ের পৈত্রিক বাড়ীর প্রায় পাশেই। মৌজা জামবেদে।

গোকুল চিত্রকর, বয়স ৬০/৬৫ বছর, ও তাঁর জামাই প্রমথনাথ গায়েনের সঙ্গে আলাপ হল। পট দেখলাম, গান শুনলাম। মূলতঃ চারটি পরিবারের সমন্বয়ে এক উঠোনের পটেরি পাড়া, বড় দরিদ্র, বড় বেশী দরিদ্র। পুরুষের থেকে নারীর সংখ্যা বেশী দেখলাম। যতক্ষণ আমরা ওখানে ছিলাম, মেয়ে ও বালক-বালিকারা ভিড় করে এসেছিল। শুধু আসেন সামনের উঁচু দাওয়া খোড়ো ঘরটির পূর্ণ যৌবনবতী রমণীটি, শ্যামা দীর্ঘাঙ্গী বধূটি।

প্রমথনাথ গায়েনের বাড়ী ঘাটশিলা। তাঁর বয়স ৩২/৩৪ বছর। বছর পাঁচেক হল গোকুলের মেয়েকে বিয়ে করেছেন এবং বর্তমানে শ্বশুর বাড়ীতেই আছেন। গোকুলের মেয়ের নাম কাঞ্চন। নাম শুনেই চমকে উঠলাম।[৪] দেখলাম। ফর্সা-রঙ মেয়ে, মুখ নিচু করে মেয়েদের দঙ্গলের মধ্যে মাটিতে বসে আছে। প্রমথনাথের গলায় তুলসী মালা। তিনি মূলতঃ কীর্তনীয়া, কিন্তু এখানে শ্বশুরের মতো পট দেখিয়ে গান করে উপার্জন করেন। বেশ সপ্রতিভ, কালোবরণ, অনতিখর্বদেহ, শান্ত এবং মিষ্টি হাসির মানুষ। গলার স্বর ভালো, গলায় সুরও আছে। বাংলা এবং সাঁওতালী ভাষার গান গড় গড় করে গেয়ে যান। গোকুল চিত্রকরের পট-গান বলার ঢঙ ভালো নয়, ফোকলা দাঁতে উচ্চারণ আড়ষ্ট। কিন্তু প্রমথনাথ বেশ বুঝে বুঝিয়ে রসিয়ে সুর খেলিয়ে বলতে পারেন। তিনিই প্রধানতঃ সব গান কটি গাইলেন—মনসা পট-গান, কিষ্টপট-গান ও সাঁওতালী পট-গান। গোকুল গাইলেন মাত্র জগন্নাথ পট-গান।

পটেরিরা নিম্ন বর্ণের হিন্দু। কিন্তু এদের শিষ্য বা যজমান-প্রধানতঃ সাঁওতাল। এখানেও বিস্ময়। পটেরিরা হিন্দুর মতো পূজাপার্বণ করেন। বাড়িতে লক্ষ্মীপূজা হয়, একাদশী পূর্ণিমার উপবাস করেন মেয়েরা, বিপদ-তারিণীর বার করেন, ধর্মপূজা করেন। তখন হিন্দু ব্রাহ্মণদের ডাকা হয়, পয়সা দিলেই তাঁরা পূজা করতে আসেন। বিবাহের অনুষ্ঠান সংঘটিত হয় ঐ ব্রাহ্মণদের হাতেই। এঁদের পুরুষদের পরণে ধুতি, নারীদের শাড়ী। মেয়েরা শাঁখা চুড়ি

৪। সুভদ্রা, টুনিবালা প্রভৃতি অন্য মেয়েদের নাম।

সিঁদুরও ব্যবহার করেন দেখলাম। মেয়েরা আলতাও পরেছেন।[৫] ছেলেরা স্কুলে যেতে চায় না। একজন অল্প বয়সী এয়োকে দেখলাম যে পাশের 'সারদা বালিকা বিদ্যালয়ে' এককালে পড়তে যেত। উঠোনে ছাগল ঘুরছে এবং মুরগী। আর আছে সাদা ফুলেরপাপড়ি ঝরানো পিয়ারা গাছ আছে। একটি মহানিম গাছ, রবীন্দ্রনাথ যে গাছের নাম দিয়েছিলেন 'হিমঝুরি'।

এখানে গোকুল চিত্রকরদের তিন পুরুষের বাস। তাঁর বাবা দয়াল চিত্রকর যামিনী রায়ের সান্নিধ্য পেয়েছিলেন এবং ঠাকুরদা বিপিন চিত্রকর। এঁদের পূর্ব বাস ছিল মানবাজারের কাছে জরবাড়ীবড়দহিতে। ছেলেরা পট দেখিয়ে উপার্জন করে। মেয়েরা চুপড়ি করে আলতা, সিঁদুর, পুতুল, খেলনা বিক্রি করতে যায় গাঁয়ে গঞ্জে হাটে মেলায়। এঁদের একটি ছেলে রিক্সা চালায়। এঁদের কাছ থেকেই খোঁজ পাওয়া গেল পাশাপাশি বাঁকুড়া-পুরুলিয়া জেলায় পটেরি পাড়া অনেকগুলি আছে। যেমন লুয়াড়ি, আশাতোড়া, ভোঁড়েগোড়া, জামতোড়া, মল্যাণ, পিটিদরি [পুরুলিয়ায়] প্রভৃতি স্থানে পটিদাররা আছেন।

পট সুন্দর নয়, কিন্তু স্বভাবজ। পটোরিরা স্বভাব চিত্রকর। উপার্জনের উদ্দেশ্যে তাঁরা পট আঁকেন কিন্তু অংকন পদ্ধতি যতখানি সহজ-সরল হতে পারে ততখানি সহজ সরল। অংগবিন্যাসের ভুল থাকে, রঙ মেলানোর ভুল আছে পট লেখায়। সাধারণ সাদা কাগজের উপর আঁকা ছবির সারি। এক একটি কাহিনীকে অবলম্বন করে আঁকা। সবই পৌরাণিক কাহিনী অথবা দেবদেবী নির্ভর কাহিনী। আছে 'দাতাকর্ণ' কাহিনীর পট, 'কিষ্ট পট, 'জগন্নাথ পট'। একটিতে দুর্গা পট, অন্যটিতে কালী পট, তারপর যম পট এইভাবে সাজানো পটও পেয়েছি।[৭] 'যমপট' স্বতন্ত্র ভাবে অথবা অন্য যে কোন পটের সঙ্গে অংকিত হয়েছে দেখতে পাই। কিষ্ট পট বা জগন্নাথ পটের মধ্যে লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান।

পট আঁকা হয়েছে প্রধানতঃ কল্পনার রঙে। চলতি ছবির প্রভাবও আছে। কিন্তু অঙ্গসংস্থান, প্রেক্ষাপট নির্মাণ, বিষয়বস্তুর গুরুত্ব, রেখা ও রঙের পারম্পর্য কোথাও প্রথম শ্রেণীর শিল্পচাতুর্য প্রমাণ করে নি। সেইজন্য পট, চারুচিত্রকলার

৫। বিনয় ঘোষ 'পশ্চিমবঙ্গের চিত্রকর' [৬৯৯ পৃ, 'পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি']-দের মধ্যে মুসলমান ধর্ম গ্রহণের যে লক্ষণ দেখেছেন, এঁদের মধ্যে আমরা তা দেখতে পাইনি। এরা নিজেদেরকে হিন্দু বলতে চেয়েছেন।

৭। টুনিবালার স্বামী কিংকর চিত্রকরের [মৃত] আঁকা পটটি বেশ প্রাচীন।

নিদর্শন নয়, লোককলার নিদর্শন। পট প্রিয়দর্শন নয়, প্রিয়দর্শন না হলেও পরিণতদর্শন। এর মধ্যে কোন দেশখণ্ডের দীর্ঘদিনের লোকমানসের পরিণত রূপ ও স্বরূপ ফুটে ওঠে। সেই রূপ দেববিশ্বাসের রূপ, ধর্মনির্ভর জীবন বিশ্বাসের। কিন্তু পট দেখিয়ে পুরাণ কথা ততখানি বলা হয় না, যতখানি বলা হয় উপাসক বা ভক্তের প্রাণাবেগ ও ব্যাকুলতার কথা।

মৃত্তিকাজাত রং দিয়েই পট আঁকা হয়। প্রথমে সাদা কাগজের উপর কলম বা পেনসিল দিয়ে স্কেচ করে নেওয়া হয়, তারপর তার উপর রং চড়িয়ে ভরাট করা হয়। গেরিমাটি, এলামাটি বা হস্তেল, খড়ি, নীলবড়ি, ভূষো কালি, সিঁদুর, আলতা প্রভৃতি দিয়েই রঙের কাজ চলে। পটে কালো, লাল, হলদে ও সবুজ রঙের প্রাধান্য সহজেই চোখে পড়ে। কখনো কখনো গাঢ় নীল। প্রথমে পাথর বা মাটি জলে ঘসে দেখে নেওয়া হয় তার রং কি? পরে জলের সঙ্গে বেল আঠা বা নিম আঠা মিশিয়ে রং পাকা করে তারপর পাঁঠা ছাগলের ঘাড়ের লোম দিয়ে তৈরী তুলি দিয়ে রং লাগানো হয়। একটু একটু করে সব কটি পট আঁকা হয়ে গেলে সেগুলি সংলগ্ন করে একটি কাপড়ের উপর অথবা মোটা কাগজের উপর বসানো হয়। তারপর একদিকে এক হাত পরিমাণ লম্বা ছড়ি অথবা কাঠি বেঁধে দেওয়া হয়, সেই কাঠিটি ঘিরেই পট গুটানো থাকে। গান গেয়ে দেখানোর সময় ঐ গুটানো পট ধীরে ধীরে খুলে দেখানো হয়। বেশ প্রাচীন, অবহেলিত, ফেলে দেওয়া পটেরও রঙ এখনো অবিকৃত আছে দেখলাম। ইদানীংকালে পটে দোকান থেকে কেনা রঙ ব্যবহৃত হতে যেমন দেখা যায় তেমনি বিষয়ের আধুনিকতা নিয়ে আসা হয়েছে দেখা যায়।[৮] পট আঁকা শিক্ষা দেওয়া হয় বংশানুক্রমিক ভাবে। আমাদের প্রদর্শিত 'মনসা পট' এঁকেছেন গোকুল চিত্রকর, জগন্নাথ পট মেঘনাথ গুপ্তের[৯] আঁকা, কিন্তু পটটি এঁকেছেন প্রহ্লাদ পটিদার। প্রহ্লাদ ছাতনা থানার অন্তর্গত গেড়মালি গাঁয়ের মানুষ, বয়স প্রায় ৬০/৭০ বৎসর। এঁর কথা শোনা গেল গোকুল চিত্রকরের কাছে।

এবার পটের বিষয়ধারা অনুধাবন করা যেতে পারে। যেমন 'কিষ্ট পট'

৮। মথুর চিত্রকর, যে রিক্সা চালায়, তার আঁকা ছবি 'ভালোবাসা' ও 'রামকৃষ্ণ সারদা'। 'ভালবাসা' ছবি সিনেমা আর্টিস্টদের দেখে আঁকা মনে হয়। তাঁর আঁকা 'যৌবন' সুন্দর ও প্রশংসনীয়। মথুর চিত্রকরের বয়স ১৫।১৬ বছর।

৯। পটিকারদের উপাধি কখনো হয় 'চিত্রগুপ্ত'।

অর্থাৎ রাধাকৃষ্ণ পট। এই পটে রাধার প্রাধান্য নেই, গানের মধ্যে রাধা প্রধান হয়ে ওঠেন নি। প্রথম পটে আছে ললিতা-কৃষ্ণ-বিশাখার ছবি। এই ভাবে পর পর এগারোটি পট যোগ করে একটি গুটানো পটমালা। যথা: ললিতা কৃষ্ণ বিশাখা, শ্রীদাম সুদাম এবং যশোদার কোলে কৃষ্ণ, গোষ্ঠ যাত্রা, গোপীদের বস্ত্রহরণ, গাছের নীচে ননী খাবার জন্য কৃষ্ণ অপেক্ষা করছেন এবং অন্য দিক থেকে বড়াই বুড়ীর সঙ্গে আসছেন বিশাখা, রাধা-কৃষ্ণ ও বড়াই, মথুরায় এসে কৃষ্ণ দধি দুগ্ধ বেচছেন, নৌকা-বিলাস ও রাধাকৃষ্ণের যুগলমিলন—পদ্মপাতার উপর শয়ন করেছেন রাধা ও কৃষ্ণ, রাসবৃন্দাবন—এখানে যত গোপী তত কৃষ্ণ। কালীমাতার ছবি—শ্যামা কালী নীল রঙে আঁকা, শ্মশান কালী—কালো রঙে আঁকা। এই পটবৃত্তান্ত পড়লেই বোঝা যাবে রাধাকৃষ্ণকাহিনী অধ্যুষিত বাংলা দেশে, বিশেষ করে বাঁকুড়ায় [বাঁকুড়া জেলা আজও বিশেষ ভাবে বৈষ্ণব অধ্যুষিত] বাস করেও পটেরিরা নিজস্ব কাহিনী রচনার স্বাধীনতা নিয়েছেন, না হলে রাধার আগমন এত দেরীতে হত না, আর কৃষ্ণ মথুরাতে গিয়েও দধি দুগ্ধ বেচতেন না। সমস্ত পটবৃত্তান্ত যথাসম্ভব মধুর রসে রঞ্জিত করা হয়েছে এবং বাৎসল্য রসকেও অবলম্বন করা হয়েছে। কিন্তু ঐশ্বর্যময়তা সম্পূর্ণ বর্জন করা হয়েছে। গিরিগোবর্ধন ধারণ, কালীয়দমন, কংস বধ এই সব কাহিনীর কোন স্পর্শ এখানে নেই—যা বীররসাত্মক—যা ঐশ্বর্যময়। এ দিক থেকে গৌড়ীয় রাগানুগা ভক্তির মূল তত্ত্বটি, যুগলমিলন জাত প্রেম-ভাবনাটি—এখানে অনুসৃত হয়েছে। স্বভাব শিল্পী এখানেই সংস্কার বসে ঐতিহ্যের অনুপন্থী হয়েছেন। আরো লক্ষণীয়, পটে অশ্লীলতার সুযোগ গ্রহণ করা হয়নি। বস্ত্রহরণ দৃশ্য অংকনে যমুনার জলে নগ্ন গোপীদের নিম্নাঙ্গ সম্পূর্ণ ডুবে আছে এবং ঊর্ধ্বাঙ্গ প্রকট নয়। সবচেয়ে বিস্ময়কর কৃষ্ণকথা বর্ণনা করতে করতে কালীকথায় চলে আসা। এই অনুপ্রবেশ বা কালীর প্রাধান্য কেন কে উত্তর দেবে?

পট দেখিয়ে গান আরম্ভ হল:

জয় রাধে গোবিন্দ গোপাল গদাধর।
কৃষ্ণচন্দ্র কর কৃপা করুণা সাগর॥
জয় রাধে গোবিন্দ গোপাল বনমালী।
শ্রীরাধার প্রাণধন মুকুন্দমুরারী॥
হরিনাম বিনেরে ভাই গোবিন্দ নাম বিনে।
বিফলে মনুষ্য জন্ম যায় দিনে দিনে॥

দিন গেল মিছে কাজে রাত্রি গেল নিদ্রে।
না ভজিনু রাধাকৃষ্ণে চরণারবৃন্দে ॥
কৃষ্ণ ভজিবার তরে সংসারে আইনু।
মিছে মায়ায় বদ্ধ হয়ে বৃক্ষসম হৈনু।
ফলরূপে পুত্রকন্যা ডাল ভাঙি পড়ে।
কালরূপে সংসারেতে পক্ষবাসা করে ॥
আর কবে নিতাই চাঁদ করুণা করিবে।
সংসারে বাসনা মোর কবে দূরে যাবে ॥

গানের মধ্যে ভক্তের আকুলতা, সংসার থেকে মুক্তির অভিলাষ প্রকাশ পেয়েছে, পটের চিত্রশ্রেণীর সঙ্গে তার যোগ নেই। অথচ পট খুলে খুলে দেখাতে দেখাতে গান গাওয়া হচ্ছিল। গান শুনে মনে হয়, 'কৃষ্ণের অষ্টোত্তর শতনাম' বিষয়ক পুস্তিকা থেকে যেন নেওয়া হয়েছে। গানের মাঝে নরোত্তম দাসের ভণিতা আছে—'প্রার্থনা করয়ে সদা নরোত্তম দাস'। যমের চিঠির কথা আছে—'যমের চিঠি এলেরে অবশ্য যেতে হবে।' তাই 'এথা কর দান পুণ্য সেথা গেলে পাই/নিদারুণ যমের পুরে ধারে উধার নাই'—বলে সাবধান করা হয়। কিন্তু পটে যমপুরীর ছবি না থাকলেও—যমের ভয়ের সঙ্গে যমপুরীর বর্ণনা এসে গেছে সামান্য পরিমাণে—'পাপীর পাপের কথা না যায় কহনে/এথা যমদূত প্রহারিছে ধরি পাপীগণে'। তার পরই এসে গেল কালী বর্ণনা ও কালীবন্দনা। অতিশয় বীভৎসদর্শন কালীর ছবি চোখের উপর তুলে ধরে গান এগিয়ে চললো একটানা সুরে :

নম নম কালীমাতা নমিলাম চরণ।
তোমা বিনে কে করে মা সংকটে তারণ ॥
বাম হাতে কাতান কালীর ডান হাতে খর্পর।
রক্তধারা বহে কালীর মুখেরি উপর ॥
রণে মত্ত হয়ে মাতা মর্ত্য পানে চান।
সদা শিবের বুকে পদ দেখিবারে পান ॥
আধা জীব কাটিয়া কালী কৈলাসে পালান।
কৈলাসে পালান শিব 'সেনে' যোগাসন ॥

এই ভাবে কালীকাহিনী বর্ণিত হল অল্প কয়েকটি কলিতে। এরপর পুনরায় ফিরে এলো বৈষ্ণব কথা—'মনেতে করেছে মন এমন দিন কি যাবে/

গুরু না ভজিলে সে গোবিন্দ কোথা পাবে।' কিন্তু পটের গান এখানেই শেষ। গান শুনে বেশ বোঝা যায় কোন কোন অংশে গায়কের স্মৃতিভ্রংশ ঘটেছে এবং নানাস্থান থেকে কাহিনী এনে যোজনা করা হয়েছে।

খ.

মনসা পট দেখিয়ে একদিন[১০] গোকুল চিত্রকর গেয়েছিলেন :

জয় মা মনসাদেবী গো জয় বিষহরি।
অষ্ট গো নাগের মাথায় পরম সুন্দরী॥
সাতালি পর্বতে যে এই লোহার বাসঘর।
তায় শুয়ে গো নিন্দা করে বেউলা নখিন্দর॥
পথে পথে যায় নাগ গো করে ঝলঝল।
সম্মুখেতে দেখে কালি 'ডুয়ারী' জঙ্গল।

কিন্তু তাঁর জামাই গাইলেন এই রকম :

জয় মা মনসা দেবী জয় বিষহরি।
অষ্ট নাগের মাতা পরম সুন্দরী॥
নাগের হল খাট পালঙ্ক নাগের সিংহাসন।
মঙ্গলা বড়ার পৃষ্ঠে দেবীরি আসন॥
দেবী বলে শুন বেনে মোর বাক্য ধর।
বাম হস্তে ফুলে জলে মনসা পূজা কর।
যদি না পূজিবি বেনে মনসার ঘটবারি।
ছয় পুত্র খাবো রে ছয় বধূ করবো রাঁড়ি॥

কাহিনী বর্ণনার ঋজু গতি ও এক লক্ষ্যাভিমুখিতা অনন্য সাধারণ। এই মনসা পট গানটিতে ১৩৬টি চরণ আছে, কিন্তু তারই মধ্যে মূল মনসামঙ্গলকাব্যের সুবিশালত্ব[১১] ইঙ্গিতে ধরে দেওয়া হয়েছে। শংকায় দুরু দুরু হৃদয়ে সাতালি পর্বতে লোহার ঘরে বাসর যাপন এবং একের পর এক সর্পের আগমন পট-কাহিনীটির মধ্যে সবচেয়ে রোমাঞ্চকর অংশ। এবং শ্রেষ্ঠ অংশ কালনাগিনীর রূপমুগ্ধতা ও ন্যায়পরায়ণতার উদাহরণ। সর্বোপরি লক্ষিত হয় চাঁদ সদাগর চরিত্রের দৃঢ় বিশিষ্টতা ও আদিমতা, মূল মনসামঙ্গলকাব্যে এতখানি দেখা যায়

না।[১২] মনসামঙ্গল কাব্যের কাহিনী ও পট-গানের সঙ্গে কোন কোন স্থানে মিল ও অমিল পরিলক্ষিত হয়। পট গানের প্রথমেই মনসা প্রস্তাব করেছে—'বাম হস্তে ফুলে জলে মনসাপূজা কর'। বাম হস্তে মনসাপূজা করতে বলছেন স্বয়ং মনসা, একথা ভাবাই যায় না। মনসামঙ্গল কাব্যের কাহিনীর প্রথমাংশের চেয়ে পটগানের শেষাংশ খুবই সংক্ষিপ্ত। দীর্ঘ নদীযাত্রা, ঘাটে ঘাটে শবসঙ্গিনী বেহুলার বিপদ, দেবতা সমাজে নাচের আসরে বেহুলা নাচনির নাচ, মহাদেবের তুষ্টি, বরদান, মনসার পরাজয় স্বীকার, প্রত্যাবর্তন, চাঁদ সওদাগরের মানসিক পরিবর্তন ও পূজানিবেদনের আগে মনসার সঙ্গে সম্মানজনক সর্তে সন্ধি—প্রভৃতি পট গানে সবিশেষ বর্ণিত হয়নি। ঐ কাহিনীর প্রথমাংশে মনসার জন্ম ও মনসা-জীবন-বৃত্তান্ত সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। পট গানে মঙ্গলকাব্যের মত 'milk of humanity'র সঞ্চার খুব কমই আছে, যেমন আছে নারায়ণ দেবের কাব্যে। পট-গানে শৃঙ্গার রসের অবকাশ নেই, কিন্তু আছে ব্যঙ্গ কৌতুকের অভিপ্রকাশ। দেবী মনসা সরাসরি পূজা পাবার ইচ্ছা প্রকাশ করে শাসিয়ে দিল, তা শুনে চাঁদ চরিত্রের চমৎকারিত্ব ফুটে উঠেছে। 'গায়েনের' কণ্ঠে শুনি :

আড়চক্ষে চেয়ে বেনে মোচড়ায়ে দাড়ি।
কন্ধেতে তুলিয়া নাচে হেন্তালের বাড়ি॥
বলে চ্যাংমুড়ি কানির নাগাল যদি পাই।
মারিব হেন্তালে বেটির কমর চুমরাই॥

চাঁদের ছয় পুত্রের মৃত্যু ঘটালো ক্রুদ্ধ মনসা। শেষ পুত্র লখিন্দরের বিবাহের আয়োজন করতে দেরী হল না। নিছনি নগরে অমলা বেনেনির কন্যা বেহুলা নাচনির সঙ্গে বিবাহ সম্বন্ধ স্থির হল—'একদিন এসেছিল জনার্দন বুড়া / সম্বন্ধ গুছায়ে গেল সেই আঁটকুড়া'। মঙ্গলকাব্যের কনে পরীক্ষার বিচিত্র কাহিনী এখানে বাদ পড়েছে সত্য, কিন্তু দুটি মাত্র চরণে বিবাহ সম্বন্ধে লোকমানসটি অদ্ভুত-ভাবে ফুটে উঠেছে। বিবাহের উৎসব শুরু হল। লোহার বাসর ঘরে যখন বেহুলা লখিন্দর সুখে নিদ্রা যাচ্ছে তখন মনসা নেতার সঙ্গে যুক্তি করে

১২। পণ্ডিতেরা মনসামঙ্গল কাব্যের চাঁদসদাগরকে 'আদিম বর্বর পুরুষ' রূপে অভিহিত করেছেন। চাঁদের ক্রোধ, জিদ, পুত্র-মৃত্যুর পর মাছ-পান্তাভাত খাওয়া, মৃত্যুর সম্মুখে এসেও পদ্মফুলকে ঘৃণা—প্রভৃতি তাঁকে অন্ধ বর্বরশক্তির প্রতীক করে তুলেছে। কিন্তু শেষাংশে তাঁর চরিত্রের কমনীয় দিকটিও তুলে ধরেছেন। পট-গানে শেষাংশের কমনীয় বর্ণনা একেবারে নেই।

একের পর এক সাপ পাঠাতে লাগলো 'লখিন্দরে খেতে'। 'ভুজঙ্গজননী' মনসার ডাকে এল বঙ্করাজ, প্রথম প্রহরে সে বাসরে প্রবেশ করলো। তারপর গেল শঙ্খচূড। বেহুলা এখন জেগে উঠেছে। শঙ্খচূড়কে দেখে বেহুলার কৌতুক উচ্ছলিত হল :

বেহুলা বলেন কে দাদা আইস গো।
এতদিনে জানিলাম বাপের আছে পো॥
রাত্রিদিন কেঁদে মরি না দেখিয়া ঘরে।
অভাগিনী বন্দী আছি লোহার বাসরে॥
অমৃতাদি ক্ষীরি খাও বলি যে তোমারে।
সুখে নিদ্রা যাও তুমি হাঁড়িরি ভিতরে॥

এইভাবে কৌতুকে কৌশলে বন্দী হল শঙ্খচূড। সর্পশ্রেষ্ঠদের পরাজয় মনসাকে ভাবিয়ে তুললো। তাঁর দুশ্চিন্তার ভাষা : 'বুদ্ধি বল নেতা গো উপায় বল মোরে / বেহুলা নাচনি মোর নাগে বন্দী করে'। রজনীর শেষ প্রহরে নির্বাচিত হল কালনাগিনী। কালনাগিনী 'আরতি' পেয়ে চললো বাসর ঘরের দিকে। 'গায়েন' গাইতে লাগলেন :

উড়িল অঙ্গারে গুঁড়ি কালিরি নিশ্বাসে।
জয় জয় বলে কালি বাসরে প্রবেশে॥
সুতার সঞ্চারে কালি বাসরে 'সেমালো'।
এতদিনে নখিন্দরের বিধি বাম হল॥
বেহুলা নখার কোলে যেন কালানিধি।
যেমন কন্যা তেমনি বর মিলাইল বিধি॥
এমন সুন্দর নখার কোন খানে খাবো।
দেবী জিজ্ঞাসিলে তারে কি বোল বলিব॥
বিষম আরতি দেবী কেন হইল মোরে।
নখিন্দরে খেতে মোর শক্তি নাহি সরে॥

এখানে কবিত্বের চরম। নাগিনীর অন্তরের পরিচয় উদ্ঘাটিত করে কবি তাকে জীবন্ত মানুষে পরিণত করেছেন, দান করেছেন অপূর্ব ব্যক্তিত্ব। সর্পের সৌন্দর্যবোধ লক্ষণীয়। 'এমন সুন্দর নখা কোনখানে খাবো' : মৃত্যুর প্রেক্ষাপটে জীবনের উজ্জ্বল ছবি এমনি এক কথায় ফুটিয়ে তুলেছেন পট

গায়ক।[১৩] কিন্তু বাসরবর্ণনার, দেহবাদী আকাঙ্ক্ষার, মৃত্যু পরবর্তী কান্নার কোন মানবিক সম্ভাব্য কাহিনী বর্ণনার সুযোগ নেন নি পট গায়ক। যে সুযোগ নেওয়ার অবকাশ তাঁর ছিল, কারণ লোকমানসে বাসরবৃত্তান্ত অত্যন্ত উপাদেয় ভাবে রচিত হয়ে আছে।[১৪] কালনাগিনী ছল করে লখিন্দরের পায়ের কাছে গেল। তখনও বেহুলা নিয়তি মায়ায় ঘুমে অচৈতন্য। লখিন্দরের পদাঘাত পড়লো সাপের গায়ে, বিনা কারণে পদাঘাত-রূপ পাপের অবকাশে ছোবল দেবার সুযোগ পেল কালনাগিনী :

হে ধর্ম চন্দ্রসূর্য তোমরা থাকো সাক্ষী।
বিনা অপরাধে মোর মুণ্ডে মাইল লাথি॥
চন্দ্র সূর্যে সাক্ষী রেখে হানিল কামড়।
জ্বালায় অচেতন হৈয়া কান্দে নখিন্দর॥
জাগহ বেহুলে সায়বেনের ঝি।
তোরে পেলো কালনিদ্রা মোরে খেল কি।

শেষোক্ত পংক্তি দুটি মধ্যযুগের সমগ্র বাংলার আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে দিয়েছিল। বেদনার্ত এই চরম উক্তি প্রায় অবিকৃতভাবে মনসামঙ্গল কাব্যগুলিতেও আছে।

নেতা দৌড়ে গিয়ে চাঁদ সদাগরের কাছে তার শেষ পুত্রের মৃত্যুর খবর দিল। সনকা বেদনায় ব্যঙ্গমুখর হয়ে উঠলো। 'এখনো তোর সিঁথির সিঁদুর মলিন হল না, পায়ের আলতায়—অঙ্গের নববসনে ধূলা লাগলো না, তুই বিধবা হলি'—এই বলে পুত্রবধূ বেহুলাকে গাল দিল সনকা। বেহুলা উত্তর দিল বুদ্ধিমতীর মতো। কিন্তু এই সব শোকার্ত তীক্ষ্ণ কথোপকথনের মধ্যে চাঁদের উক্তিই তীক্ষ্ণতম। বাংলা সাহিত্যের প্রথম প্রকৃষ্ট পুরুষ চাঁদ পুত্রের মৃত্যু সংবাদে উল্লসিত হয়ে উঠেছে :

পুত্রেরি মরণ শুনে আনন্দিত হৈল।
হেতালের বাড়ি লৈয়া নাচিতে লাগিল॥
ভালো হৈল পুত্র মৈল কি ভাব বিষাদ।
চ্যাংমুড়ি কানি সহ ঘুচিল বিবাদ॥

১৩ কেতকদাসের মনসামঙ্গলে ঐ একই উক্তি পাই—'এ হেন সুন্দর গায় কোনখানে খাব/দেবী জিজ্ঞাসিলে তারে কি বোল বলিব'।

১৪। নারায়ণদেবের বাসর বর্ণনা জীবনবাদী ও শৃঙ্গাররসম্পৃক্ত।

কলার মান্দাসে স্বামীর শবদেহ নিয়ে বেহুলা ভেসে গেল গাঙুড়ের জলে। গদাঘাটা, শৃগালঘাটা পার হয়ে নেতা ধোপানীর সঙ্গে দেখা হল। তার সহায়তায় স্বর্গে গেল বেহুলা। নাচুনি বেহুলা স্বর্গে নাচের প্রতিভা প্রদর্শন করে আপন মনস্কামনা পূর্ণ করলো—সে কাহিনী মূল মঙ্গলকাব্যে দীর্ঘ। এখানে পট-গানে নিতান্তই সংক্ষিপ্ত। তাছাড়া মহাদেবের সামনে নয়, বেহুলা নেচেছে সরাসরি মনসার সামনে। এই নতুনত্ব লক্ষণীয়। নৃত্যমুগ্ধ মনসা বিবাদ ভুলে সহজেই বর দান করলো :

তখন নেতাইর সঙ্গে বেহুলা সুরপুরে গেল।
মনসার কাছে গিয়া নাচিতে নাগিল।
নাচ বাছা বেহুলা বাছিয়া মাগ বর।
কি বর মাগিব মাগো কাঞ্চন সুন্দর॥
দিলাম গো বেহুলা আমি দিলাম তোরে বর।
ছয় ভাসুর স্বামী লৈয়া যাও নিজ ঘর॥

অন্যদিকে চাঁদ সদাগরও শান্ত হল। অবশ্য তার মানসবিশ্লেষণ করার প্রয়োজন বোধ করেন নি পট গায়ক :

ছয় ভাসুর স্বামী জিয়াইয়া বেহুলা আইল ঘর।
হেথা মনসার পূজা করে চাঁদ সদাগর।

গ.

পটেরি পাড়ায় আমাদের সামনে যে চরম বিস্ময়টি ঘটেছে তা জগন্নাথ পট অবলম্বন করে। জগন্নাথ-সুভদ্রা-বলরাম পট দেখিয়ে জগন্নাথ মাহাত্ম্যের গান তাঁরা গাইলেন। হিন্দু পাড়ায় বাংলা ভাষায় এই গান যেমন করে গাওয়া হয়, তেমনি করে ঐ একই পট দেখিয়ে তাঁরা সাঁওতাল পাড়ায় সাঁওতালি গান গাইতে থাকেন। বাংলা ভাষায় জগন্নাথ পটের গানটি এই রকম :

অপূর্ব্ব কৌতুক কথা শুন সর্ব্বজনে।
নীলা ছলে অবতার অমৃত বচনে॥
এড়ায়ে যমের দায় চিত দেহ যদি।
এই কলি ভবে তরাবেন নিস্তার ভবনদী॥
বরণ চিকনমালা নবঘন শ্যাম।
অহনিশি অহদিশি দেখ কালাচাঁন॥

কপালে মানিক জ্বলে সোনার মুকুট।
ডগমগ কুণ্ডলে ঝলকে কর্ণপুট॥
বিচিত্র ভূষণ অঙ্গে কনেক বরণ।
এই সুভদ্রা ভগিনীর মধ্যে ভুবনমোহন॥
কে চিনিতে পারে প্রভুর অদ্ভুৎ লীলা।
বারো বাটি চাপিয়ে বসিল সপ্তশিল॥
বারো বাটি কুম্বেডা পাচিল মেগলাল।
সিংহদ্বারে বাজে কত খোলেরি মিনাল॥
প্রথম গোরুড স্তম্ভে যে বা দেন কোল।
আনন্দেতে ভক্তগণ সোব বলে হরিবোল॥
সন্ধ্যাতে আরতি প্রভুর ঝলমল করে।
এই রত্ন পিদিম জ্বলে প্রভুর গোচরে॥
রত্ন পিদিম জ্বলে ঘণ্টার বাজনা।
ধ্বনি মণি হল দূর দারুণ যন্ত্রনা॥
রহণে কুণ্ডেতে কাগ ত্যাজিল জীবন।
এই চতুর্ভুজ হয়ে কাগাজ বৈকুণ্ঠ গমন॥
চতুর্মুখ রম্ভা যে তার পাছে গোড়াইয়া।
বদন ছাড়ি অন্ন খান ছাডাইয়া॥
ছিঃ ছিঃ করিয়া গৌরী না কাড়িলেন কর
কুকুরের উচিষ্টন্ন খান দিগম্বর॥
আধখানি কই বল্ল হর ফেলাইলেন মুখে।
আধখানি কই বল্ল হর রাখেন মস্তকে॥
হরসঙ্গ করে গৌরী গৌরীমণি রথী।
জগবন্ধু বিশ্বমায়া দেখা দেন পথি॥
দেখিতে না পান গৌরী বহ্মাণ্ড ঈশ্বরে।
জটা হৈতে সেই অন্ন দিলেন তাহারে॥
অন্নের বাজারে বিচায় বিয়াল্লিশ বাজনা।
সুবন্নত্ত রাজ কুবির করে বেচা কিনা॥
ভাত বিচায় পিটা বিচায় আরো ভোগ লাড়ু।
মধুকুচি বাঞ্জনা তোরাণু গাড়ু গাড়ু॥

শুদ্দিরে আনিলে অন্ন ব্রাম্ভনেতে খায়।
নীলাছলে দেখুন প্রভু জাত নাহি যায়॥
কড়ি দিয়ে কিনে খায় কেউ হাড়িৎ ঝাটার বাড়ি।
এই কনেকচুর বালির মদ্দে যান গড়াগড়ি॥
কনেকচুর বালির মদ্দে যার মাংস গুঁড়ি।
বেমানে চাপিয়া বংশ যান সগ্‌গপুরী॥
রাজা ছিলেন ইন্দ্রদবন উড়িষ্যা ভিতর।
উনি বম্ভারে আনিতে গেল ষাট সহস্র বচ্ছর॥
কেন রাজা ইন্দ্রবদন এ বর মাগিলে।
আঠারোটি পুত্ত্ রাজার নিপাত করিলে॥
বাবা যে সুপুত্ত্ হলে বেটারে পোড়ায়।
এই বেটা যে সুপুত্ত্ হলে গয়ার সাগর যায়॥
গয়ার সাগরে পুত্ত্ হাতে নিবে কুশ।
এক বাক্যে উদ্ধারিবে শতেক পুরুষ॥
সুপুত্ত্ হইলে পথে নাম যে রাখিবে।
কুপুত্ত্ হইলে কত গালো খাওয়াইবে॥
ইয়ার কারণে প্রভু এই যে মাগি বর।
পুত্ত্ নিয়ে থাকো হে বম্ভার পদতল॥
কাটোয়ার ঘাটে বরণ চৈতন্য নিতাই।
হরি বোলে বাহু তুলে নাচে দুটি ভাই॥
এই ঠাকুর জগন্নাথ জগদিব্ দয়া।
নরলোক মেগে যে ঠাকুরের পদছায়া॥
এই ঠাকুর জগন্নাথ দিবেন সবারে বর।
এই জগন্নাথের কল্যাণে বাড়িবে বাড়ীঘর॥[১৫]

ভুল উচ্চারণে প্রায় সুরহীনতার মধ্যে দ্রুত গানটি শেষ করে দিলেন গোকুল চিত্রকর।

১৫। সমগ্র গানটিই তুলে দেওয়া হল। গানটির ভাষা সব সময় বোধগম্য হয়নি, কাহিনী-সূত্রও সব সময় ঠিক মতো অনুসরণ করা যায়নি। তাই যতদূর সম্ভব অপরিবর্তিত ভাবে গানটি তুলে দেবার চেষ্টা করা হয়েছে।

এরপর প্রমথনাথ গায়েন আরম্ভ করলেন বিস্ময়কর অধ্যায়টি। তিনি জগন্নাথ সুভদ্রা বলরামকে পরিণত করলেন যথাক্রমে সিংবোঙা, জাহের এরা, মারাংবুরু প্রভৃতি প্রধান তিন সাঁওতাল দেবতায়। তাঁর বিষয় সাঁওতাল জাতির উৎপত্তি বিষয়ে পৌরাণিক কাহিনী। মানব জাতির উৎপত্তি সম্বন্ধে যেমন ইডেন গার্ডেন, আদম-ইভ বিষয়ক কাহিনী পাশ্চাত্য পুরাণে প্রচলিত আছে, সাঁওতাল জাতির উৎপত্তি কাহিনীও অনেকটা সেই রকম। তবে পার্থক্য যেটুকু সেটুকু নিপুণ সৌন্দর্যবোধের ও চিরন্তন সত্যধর্মী ইঙ্গিতের।

এঁদের প্রদর্শিত সাঁওতালী পট দীর্ঘ। অনেকগুলি চিত্রখণ্ডের সমষ্টি। অংকনরীতি আধুনিক নয়, কিন্তু প্রদর্শিত পটটি অল্পদিন হল আঁকা। ধর্মভক্তির আবেদন আনুগত্যের সুর অথবা পাপ স্মরণ ও ক্ষালন মানসিকতা এই পটবর্ণনায় একেবারেই নেই। কাহিনী বর্ণনার সঙ্গে, পের গানের সঙ্গে পট চিত্রখণ্ডগুলির মিল চমৎকার। অন্যান্য গানগুলির মতো এই পটের সঙ্গে গানের অমিল বড় হয়ে চোখে পড়ে না।

সাঁওতালী ভাষায় কাহিনীটি আরম্ভ হল এই ভাবে :

> হান্‌কো জয় জয় সিংবোঙা মারাংবুরু তালারে জাহের এরা পিতল শিকড়িকো মালামাঃ বোঙাজাপড়াকো দিপিল্ কেনা। সিংবোঙারে নাইনি গাই, বাইনি গাই, মাহাসুন্দর কপিল গাই ডান কাঁড়গোলীনা বারেয়াফেঁড় ভাষায় লেনা এয়নাফেঁড় সিরণ্ কেনা ভাঁটিরে টাংলেন। অনা সেঁড়্রে বারিয়া দিজ কিং জনম্ লেনা। ইন্‌কিং দিজখন্ বারিয়া হাঁস হাঁসিল্ চেড়েকিং জনম্ লেনা, ইন্‌কিং চেঁড়ে কিং বিলিলয়না দিলিরে বারিয়া মানাবি দিগ্‌রে কিং জনম লেনা মিৎটং-কোড়া মিৎটংকুড়ি। এঁতুম্ কে কিনা পিল্‌চুহাড়াম্ পিলচুবুড়ী কিং জনম্ লেনা। নডে কাটকামরাজ ইচাহাকু বোলেইচা হররাজ নেরেরাজতে বসুমত। সিদ্‌জন্‌কেদা হারাবুরুকো হারায়েনা তেরা-বুরুকো হারায়েনা হাড মদ খনতা বুড়হিদ সেদায় টুংকি দিপিল্‌কাতে লঘুগুরু বীরকিং চালাও লেনা……

একটু থেমে তারপর প্রায় নাকি সুরে পরিচিত সাঁওতালী ঢঙে গান আরম্ভ হল :

> জান্ তেলে লিয়ে দো
>
> কাপি তেলে হেলে যা

তিকিং তারা সিং তালা ঠেকা গো
তিকিং তারা সিং তালা ঠেকা

সুর করে এই অংশ গাইবার পর আবার গদ্যবৃত্তান্ত আরম্ভ হল। এই ধারায় বর্ণনার মাঝখানে আর একটি গানের অংশ শুনতে পাওয়া গেল :

শারীরে থাল ভরা
শারীরে তাপেন্
আপে লাগি গেলে হারালেনা
ওহা আপে লাগি গেলে হারালেনা।
হানিনে লো থান্ রায়পুর রতনপুর
হাঁড়, উপর দাঁড়া বাগান
চা বাগান ঠাণ্ডা বাগান
তৈলবহু শিবির জো জো
সিঁড়ি চেতান্ থন্ দালে লুইআ গো
সিঁড় চেতান্ থন্ দালে লুইয়া—

এই গানের উক্তি মেয়েদের। পুনরায় পটচিত্র কাহিনী বর্ণনা। এই ভাবে তার মধ্যে আরও দুটি গান আছে। যথা :

জো জো এঁরুথান্ ঝামর্ গো
তালে এঁরুথান্ দিড়ম্ দিড়ম্।

সব শেষে পুনরায় মেয়েদের গান :

এনা কারন্ হো তে তে
আয়ু আপুইকিন্ এগেরেংথান্
আয়ু আপুইকিন্ এগেরেংথান্।
বাঁদো আগান বাঁদো কাছাড়
বাঁদো পাশি গুজুনাটে নাটা॥

এই ভাবে গানে ও গদ্যকথনে পট-আখ্যান শেষ হল। 'গায়েন' নিম্ন শ্রেণীর হিন্দু সমাজবদ্ধ মানুষ, সংকীর্তন গাওয়া তাঁর পেশা, কিন্তু পট, মনসা পটের গানে সুদক্ষ, তাঁর মুখে সাঁওতালী ভাষা ও গান অবলীলায় উচ্চারিত হতে দেখে আমরা অবাক হচ্ছিলাম।

'গায়েন' সাঁওতালী ভাষায় বর্ণিত কাহিনীটি পরে বাংলায় এইভাবে অর্থ করে দিলেন : 'আমাদের বাংলাতে বলা হচ্ছে জগন্নাথ, বলরাম, সুভদ্রা।

সাঁওতালী ভাষাতে আদি দেবতা সিংবোঙা, মারাংবুরু, জাহের এরা। সেখান থেকেই সাঁওতাল জাতির সৃষ্টি। স্বর্গের থেকে আইনি গাই, বাইনি গাই, কাপিল গাই, তারা নেমেছিল পাতালে। জল খেতে। যখন জল খেয়ে যাচ্ছে তাদের মুখ থেকে যে নালিটা পড়ছে, সেই নালির থেকে দুটো পোকার জন্ম হল। সেই পোকার থেকে দুটো হাঁস হাঁসিল হল। দুটো ডিম দিয়েছিল হাঁস হাঁসিলে। ডিম থেকে সেইখানে দুটো ছে'লের জন্ম হল। জন্ম হল পিলচুহাড়াম, পিলচুবুড়ী। সেইখানে কিছুদিন তারা থাকে। মানে বারো বছর রয়ে গেল একটা পাথরের খোঁদে। তারপর বড় হলে কি খাবে, তারা জঙ্গলে খন্তা টুকি লি করে, ওষুধপত্র খুঁড়বার জন্য গেল। জঙ্গলের নাম লঘু গুরুবীর জঙ্গল। ওষুধপত্র এনে করে, তখন ধান চাল ছিল না, তারা ঘাস-চাল হেঁড়ে রেখেছিল, মদ হবে বলে। মদ হেঁড়ে খেয়ে করে তাদের সাতবেটা সাতবেটি হল। তখন তারা দুজনাতে ঝগড়া করতে লাগলো। ঝগড়া শুনে মারাংবুরু বলছে তোমাদের কি কারণে ঝগড়া হচ্ছে? ঝগড়া করা তো ঠিক নয়। বুড়ী তখন বললো, আপনি আমাদের সামঞ্জস্য করে ভাগ করে দিন, আমি বুড়ার সঙ্গে থাকবো না। বুড়া তখন সাত বেটা নিল, বুড়ী নিল সাত বেটি। তারপর তারা দু'জনে দু'জাগাতে থাকে। কিছুদিন পরে বুড়া ছেলেদের নিয়ে শিকারে গেল জঙ্গলে। বুড়ী তার মেয়েদের নিয়ে জঙ্গলে শাক তুলবার জন্য গেল। সাত ভাই শিকার করে বেড়াচ্ছে, সাত বোন এখানে সেখানে শাক তুলে বেড়াচ্ছে। বেড়াতে বেড়াতে এক জায়গায় বটতলাতে চোদ্দজনা জুটলো। তখন তারা বললো, তোমরাও সাতজনা আছো, আমরাও সাতজনা। অতএব আমাদের বিবাহ হওয়া চাই। এই শুনে মেয়েগুলো অনেক রাগ করলো। তাইতো তোমাদের জাত কি? আমাদের জাতি কি, আমাদের তো জানা নাই। সেদিন সেখানে জাত বিভাগ হয়ে গেল। তারা অন্য অন্য গোত্র বলে দিল। বিবাহ হল। কপালে সিঁথিতে ধুলো দিয়ে, তখন তো সিঁদুরের ব্যবহার ছিল না। বিবাহ হবার পর যে যার ঘরে এসে পৌঁছাল। বিবাহ হবার পর সাঁওতালী জাতটা ক্রমে ক্রমে বাড়তে লাগল।[১৬]

এইখানে মানে বিবাহের উৎসব হল, নাচগান হতে লাগলো। 'চিল-বিঁধা

১৬। এখন সাঁওতালদের মধ্যে ভাই-বোনে বিবাহ হয় না। এঁদের জাতিভেদ প্রথাও প্রখর। কিস্কু, মাণ্ডি, হ্যাপাজ, সরেণ, মুর্মু, হাঁসদা প্রভৃতি উপাধি-ভিন্নতা সাঁওতাল সমাজে এখনও বিদ্যমান।

হাঁসদা' নামে একজন মানে চিল মারে। আর এইটা 'মুর্মু ঠাকুর'-এর 'দিরিচৌডন'—অর্থাৎ পাথরের পালকি। মুর্মু ঠাকুর সাঁওতালদের মধ্যে বড়। আর এইখানে কিস্‌কু আর মাণ্ডিতে বিবাদ হইছে।[১৭] এই ঘোড়াটা কিস্‌কুর। মাণ্ডি নেজে ধরে করে টেনে লিয়ে পালিয়ে যাচ্ছে। ই হচ্ছে 'গদা মাণ্ডি'। এর বারো হাত চুল। এ কাড়াবা গালি গেছে। এক নদীতে 'জয়নগর গড়াই' নদীর নাম, সেখানে চান করতে গিয়ে কয়েকটা চুল পড়ে গেছে। গদা মাণ্ডি ভাবলে এরকম ফেলে দেবো নাই। সে একটা পাতে করে চুলগুলো মুড়ে জলে ভাসিয়ে দিল। পাতটা ভেসে চলতে লাগলো। সেই নদীতে চান করতে এসেছে এক সাঁওতাল মেয়েছেলে, তার কামিনের সঙ্গে। দেখছে একটা পাতের পোঙাতে কি আছে। তুলে দেখে কি বারো হাত চুল। তারপরে ঘরেতে ফিরে একটা ঘরেতে শুই রইলো, তখন ওর মা বাবা বলছে, তাইতো মা আজ তুমি চান করে এসে কিছু খেলে নাই, শুয়ে পড়লে, কে তোমাকে গালিগালা করেছে কি, কি ব্যাপার হয়েছে তোমার। বললো—বাবা, কিছু ব্যাপার নয়, এই যে বারো হাত চুল, এ যার তাকে খুঁজে আনতে হবে, খুঁজে আনবার পর, সে যদি মেয়েছেলে হয় তবে তার সঙ্গে ফুল করবো, আর যদি বেটাছেলে হয় তবে বিবাহ করবো। এই করে তাকে খুঁজে আনবার পর বিবাহ হল। বিবাহের পরে এর সঙ্গের মেয়েছেলেগুলো বলছে তুমি এত সুন্দর দেখতে, হয়তো বামুনদের মেয়েছেলেদের মতো। আর ওর হয়তো হাতগুলো ঠুটো, পা ঠুটো, মুখটো হাওলা, এত পছন্দ হল যে একে বিয়ে করে ফেললে? তখন মেয়েছেলেটা রাগে কথা কয় না, খেতে দেয় না বরকে। বর তখন সহ্য করতে না পেরে কেটে ফেললো, সেই মেয়েছেলেটাকে। তারপরে এখানে ওকে পোড়ালো। পোড়াবার পর একটা এঁড়ে গরু চাই। তখন এখানে জাহের বোঙার নামে গরু কাটান করছে। মেয়েছেলে ঠিক মতো পারে নাই, কুঠার দিয়ে পিঠের দিকে মারতে গরুটা পালিয়ে যাচ্ছে, যখন রক্ত পড়তে থাকছে তখন পিছন দিক থেকে রক্ত পাত্রে ধরে নিয়ে রান্না করে ভাগ করে খাচ্ছে।

এখানে বাগালি ছেলেরা ঢ্যামনা সাপ পেয়েছে। ঢ্যামনা সাপ ছিলছে গাছে টাঙিয়ে। ছিলে করে এইখানে রান্না করছে। দু-এক পিস্‌ খেয়ে করে এই খানে 'মাঝি হাড়াম' মানে একজন মাননীয় লোক, খেয়ে করে নেশা হয়ে পড়ে গেছে।"

১৭. কিস্‌কু ও মাণ্ডির মধ্যে জাতিগত বিরোধী মনোভাব আজও তীব্রভাবে আছে।

সাঁওতালী পটবৃত্তান্ত এখানেই শেষ হল। কথ্য ভাষায় বর্ণিত এই গল্পের মধ্যে বাঁকুড়ি বাংলা শব্দও দু-একটি ব্যবহৃত হয়েছে যা আমরা অসংশোধিত রেখেছি। তবে বর্ণিত কাহিনীর মধ্যে ঐক্য রক্ষিত হয়েছে সাত ছেলে সাত মেয়ের বিবাহ পর্যন্ত। তারপর কাহিনী যেন অনেকটা ছাড়া ছাড়া, মনে হয় শেষ অংশে স্বতন্ত্র কাহিনী বর্ণিত হয়েছে।

যে পট-গান আমরা শুনলাম সেগুলি পটুয়িদের নিজের তৈরী কি না সন্দেহ আছে। তাঁরা বিভিন্ন বই থেকে অথবা অন্য খ্যাত পট-গায়কদের কাছ থেকে গানগুলি সংগ্রহ করেছেন। মুখে মুখে প্রচলিত প্রচারিত হয়ে আসছে এই সব গান বংশ-পরম্পরায়। আমরা সাধারণতঃ বীরভূম বা মেদিনীপুর জেলার পট সম্বন্ধে নানা রচনা পড়েছি কিন্তু বাঁকুড়া জেলার পট সম্বন্ধে কোন আলোচনা কোথাও পাইনি। বাঁকুড়ায় পট আছে এই খবরটি মাত্র বিনয় ঘোষ মশায় তাঁর গ্রন্থে বলেছেন, কিন্তু সামান্য আলোচনাও করেন নি। বাঁকুড়ার পট ও পট গান সম্বন্ধে আরও সন্ধান এবং আলোচনার প্রয়োজন আছে।

২

শিল্পীর হাতের তাস

ভূমিকা : দশাবতার ও নক্সা তাস

বাঁকুড়ার সন্তান যামিনী রায়ের চিত্রমালা যাঁরা দেখেছেন, যাঁরা বাঁকুড়ার মন্দির টেরাকোটার সৌন্দর্য উপভোগ করেছেন, যাঁরা বাঁকুড়ার পট ও পাটা-চিত্রণ দেখে মুগ্ধ হয়েছেন, তাঁদের বিষ্ণুপুরী তাসের সৌন্দর্যও অন্বেষণ করতে হবে। না হলে বাঁকুড়ার লোকশিল্পের শ্রেষ্ঠ কলাসৌন্দর্যের সঙ্গে পরিচয় অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। বিষ্ণুপুরের তাস এখন খেলার বিষয় নয়, সংরক্ষণের বিষয়—প্রত্নবস্তু। খেলার ভিন্নতর আনন্দের গণ্ডী অতিক্রম করে তাসের নিছক সৌন্দর্য অনুভব করার সুযোগ এখন এসেছে। বিষ্ণুপুরী তাস এখন খেলা হয় না বলেই তার মূল্য এখন অসীম। বিষ্ণুপুর, বাঁকুড়া সহর, রাজগ্রাম, অযোধ্যা, বেলিয়াতোড় প্রভৃতি স্থানে খোঁজ করে দেখেছি, এককালে বিষ্ণুপুরী তাস এইসব জায়গায় পরম উৎসাহে খেলা হত। যাঁরা খেলতেন তাঁদের দু-একজন এখনও জীবিত আছেন, কিন্তু খেলার আসর আর বসে না। একমাত্র পাঁচমুড়া গ্রামের কোন কোন ঘরে [বাঁকুড়ার ঘোড়া-হাতি, মনসার চালি ও বারিঘট, মাটির শাঁখ শিল্পের জন্য বিখ্যাত] বিষ্ণুপুরী তাস খেলার রেওয়াজ এখনও আছে।

বিষ্ণুপুরী তাস দু-ধরণের। এক. 'দশাবতার তাস'। দুই. 'নক্সা তাস'! দশাবতার তাস খেলতে হয় ১২০টি তাস সহযোগে। আর নক্সা তাস খেলতে হয় মাত্র ৪৮টি তাস দিয়ে। শুধু দশাবতার তাসের একশ কুড়িটি নমুনা যদি একস্থানে সাজিয়ে রাখা হয় তাহলেই রঙে রূপে অংকন সৌকর্যে যে সৌন্দর্যের-বিচ্ছুরণ ঘটায়, তার তুলনা হয় না। তার পাশাপাশি নক্সা তাসের আটচল্লিশটি নমুনা সাজিয়ে দিয়ে আমরা দেখছি—চোখ ফেরানো যায় না। রঙের সম্মিলিত উল্লাস, মূর্তিকলার সুনিপুণ রেখাভঙ্গি, বিচিত্র প্রতীকের ধারাবাহিক বিন্যাস খুবই চিত্তাকর্ষক। রঙের রূপের রসের সৌন্দর্যময়তার একটি বিচিত্র কাব্য যেন এই দ্বিদল তাসমালা!

এক. রাজা ও উজীর তাস

দশাবতার তাস হিন্দু পুরাণের দশটি অবতারের নামে নামাংকিত। তাসগুলি গোল গোল। তার প্রথম দশটিতে দশজন অবতারের ছবি অংকন করতে হয়। আবার দ্বিতীয় সারির তাসগুলিতেও দশজন অবতারের ছবি থাকবে। দশাবতার যথাক্রমে : মৎস্য, কূর্ম, বরাহ, নৃসিংহ, বামন, পরশুরাম, রাম, বলরাম, জগন্নাথ ও কল্কি। এই দশটি অবতার অংকিত প্রথম সারির তাসগুলি 'রাজা' নামক তাস। এখানে অবতার মূর্তিগুলি দেউল-পীঢ়া দেউলের বা মন্দিরের মধ্যে আঁকা থাকে। [এই পীঢ়া দেউলরীতি জগন্নাথ তাসে ভিন্ন গড়ন পেয়েছি এবং শেষ তাস কল্কি অবতারের তাসে আঁকা হয়েছে রথ। কল্কি আছেন মন্দিরে নয় রথে—রথের ছাউনি, রথচক্র, অশ্ব এবং সারথি প্রভৃতি দেখা যাচ্ছে। এগুলিই এর বৈচিত্র্য।] অবশ্য ভালো করে দেখলে বলতে হয়, এগুলি দেউল নয় অনেকটা পাল্কীর বা প্যাগোডার মতো[১]। ঐ মন্দির/দেউল দেখেই ধরতে হবে এগুলি 'রাজা' তাস। তার পরের দশটি তাস হচ্ছে 'উজীর' তাস। এই উজীর তাসগুলিতেও, দশটি তাসে দশজন অবতারের ছবি ক্রমানুসারে আঁকা। কিন্তু এই উজীর তাসগুলিতে মন্দির নেই, সারা জমির উপর একটি করে পূর্ণাবয়ব মূর্তি আঁকা। রাজা ও উজীর—এই দুই শ্রেণীর তাসই সুঅলংকৃত ও বহুবর্ণ রঞ্জিত। যাঁরা শুধু সৌন্দর্য-মুগ্ধ বিস্ময়ে বিষ্ণুপুরী তাস দেখতে চান তাঁরা এই শ্রেণীর চিত্রসৌন্দর্যের জন্যই সবিশেষ মুগ্ধ হবেন। দশাবতারের দেহের ভঙ্গি, গতিশীলতা, মুখাবয়ব, বস্ত্র ও অলংকার, অস্ত্র ও বাহন—এই সবই অতি নিখুঁত ভাবে নিপুণ তুলিতে আঁকা। চিত্র ধর্মের সমস্ত বৈশিষ্ট্য এগুলিতে আছে, উপরন্তু উপাদান ও উপকরণের অতীত রস ও ব্যঞ্জনায় এগুলি ধ্রুপদী শিল্পের গরিমা অর্জন করেছে। সর্বোপরি এগুলি হয়ে উঠেছে জীবন্ত এবং কাম্য প্রাণরসে সঞ্জীবিত। তারই মধ্যে মৎস্য বা নৃসিংহ, বামন বা পরশুরাম প্রভৃতি চিত্র একাধারে নাটকীয় ভাবে জীবন্ত ও গতিশীল। ঘোড়ার পিঠে কল্কি অস্ত্রধারী সওয়ার হলেও ঐ ছবিগুলোর মতো জীবন্ত নয়। পরশুরাম ও নৃসিংহ তাসগুলিতে রুদ্ররস এবং বামনে বিস্ময়। রাম অবতারের 'রাজা' তাসে রাম ও সীতা এবং 'উজীর' তাসে শুধু রাম করুণ রসের এবং জগন্নাথের উজীর তাসটিতে বীভৎস রসের উজ্জীবন সহজেই চোখে পড়ে।

১. অনেকটা চৈনিক বা তিব্বতী প্যাগোডার মতোই দেখতে লাগে, বিশেষ করে চূড়া অংশটি।

আর একটি বিষয় লক্ষণীয়। রাজা ও উজীর তাসের মূর্তিগুলির মুখ সাধারণত ডান দিকে বা বাম দিকে ফেরানো। কিন্তু জগন্নাথ তাস দুটিতে মুখ সামনে এবং কল্কি তাস দুটির মুখ মুখোমুখি। কল্কি তাস দুটি পাশাপাশি রাখলে মনে হয় যেন দু-জন দুজনের দিকে আক্রমণাত্মক ভঙ্গিতে এগিয়ে যাচ্ছে।

দুই. চিত্র ও প্রতীক পরিচয়

দশাবতার তাসের রাজা ও উজীর যথাক্রমে দশ+দশ=কুড়িটি তাসকে আলাদা আলাদা ভাবে দেখার যোগ্য। মৎস্যাবতার তাসের মূর্তি চতুর্ভুজ এবং নিম্নাংগ মৎস্যপুচ্ছ এবং মূর্তিটির দুপাশে দুটি বিস্মিতচক্ষু ভক্ত বা পার্শ্বচর মানুষের উপস্থিতি। এর উজীর তাসেও চতুর্ভুজ মৎস্যপুচ্ছ অবতার, কিন্তু চার হাতে আয়ুধ এবং সপুষ্প-পদ্মপত্র শোভিত জলধি প্রেক্ষাপট। উভয় মূর্তির অঙ্গেই আছে বসন, উত্তরীয় এবং মুকুট।

কূর্মাবতারের রাজা তাসে চতুর্ভুজ কূর্মাবতার এবং দুই পাশে দুই বিস্মিত পার্শ্বচর। ঐ উজীর তাসে অবতারের চতুর্ভুজে একই আয়ুধ ও পুষ্প এবং জলধি প্রেক্ষাপট।

বরাহ-অবতার তাসের রাজা ও উজীর চতুর্ভুজ কিন্তু মুখ বরাহ-মুখ—দীর্ঘ শ্বেতদন্ত সমন্বিত—অবশ্য চার হাতে চার আয়ুধ ও পুষ্প। এই মূর্তির হস্তধৃত আয়ুধে বৈচিত্র্য আছে।

নৃসিংহের [তাস শিল্পীরা উচ্চারণ করেন 'নরসিংহ'] রাজা ও উজীর উভয়েই চতুর্ভুজ। সিংহ মুখ অনেকটা অশ্বমুখাকৃতি[২]। কিন্তু লোল রক্তজিহ্বা ও বিস্ফারিত চক্ষু, ক্রোড়ে নিহত অসুরের করুণ মুখ—সব মিলিয়ে দারুণ 'এফেক্ট' সৃষ্টি হয়েছে। নৃসিংহের বর্ণ শ্বেত, নিহত হিরণকশিপুর গাত্রবর্ণ কালচে শ্যাম।

বামনাবতার পা ফেলে হাঁটছেন বা দৌড়চ্ছেন। তাঁর উর্ধ্ব-উত্থিত একটি পা, আর ভূমি স্পর্শ করছে না এমন দুটি পা স্পষ্ট। দ্বিভুজে (চতুর্ভুজ নয়) কমণ্ডলু ও গদা। বামনাবতারের মুখে বিস্ময়ের আভা এবং দীঘল আঁখিতে নারীধর্ম।

পরশুরাম কঠোর দৃষ্টি। তাঁর উত্তোলিত হাতে উদ্যত কুঠার এবং বাম

২. নৃসিংহ মূর্তির একটি খুব বড় টেরাকোটা স্ল্যাব আছে বিষ্ণুপুরের বিখ্যাত 'শ্যামরায়' মন্দিরের কোণের একটি ঘরের দেওয়ালে। তাসে কি তারই অনুকৃতি?

হস্তে ধনু। ঐ 'রাজা' তাসে পরশুরাম বসে আছেন। তিনি জটাজুট ও শ্মশ্রু সমন্বিত, কঠোর দৃষ্টি। সব মিলিয়ে প্রতিজ্ঞাদৃঢ় গম্ভীর মুখ। উজীর তাসের পরশুরাম ছুটে চলেছেন, কুঠার উর্ধ্বে তুলে ধরে, পা দুটি যেন ভূমি স্পর্শ করছে না। তাঁর বেশবাস উত্তরীয় সুভদ্র সুসজ্জিত।

রঘুনাথ রাম 'রাজা' তাসে রাম সীতাসহ বসে আছেন। নবদূর্বাদলশ্যাম রামের ডান হাতে তীর, বাম হাতে ধনু। উজীর তাসে সীতা অনুপস্থিত, একক চলন্ত রামের সামনে জোড় হাতে দাঁড়িয়ে আছে ভক্ত হনুমান। সীতার বেশবাস, পুষ্প-ব্যবহার ও অলংকারগুলি লক্ষণীয়। বামন আর রাম উভয়ের পায়েই আছে নূপুর, সীতার পায়েও নূপুর। সীতার খোঁপায় পুষ্প।

বলরাম তাসের বলরাম আমাদের পৌরাণিক ধারণার সঙ্গে ঠিক যেন মেলে না। একটু স্থূলবপু দীর্ঘাঙ্গ শ্বেতশুভ্র বলরাম সাজে সজ্জায় যেন গোপিনী-মনোহারী কৃষ্ণ। রাজা তাসে বলরাম উপবিষ্ট, তাঁর ডান হাতে গদা, বাম হাত শূন্য। কিন্তু ঐ উজীর তাসে বলরামের ডান হাতে 'হল', বাম হাতে শিঙা —এই মূর্তি বংশীধারী কৃষ্ণের মতো জোড়পায়ে দণ্ডায়মান। গলায় মালা, উত্তরীয়, নাসিকাভরণ, কণ্ঠাভরণ, বাহুবলয়, পদালংকার, রঞ্জিত বস্ত্র, দীঘল চোখ, পুঞ্জ পুঞ্জ দীর্ঘ কৃষ্ণ কেশদাম প্রভৃতি বলরামকে, বিশেষ করে উজীর তাসের বলরামকে, অনেকাংশে রমণীসুলভ সৌন্দর্যে মণ্ডিত করে তুলেছে।

জগন্নাথ তাসের রূপ পুরীর মন্দিরের দারুব্রহ্ম জগন্নাথের অনুরূপ, তবে অংকনরীতি অত্যন্ত সূক্ষ্ম এবং চাতুর্যপূর্ণ। এই তাসটি বুদ্ধাবতারের তাস। বুদ্ধ জগন্নাথরূপে বা জগন্নাথ বুদ্ধ রূপে কল্পিত হয়েছেন। পুরীর জগন্নাথ মন্দির আগে বুদ্ধ স্তূপ ছিল। কিন্তু সর্বভারতীয় দশাবতার তাসে এই বুদ্ধ নাকি পঞ্চম স্থানের অধিকারী 'সর্বভারতীয় দশাবতার তাসে ভাগবতের পর্যায়ক্রম অমান্য করে বিষ্ণুপুর এবং উড়িষ্যা একই সঙ্গে বুদ্ধদেবকে পঞ্চম স্থান দিয়েছে।'[৩] অন্যত্র শুনি—'প্রচলিত তাসের তালিকায় দেখা যায় যে, জগন্নাথ বা বুদ্ধের স্থান নবম—কল্কীর পূর্বে। কিন্তু তাসের অবতার বিন্যাসে জগন্নাথ বা বুদ্ধের স্থান পঞ্চম।'[৪] কিন্তু আমরা বিষ্ণুপুরী তাসে জগন্নাথকে [বুদ্ধকে] নবম স্থানের অধিকারী-ই দেখেছি। এই তাসটিতে মন্দিরের গঠন যেমন পূর্ববর্তী রাজা তাসগুলির মতো নয়, তেমনি মন্দিরের দুপাশে দুজন ভক্তের বা পার্শ্বচরের

উপস্থিতিও ঘটেনি—যা নাকি পূর্ববর্তী আটটি তাসে আছে। পরবর্তী কল্কি তাসেও রীতি সম্মত ভক্তের বা পার্শ্বচরের উপস্থিতি ঘটেনি। কেন এই ছন্দপতন? জগন্নাথ তাসের রাজা তাসে জগন্নাথ-সুভদ্রা-বলরাম কিন্তু উজীর তাসে চতুর্ভুজ, কৃষ্ণবর্ণ, কঠোর দৃষ্টি জগন্নাথ [?]—সব মিলিয়ে ভয়ংকরের[৫] সমাবেশ।

দশম বা শেষ তাস কল্কি। রাজা তাসের কল্কি শ্বেত অশ্ববাহন এবং রথারূঢ়, সারথি উপস্থিত। রথ চলছে। কল্কির বাম হাতে খড়্গ বা তলোয়ার। উজীর তাসের কল্কি ছুটন্ত কৃষ্ণ অশ্বের উপর উদগ্রীব হয়ে বসে আছেন, বাম হাতে বল্গা, ডান হাতে উদ্যত চাবুক।[৬] পুরাণের বর্ণনার সঙ্গে এই চিত্ররূপের ভাবগত মিল আছে।[৭]

এই হল রাজা ও উজীর মিলিয়ে প্রথম কুড়িটি তাসের বর্ণনা। অংকন চারুত্বে এই তাসগুলিই নিঃসন্দেহে শ্রেষ্ঠ। মাত্র এই কুড়িটি তাসই মূর্তিময়। বাকি একশটি তাসে কোন মূর্তি নেই। সেগুলি ফোঁটা তাস বা 'রঙ'। সেগুলি সবই প্রতীক চিহ্নিত। ফোঁটা হিসাবে তাসগুলি এক্কা, দোক্কা, তেক্কা বা তিক্কী,

চৌকা, পঞ্জা, ছক্কা, সাত্তা, আটা, নয় বা নক্কা এবং দশ—এই ভাবে বিভক্ত। এক্কা তাসে একটি প্রতীক চিহ্ন, পঞ্জায় পাঁচটি প্রতীক চিহ্ন, নক্কায় ন-টি প্রতীক চিহ্ন—এই ভাবে পর পর এক-দুই-তিন ইত্যাদি পর্যায়ক্রমে প্রতীক চিহ্ন অংকিত হয়। কিন্তু কোন্ অবতারের কোন প্রতীক ? নিচে তালিকা দেওয়া হল :

অবতার	প্রতীক
মৎস্যাবতার	মাছ
কূর্মাবতার	কচ্ছপ
বরাহাবতার	শংখ
নৃসিংহাবতার	চক্র
বামনাবতার	কমণ্ডলু
পরশুরামাবতার	কুঠার
রামাবতার	তীর
বলরামাবতার	গদা
জগন্নাথাবতার	পদ্ম
কল্কিঅবতার	খড়্গ

রাজা, উজীর, এক্কা, দোক্কা, তিক্কী, চৌকা, পঞ্জা, ছক্কা, সাত্তা, আটা, নয় বা নক্কা, দশ—এই ভাবে বারোটি তাস এক এক 'সেটে' বা 'সোলে'। দশাবতারের দশটি সেটে একশ কুড়িটি তাস।

প্রতীক চিহ্নিত একশটি তাসের মধ্যে 'এক্কা' তাসগুলিই সুন্দর করে আঁকা একটি মাত্র প্রতীক [চক্র বা পদ্ম বা খড়্গ যাই হোক না কেন ?] বলে অনেকখানি জমিতে [আমাদের আলোচিত প্রতিটি তাসের ব্যাস প্রায় ৪১/২ ইঞ্চি] আঁকা হয়েছে প্রয়োজনীয় স্বাচ্ছন্দ্য নিয়ে। তাই রাজা বা উজীর তাসের পরেই এক্কা তাসগুলির স্থান—সৌন্দর্য-বিন্যাসের দিক থেকেও। প্রতিটি তাসেই একটা, দুটো, তিনটে, চারটে প্রভৃতি প্রতীক ছাড়াও আলাদা ভাবে একটি করে ফুল আঁকা হয়েছে। এমন কি জগন্নাথ তাস 'সেটে'র প্রতীক 'পদ্ম'—তারও সঙ্গে ঐ ফুলটি আছে। প্রতীক তাসগুলির মধ্যে সব চেয়ে সুন্দর পদ্ম-প্রতীক সম্বলিত তাসগুলি এবং সূক্ষ্ম কারুকার্যময় কল্কি তাসের প্রতীক খড়্গ চিহ্নিত তাসগুলি।

তিন. বর্ণ বৈচিত্র্য ও অংকন পদ্ধতি

তাসগুলির বর্ণ-বৈচিত্র্যও লক্ষণীয়। তাসগুলিতে কি কি রঙ ব্যবহৃত হয়েছে এবং রঙ গুলির উপাদান কি তার তালিকা নিচে দেওয়া হল :

লাল—মেটে রঙ অর্থাৎ গেরিমাটির রঙ। কখনো বা 'মনোলাল' বাজার থেকে কেনা হয়।

কালো—ভূষা কালির প্যাকেট বাজার থেকে কেনা হয়।

সবুজ—হলদি রঙ বা হস্তেলের সঙ্গে কাপড়কাচা নীল রঙ মিশিয়ে তৈরী হয়।

ফ্যারকা সবুজ—অর্থাৎ হালকা সবুজ, কলাপাতি সবুজ। এটি মিশ্রণজাত রঙ।

হলুদ—পিউড়ী বা হস্তেল। হস্তেল মেটে রঙ।

সাদা—সাদা রঙ বাজার থেকে কিনতে হয়।

মহিষ রঙ—মহিষের গায়ের মতো রঙ। পাংশুটে। কালো রঙের বা ভূষোর কালির সঙ্গে সাদা খড়িমাটি মিশিয়ে এই রঙ তৈরী হয়।

নীল—নীলবড়ি থেকে নীল রঙ।

বাসন্তী—হলদের সঙ্গে লাল মিশিয়ে করা হয়।

চকোলেট—গেরিমাটির লাল রঙের সঙ্গে মেশাতে হয় সামান্য কালো। এটিকে খয়েরী রঙও বলা যায়।

দশাবতারের দশ শ্রেণীর তাসে এই দশটি রঙ ব্যবহৃত হয়েছে। সব কটি তাসই, কী রাজা, কী উজীর, কী প্রতীক—বহুবর্ণ রঞ্জিত। তবে রাজা উজীর তাসেই বর্ণচ্ছটা বর্ণগরিমা অধিক। এক এক শ্রেণীর তাস এক এক রঙের জমির উপর আঁকা। কোন্ কোন্ তাস কোন্ কোন্ রঙের জমিনের উপর আঁকা নীচে তার তালিকা দিলাম :

তাস	জমিন
মৎস্য	কালো
কূর্ম	খয়েরি বা চকোলেট
বরাহ	সবুজ
নৃসিংহ	ধূসর বা মহিষ রঙ
বামন	নীল
পরশুরাম	সাদা
রাম	লাল
বলরাম	ফ্যারকা সবুজ
জগন্নাথ	হলুদ
কল্কি	সিঁদুরে রঙ

একশো কুড়িটি তাসের মধ্যে সব রঙ সমান মর্যাদা পেয়েছে। তবু মনে হয়

লাল রঙের প্রতি একটু বেশী টান। মৎস্যের জমিনে, বলরামের কুঠারে, রামের তীরে এবং জগন্নাথের পদ্ম বোঁটায় কালো রঙ ব্যবহার করা হয়েছে মুন্সীয়ানার সঙ্গে[৮] ছবিতে ব্যবহৃত সূক্ষ্ম, স্থূল, বক্র, সরল প্রভৃতি রেখা আঁকা হয়েছে অত্যন্ত সাধারণ তুলি দিয়ে। তুলি তৈরী হয় ছাগলের লোম দিয়ে। দশাবতার ছবি বা প্রতীক বা নক্সা সব কিছুই জলরঙে আঁকা তেলরঙে নয়। রঙের চিট তৈরী হয় প্রয়োজন অনুসারে রঙের সঙ্গে বেল আঠা বা গঁদ আঠা মিশিয়ে।

চার. তাস তৈরীর পদ্ধতি

তাস অংকনের পদ্ধতির মতো তাস নির্মাণেরও বিশেষ পদ্ধতি আছে। এক সেট তাস তৈরী করতে অর্থাৎ একশ কুড়িটি তাসের জন্য অনেকগুলি তেঁতুল বীজ লাগে।[৯] তেঁতুল বীজগুলো প্রথমে বালিখোলায় অল্প আঁচে ভাজতে হয়। তারপর সেগুলিকে জলে ভিজিয়ে রাখতে হয়। ভালো ভাবে ভিজলে হাতের ঘসা দিয়ে কচ্‌লে কচ্‌লে তেঁতুল বীজের লাল খোসাগুলো তুলে দিতে হয়। পড়ে থাকে তেঁতুল বীজের প্রধান সাদা অংশ। ঠাণ্ডা জলে ভালো করে ধুয়ে ঐ সাদা বীজগুলো নোড়া দিয়ে শিলে মিহি করে বাটতে হয়। তারপর সেই বাটা বীজ জল মিশ্রিত করে উনুনে চাপাতে হয়। উনুনে মৃদু জ্বাল দিয়ে নেড়ে নেড়ে 'চিট' তৈরী করতে হয়। বেশ ঘন আঠালো চিট তৈরী হয়ে গেলে তাকে বলে 'কাই'। একটি কাপড়ে ঢেলে কাইটা ভালো করে ছেঁকে নিতে হয়। এবার তিন ভাগ কাইয়ের সঙ্গে এক ভাগ গুঁড়ো চকখড়ি ভালো করে মেশাতে হবে। সাদা চকখড়ি। একটি সমতল জায়গার উপর সাধারণ কাপড়ের একটি ফালির [হয়তো তিন হাত লম্বা দু-হাত চওড়া, কী তারও বেশী] উপর ঐ কাইটা ভাবে কাপড়ের এপিঠ ওপিঠ লেপে দিয়ে একটু শুকিয়ে যাবার জন্য অপেক্ষা করতে হবে। তার উপর আবার এক ফালি কাপড় মেলে দিয়ে তার উপর আবার কাই লেপতে হবে। এই ভাবে তিন ভাঁজ কাপড় উপর উপর রেখে কাই লেপা হয়। ঐ লেপা কাপড় ৫/৬ দিন ধরে রোদে শুকিয়ে নিতে হবে। শুকনো হলে মনে হবে যেন 'ট্যান' করা দুপিট সাদা চামড়া। এই প্রস্তুত

৮. আমরা যে সব তাসের বর্ণনা এখানে দিলাম সেগুলি সবই সুধীর ফৌজদার [৬০], শাখারী বাজার [মনসাতলা], বিষ্ণুপুর-এর আঁকা। একই উঠোনে তাঁর পাশের ঘরে ভাস্কর ফৌজদারও তাস তৈরী করেন। তাঁর তাসের বর্ণরঞ্জন, মূর্তিকলা, প্রতীকাংকন স্বভাবতই ভিন্ন শিল্প দৃষ্টির পরিচয় বহন করছে। তাঁর তাসগুলি আরও একটু ছোট, প্রায় চার ইঞ্চি ব্যাসের।

৯. প্রায় দেড় কেজি থেকে দু-কেজি তেঁতুল বীজ লাগে।

কাপড়কে বলা হয় 'পট'। এবার একটা বিশেষ সমতল পাথর দিয়ে ঘষে ঘষে মসৃণ করা হয়। অবশ্য কাপড় আছে বলে এখন আর বোঝা যাচ্ছে না। এই পটের উপর এঁরা পটুয়াদের মতো পটও আঁকেন অর্ডার পেলে। জমিন মসৃণ হয়ে গেলে টিনের গোল চাকতি 'ধাঁচা' ফেলে সাইজ মতো গোল গোল করে ঐ পট কেটে নিতে হবে। কাটা গোল তাসগুলির 'বর্ডার'ও মসৃণ করা হয় একটি বিশেষ 'কাঠি' দিয়ে অর্থাৎ কাঠের তৈরী একটি বিশেষ যন্ত্র দিয়ে। এটিকে ধার বাঁধা কাঠিও বলে। কাটা তাস-খণ্ডগুলি শিলের উপর রেখে 'নোড়া' পাথর দিয়ে সাবধানে ঘসে ঘসে আরও একবার মসৃণ করা হয়। দুই তল ও পরিধি মসৃণ হয়ে গেলে শিরিষ আঠা লাগিয়ে দেওয়া হয় ধারগুলিতে। এখন আর কাপড়ের ফালিগুলি খুলে যাবে না কোনমতে এবং বোঝাও যাবে না কাপড় আছে বলে। এই ভাবে তাসের 'জমিন' তৈরী হয়ে গেলে এক পিঠে নক্সা আঁকা চলতে থাকে। তাসের পিছন ও অপর পিঠে সাবু জল দিয়ে ফুটিয়ে ঠাণ্ডা করে নিয়ে লাগানো হয় খুব পাতলা করে। ছবি আঁকার সঙ্গে সঙ্গে তাসগুলোকে রোদে শুকনো করতে দেওয়া হয়। অবশ্য মূল ছবি আঁকার আগে রঙ দিয়ে 'স্কেচ' বা ছবির আদল এঁকে নেওয়া হয়। একে বলে 'হড়ক' বা দাগার কাজ। এর পর এর উপর চোখ মুখ ও অলংকরণ। তাস শুকনো হলে তার উপর পাতলা গালার প্রলেপ দেওয়া হয়। স্পিরিটে গুলে গালাকে নরম ও পাতলা করা হয়। গালার প্রলেপ হালকা করে দিয়ে দিলে রোদে জলে তাসের পিঠের ছবির রঙ নষ্ট হবে না। এই ভাবে তাস তৈরী হয়ে যায়।

তারপরে তাসগুলিকে 'বতর' করতে হয়। শুকনো সমস্ত তাসগুলিকে সারারাত উন্মুক্ত প্রান্তরে বা ছাদে মেলে দিয়ে রাতের হিম ও শিশির খাওয়াতে হয়। এবং সকালের অল্প রোদ লাগিয়ে তাসগুলি তুলে নিতে হয়। একেই বলে 'বতর' করা। বতর করে নিলে তাস বাঁকে না, ফাটে না বা ভাঙে না। এই তাস যেমন মজবুত তেমনি টেঁকসই। বসে বা দূর থেকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েও এই তাস খেলা চলে। কারণ তৈরী তাস খটখটে শক্ত।

কাগজের আধুনিক তাসের মতো এগুলি হাল্কা না হলেও বিশেষ ভারি নয়[১০] দশাবতার তাস ও নক্সা তাস প্রমাণ করে যে কত অকিঞ্চিৎকর বস্তু দিয়ে কী

১০. ৪½ ইঞ্চি ব্যাসের ১২০টি তাস আমরা ওজন করে দেখেছি, ওজন হয়েছে ১ কেজি ৪½ শ' গ্রামের মতো।

অপূর্ব সৌন্দর্য-সম্ভারই না তৈরী করা যায়। দরবারী তাসের মতো সোনাদানা[১১] এতে লাগে না, কিন্তু রূপদর্শীর কাছে এসব তাস সোনার চেয়ে দামী।

পাঁচ. ক্রীড়া পদ্ধতি

যেহেতু খেলা, সেহেতু মুখে বলে তাস খেলার পদ্ধতি ঠিক বোঝানো যায় না বা বর্ণনা পড়ে সম্যক্ বোঝাও যায় না। তবে দশাবতার তাস খেলার পদ্ধতি কি রকম ছিল মোটামুটি বর্ণনা করেছেন বিনয় ঘোষ ও মানিকলাল সিংহ নিজ নিজ গ্রন্থে। [১২]

আমরা দশাবতার তাস-খেলা সম্বন্ধে বর্ণনা শুনেছি শ্রীনিরঞ্জন কুণ্ডুর [৬১] কাছ থেকে। তাঁর নিবাস শাঁখারীপাড়া, বিষ্ণুপুর। আধুনিক তাসের সংখ্যা ও ক্রীড়া পদ্ধতির সঙ্গে বিশেষ অমিল আছে দশাবতার তাস খেলার পদ্ধতির। আধুনিক তাসের গঠন আয়তাকার, এর চারটি রঙ—ইস্কাপন, হরতন, রুইতন, চিড়িতন। কিন্তু দশাবতার তাস বৃত্তাকার এবং এর রঙ দশটি। দশটি রাজা ও উজিরের আরও দশটা করে প্রতীক বা ফোঁটা তাস। দশাবতার তাস খেলতে হয় পাঁচ জনে এবং তারা স্ব স্বপ্রধান। আধুনিক তাসের মতো এ তাস জোড়ে খেলা যায় না। পাঁচ জনের খেলা, তাই প্রত্যেকের ভাগে পড়ে চব্বিশটি করে তাস। দশাবতারের মধ্যে প্রথম স্থানীয় তাস হচ্ছে প্রথম পাঁচটি তাস অর্থাৎ মৎস্য, কূর্ম, বরাহ, নৃসিংহ ও বামন। তবে starting তাস রাত্রে খেললে একরকম, দিনে খেললে আর-এক রকম, গোধূলিতে খেললে আবার অন্য রকম। দিনের বেলায় খেললে starting তাস হবে রঘুনাথ অর্থাৎ রামাবতার তাস, রাত্রে খেললে মৎস্যাবতার এবং গোধূলিতে খেললে নৃসিংহ। 'রাম', যখন রাজা তখন তিনি হবেন দু-পীঠের [দু-দস্তের] মলিক, আর 'মীন' যখন রাজা তখন তিনি হবেন এক পীঠের মালিক। গোধূলিতে নৃসিংহকে রাজা করে দু-এক পীঠ খেলা হয়। যিনি start করেন তিনি যদি এক হাতে রাজা ও উজীরসহ থাকেন অর্থাৎ 'জোড়ে' থাকেন—সে জোড় দেখাতে হবে অন্য পার্টিকে এবং নামিয়ে রাখতে হবে।

এই খেলা সম্বন্ধে নিরঞ্জনবাবু একটি সুন্দর কথা বলেছেন : 'দশাবতার তাস খেলার মধ্য দিয়ে ভগবানকে ডাকার সুযোগ হয়, যা অন্য কোন তাস খেলায় নেই।'[১৩] তিনি আরও বলেন : 'দশাবতার তাসে জুয়াখেলা হত না বা হয় না, জুয়াখেলা হত নক্সা তাসে। ১৯৩৫ সালের কথা বলছি, তখন এক পয়সায় ছিল চার পয়েণ্ট।' নিরঞ্জনবাবুর মতই এই খেলা জানেন বিষ্ণুপুরের গুইরাম গিরি [মাড়ুই বাজার], করুণাময় সরকার [মিলনশ্রী সিনেমাতলা] প্রভৃতি ব্যক্তিরা।

ছয়. দশাবতার তাসের উৎস সন্ধানে

বিষ্ণুপুরী দশাবতার তাস বৌদ্ধ প্রভাবে জাত—পালযুগে উদ্ভূত, না মোঘল তাসের[১৪] অনুকরণে সৃষ্ট এ-নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ আছে। বিষ্ণুপুরাধিপতি মল্লরাজাদের সহস্র কীর্তির মতই যে একটি অবিস্মরণীয় কীর্তি এই দশাবতার তাসখেলার প্রচলন—সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। বুদ্ধকে জগন্নাথ ভাবা এবং জগন্নাথের প্রতীক চিহ্ন হিসাবে তাসে পদ্ম ফুলের ব্যবহার পদ্মপানি বুদ্ধকেই স্মরণ করায়—সে সম্বন্ধেও সন্দেহের অবকাশ নেই। জগন্নাথ-বুদ্ধ ও বৌদ্ধ প্রভাব নিয়ে যুক্তিপূর্ণ আলোচনা করেছেন হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ও বিনয় ঘোষ প্রভৃতি পণ্ডিতেরা [১৫] অন্যদিকে মোঘল তাস খেলার প্রবর্তক আকবর এবং আকবরের সঙ্গে মল্লরাজাদের যোগাযোগ প্রভৃতি বিষয়ে আলোকপাত করেছেন মানিকলাল সিংহ। তাঁর সিদ্ধান্তও উড়িয়ে দেওয়া যায় না। সবিশেষ পর্যালোচনা করে এবং বিভিন্ন সময়ে অংকিত দশাবতার তাসগুলি দেখে[১৬] আমাদের মনে হয়েছে বাঁকুড়া-বিষ্ণুপুরের সংস্কৃতি ধর্মের ইতিহাস অনুযায়ী, দশাবতার তাসেও দুই সংস্কৃতিধারা হিন্দুধারা ও মুসলমান-মোঘলধারার মিশ্রণ ঘটেছে। যদিচ হিন্দুধারার স্বাক্ষরই দশাবতার তাসে প্রবল। মহামহোপাধ্যায়

হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর[১৭] বিশ্লেষণ পন্থানুসরণ করে বিনয় ঘোষ মশায় সিদ্ধান্তে পৌঁচেছেন যে : 'দশাবতার তাস পাল যুগে উদ্ভাবিত হওয়া আদৌ আশ্চর্য নয়। মল্লরাজারা তখন মল্লভূমের অধীশ্বর হয়েছেন। বিশেষ করে, দশাবতার তাসের চিত্র এবং সেই চিত্রাংকনের পদ্ধতি দেখলে মনে হয়, পালযুগের সমৃদ্ধি কালেই এই খেলা, এই শিল্প ও শিল্পীদের বিকাশ হয়েছিল।'[১৮] অন্য দিকে মানিকলাল সিংহের সিদ্ধান্ত : 'সম্রাট আকবরের আমলের মুঘল তাসগুলির অনুকরণে অল্প বিস্তর পরিবর্তন করিয়া চীন, উড়িষ্যা ও মল্লরাজা বীরহাম্বীরের রাজধানী বিষ্ণুপুরে চক্রাকার তাস নির্মিত হয়।'[১৯] তিনি এই দশাবতার তাস খেলার প্রচলন-সময় হিসাবে বলেছেন : 'তাসগুলি একাদশ শতাব্দীর পরবর্তী' এবং 'মুঘল তাসের অনুকরণে একেবারে সপ্তদশ শতাব্দীতে চালু' হয়েছে।[২০] যাই হোক, এই দশাবতার তাস খেলা মল্লভূমের তৎকালীন বৈষ্ণব-ভাব প্লাবনের সঙ্গে সুগভীর ভাবে যুক্ত হয়েছিল। খেলাধুলার মধ্যেও যে গোষ্ঠীগত মানস ধর্ম ও দেশাচারগত সমাজ ধর্মের আবেগ মূর্ত হয়ে উঠতে পারে তার নমুনা যেমন মধ্যযুগের নবাবদের শতরঞ্চ খেলা, তেমনি আধুনিক যুগের সাহেব বিবি গোলাম তাস খেলা। মল্লভূমের মন্দির টেরাকোটায় যেমন দশাবতার মূর্তিসজ্জা এক বিশেষ শিল্প motif, তেমনি দশাবতার তাসও বিশেষ ক্রীড়া motif, এর প্রতিচিত্রন।

সাত. নক্সা তাসের কথা

নক্সা তাস মল্লভূম বিষ্ণুপুরে কবে থেকে প্রচলিত হয়েছে সে সম্বন্ধে পণ্ডিতেরা আলোচনা করেন নি। তবে সব দিক দেখে শুনে মনে হয়, এই তাস খেলার প্রচলন দশাবতার তাসখেলার প্রচলনের পর হয়েছিল। মোঘল আমলের 'গঞ্জিকা' তাসের ১৪৪টি তাসের জায়গায় ৯৬টি তাসের প্রচলন করে যেমন আকবর বাদশা একটু সহজ খেলার উদ্ভাবন করেছিলেন ; নক্সা তাসও তেমনি দশাবতার তাসের ১২০টির স্থানে ৪৮টি তাসের খেলা চলিত করেছিলেন কোন

এক মল্লরাজা। নক্সা [নকসা নয়] তাস খেলার আসরও তেমন বসে না আজকাল মল্লভূমে। তবে কখনো কখনো জুয়া খেলা চলে। নক্সা তাসের নির্মাণরীতি দশাবতার তাসের নির্মাণরীতির অনুরূপ এবং অংকনরীতিও তদনুরূপ। নক্সা তাসের চিত্র প্রভৃতির মধ্যেও দশাবতার তাসের চিত্র প্রভৃতির প্রভাব লক্ষণীয়।

তবে দশাবতার তাসে সব মিলিয়ে যেমন একটি সচেতন পৌরাণিক সংহতি ও দেশজ বিশ্বাস, একটি সুসংহত ও ধারাবাহিক মানসিকতার ইতিহাস ফুটে উঠেছে, নক্সা তাসে তা নেই। নক্সা তাসে চিত্রগুলির মধ্যে বৈচিত্র্যের প্রতি আগ্রহ ফুটে উঠেছে। মাত্র ৪৮টি তাস নিয়ে এই নক্সা তাসমালা।

৪৮টি তাস মোট বারো সেটে বিন্যস্ত। প্রতি সেটে চারটি করে তাস। তাসগুলির মান এক থেকে বারো ফোঁটা পর্যন্ত। যথা: সাহেব ১২, বিবি ১১, ফুল ১০, ফুল ৯, ফুল ৮, তলোয়ার ৭, চৌকা ফুল ৬, ফুল ৫, শংখ ৪, পত্র ৩, পালোয়ান ২, পরী বা নর্তকী ১। এক ফোঁটায় একটা নর্তকী আঁকা, চার ফোঁটার জন্য চারটি শংখ, নয় ফোঁটার জন্য নয়টি ফুল—এই ভাবে অংকিত। প্রতিটি ছবি বা বিষয়ে চারটি করে তাস। চারটি পঞ্জা চারটি আটা বা চারটি বিবি—এইভাবে। অনেকগুলি ফুল চিহ্নিত তাস থাকলেও ফুলগুলি আলাদা আলাদা ধরণে অংকিত। এক্কা তাস অর্থাৎ এক ফোঁটার তাসগুলিতে অংকিত একটি দণ্ডায়মান নারী। এই নারীকে কেউ বলেছেন নর্তকী, কিন্তু তাসশিল্পীরা বললেন 'পরী'। 'একজন পরী বা নর্তকী গাছের ডাল ধরে দাঁড়িয়ে আছে'—শিল্পীদের উক্তি। কিন্তু ঠিক গাছের ডাল আঁকা হয়নি। ঘাঘরা ও চেলি পরিহিতা এই সালংকারা সুবেণীবদ্ধা দীঘল-নয়না নারীটির মধ্যে কার স্মৃতি? বারো ফোঁটার তাস 'গজপতি'তে [যাকে বলা হয় সাহেব] একটি গজের উপর দুজন আরোহী—বসে আছে, যাদের উভয়ের মাথাতে আছে টুপি এবং উভয়েরই মুখ রমণীসুলভ। হাতিটিকে চালনা করা হচ্ছে এবং হাতিটি একটি বাঘকে পদদলিত করছে। মানিকলাল সিংহ বলেছেন: 'বার মানের তাসটি গজারূঢ় উড়িষ্যা-রাজ গজপতির মূর্তি।'[২১] বিবি অর্থাৎ এগারো মানের তাসের ছবিটিও অভিনব। একটি সুসজ্জিত সাদা ঘোড়ার পিঠে সওয়ার হয়েছে একজন নারী। ঘোড়াটিকে চালনা করছে। ঘোড়া ছুটছে। নারীটি অর্থাৎ বিবি মাথার উপর তুলে ধরেছে দুই হাতে ধরা চাবুক। তার পোষাক লক্ষণীয়। দীর্ঘ হাতা জোব্বার মত

---

২১. তদেব।

মত জামা, পায়জামা ও মাথায় টুপি, কোমরে কোমরবন্ধ। ঠিক নারী বলে মনে হয় না। ঘোড়ার বল্গা হাত দিয়ে ধরে নেই। দেখলে মনে হয়, সার্কাসে ঘোড়ার খেলা চলছে। এই তাসটির ঘোড়া ও সাজ পোষাকের সঙ্গে দশাবতার তাসের কল্কি রাজা তাসের সাজ-পোষাকের মিল কেউ কেউ লক্ষ্য করেছেন। দুক্কী অর্থাৎ দুই ফোঁটার তাসে আছে দুটি 'জোকার', প্রকৃত পক্ষে দুজন পালোয়ান মল্লযুদ্ধে রত হয়ে মুখোমুখী তাল ঠুকছে। এদের দীর্ঘ টিকি, গলায় তুলসীমালা ও স্থূল বপু হাস্যকর। আলোচ্য এই চার সেট তাসেই মানুষের ছবি। বাকি আট সেট তাসে শংখ, পুষ্প ও পত্রের ছবি। তার মধ্যে পুষ্পের প্রতি পৌন-পুনিক আগ্রহ লক্ষণীয়। মনুষ্যাংকিত তাসগুলিই মূল তাস, বাকি ৩৬খানা ফোঁটা তাস।

জুয়া খেলার জন্যেও এই তাস খেলা হত। এতে চার, পাঁচ বা ততোধিক খেলোয়াড় অংশ গ্রহণ করতে পারতো। ১৭ ফোঁটার খেলা। যে আগে ১৭ ফোঁটা পাবে তারই জিৎ। যে কোন দুটি তাসের মিলনে ১৭ ফোঁটা হলেই 'নক্সা' হয়ে যেতো।

আট. তাস শিল্পীদের পরিচয়

বিনয় ঘোষ মশায়ের 'পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি' গ্রন্থটির প্রথম প্রকাশ জানুয়ারী ১৯৫৭ খ্রীস্টাব্দ। অর্থাৎ তার আগেই তিনি বিষ্ণুপুরের তাস শিল্পীদের সঙ্গে পরিচিত হন। তিনি লিখেছেন: 'মৃত্তিকা শিল্পীদের মধ্যে গদাধর ফৌজদার, সতীশ ফৌজদার, কেদার সূত্রধর প্রভৃতির যথেষ্ট সুনাম ছিল এবং দশাবতার তাস চিত্রণেও তাঁরা প্রচুর সুখ্যাতি অর্জন করেছিলেন। বর্তমানে যতীন ফৌজদার, সুধীর ফৌজদার, পটল ফৌজদার, ভানুপদ পাল, অনিল সূত্রধর প্রভৃতি শিল্পীরা বিষ্ণুপুরে পরিচিত। চিত্রবিদ্যার পারদর্শিতা ক্রমেই এদের কমে যাচ্ছে। কারণ বর্তমানে সমাজে এঁদের চিত্র বা মূর্তির সমাদর নেই।' বিনয়বাবুর এই বিবৃতি প্রকাশের পর প্রায় দীর্ঘ তেইশ বছর কেটে গেছে। তাস শিল্পীদের বর্তমান অবস্থা কি হয়েছে দেখা যাক।

বিনয় ঘোষ শিল্পীদের যে তালিকা দিয়েছেন তাঁদের মধ্যে সুধীর ফৌজদার এখনো বেঁচে আছেন। তাঁর আঁকা দশাবতার তাস আমরা দেখেছি এবং সংগ্রহ করেছি। মূলতঃ তাঁরই আঁকা তাসের উপর নির্ভর করে আমাদের এই আলোচনা। সুধীর এখন বিষ্ণুপুরে জে. এল. আর. অফিসের নাইট গার্ড। অর্ডার পেলেই অবসর সময়ে তিনি এখনও তাস আঁকেন। মাটির ছোট ছোট

নানান মূর্তি খেলনা ও বড় দেবদেবী মূর্তি তৈরী করেন। অর্ডার পেলে গুটোনো পটও তৈরী করেন। তাঁর এইসব কাজে সাহায্য করেন তাঁর স্ত্রী কমলা ফৌজদার এবং তাঁর পুত্রকন্যারা। তাঁর বড় ছেলে বাঁশরী স্কুল ফাইনাল পাশ, স্ট্যাম্প কালেক্টার—বিবাহিত এবং একটি অফিসের বেয়ারার। তার টেম্পোরারি চাকরী আট বছরেও পার্মানেন্ট হয়নি। তার বয়স প্রায় ২৫ বছর। সুধীর ফৌজদারের অন্যান্য ছেলেমেয়েদের নাম বাবলু [২২], বিদ্যুৎ [১৮], গণেশ [১৬] প্রশান্ত [১৪]। চারটি কন্যার মধ্যে পারুল ও জ্যোৎস্নার বিবাহ হয়ে গেছে, ছবি ও শ্যামলী এখনো ছোট।

তিনটি ঘরের একটি উঠোনের দুদিকে তিনটি মাটির দেওয়াল খড়ের ঘরে তিনটি শিল্পী পরিবার থাকে। সুধীর ফৌজদারের এতগুলি ছেলেমেয়ের সংসারে মাত্র দুখানি ঘর। ঐ তিনটি শিল্পী পরিবারের মধ্যে আর একজন তাস আঁকেন, তাঁর নাম ভাস্কর ফৌজদার। বয়স প্রায় ৫০/৫১ বছর। অবিবাহিত। তাঁর পিতার নাম ৺মানগোবিন্দ ফৌজদার। তিনি কাঠের কাজ ও মৃত্তিকাশিল্পের কাজও করেন। বিষ্ণুপুরের ঝাঁপানে এই পরিবার থেকেই বড় মনসা মূর্তি তৈরী করে নিয়ে যাওয়া হয়। অন্যান্য দেবদেবীর মূর্তি দুর্গা, কালী, গৌরনিতাই, লক্ষ্মী, কার্তিক, ষড়ভুজ গৌরাঙ্গ, সরস্বতী মূর্তিও এঁরা তৈরী করেন।

এঁদের আর্থিক ও সামাজিক কোন দিকেই সচ্ছল অবস্থা নয়। ঘরদুয়ারের অবস্থাও খুব ভালো নয়। বিনয় ঘোষ কথিত অধিকাংশ তাসশিল্পী মারা গেছেন। তবে সুধীর, পটল, ভানু ও অনিল বেঁচে আছেন। বহুকাল আগে মৃত সতীশ ফৌজদারের অংকিত তাস এককালে আশুতোষ মিউজিয়ামে সংগৃহীত হয়েছিল। আজকাল কেউ কেউ তাসশিল্প ও তাস শিল্পীদের সম্বন্ধে তাচ্ছিল্য প্রকাশ করেন।[২২] কিন্তু তাসশিল্প ও শিল্পীদের সামগ্রিক পরিচয় একাধারে আনন্দ, বিস্ময় ও শ্রদ্ধার। এই তাসশিল্পীরা বিষ্ণুপুরের শাঁখারী বাজারে থাকেন। এখানের সবাই প্রায় কারুশিল্পী। তাস শিল্পীরা City of Art বিষ্ণুপুরের গৌরব। এঁদের অবলুপ্তি এক সুন্দর শিল্পধারার অবলুপ্তি। সরকার ও সুধী জনগণের তাই এঁদের রক্ষার ব্যবস্থা করা অবশ্য কর্তব্য।[২৩]

তাস শিল্পীদের পূর্বপুরুষের আদি নিবাস ছিল বাঁকুড়া জেলার পূর্বে কোতুলপুর অঞ্চলের লাউগ্রামে। তখন তাঁদের উপাধি ছিল 'সর্দার'। বিষ্ণুপুর রাজ জগৎমল্লের কাছ থেকে পরবর্তীকালে তাঁরা 'ফৌজদার' উপাধি পান। তাঁরা বৃত্তিতে তখন ছিলেন সৈনিক। পরে সেনাপতির পদও লাভ করে ছিলেন। রাজার কাছ থেকে অনেক জমিজায়গা পেয়েছিলেন। কৃষ্ণবাঁধের পাড়ের জমি-গুলি ছিল তাঁদের। আজ আর কোন জমি তাঁদের নেই। সৈনিক বৃত্তি ছাড়াও তাঁদের অন্যান্য কর্তব্য পালন করতে হত সুনিয়মিত ভাবে। তার মধ্যে 'ইঁদ কাটা' একটি। ইঁদ পরব অনুষ্ঠানে সাহায্য করা। দুর্গা পূজায় বিজয়ার দিন ঠাকুরকে সড়ক দরজা [পাথর দরজা] পার করানোও তাঁদের কাজ ছিল। এখন সে সব শিল্পীবংশের কাছে স্মৃতি মাত্র।

৩
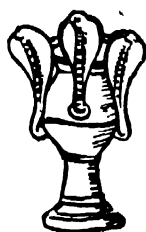
কোয়ালি গান

চল্লিশ-বিয়াল্লিশ বছরের বৈষ্ণব মানুষটি নাম বললো শ্রীমান মাণিক দাস কবিরাজ। আমি ছাড়া আর সকলেই হেসে উঠলেন। আমার হাসি পায়নি, কারণ আমি জানতাম 'শ্রীমান' ও 'শ্রীযুক্ত' শব্দ দুটির অর্থ এক। প্রাচীন পুঁথিতে এইভাবে নাম লেখার অর্থাৎ 'শ্রীমান' লেখার বহু উদাহরণ পাওয়া যায়। 'শ্রীমান' যে কবে থেকে অল্প বয়স্কদের নামে বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হতে শুরু হয়েছে ত' গবেষণার বিষয়।

শ্রীমান মাণিকদাস কবিরাজের সঙ্গে আলাপ হল অদ্ভুত ভাবে। গিয়েছিলাম নড়রা, ছোটখাটো গ্রাম নয়, বর্ধিষ্ণু গ্রাম। বাঁকুড়া-দুর্গাপুর সড়কের মাঝামাঝি নেমে ডান হাতি কিছুদূর যেতে হয়েছিল। ওখানে মন্দির দেখতে গিয়েছিলাম, 'রাধাবল্লভ' নবরত্ন মন্দির আর পিতলের রথ। নড়রার তাম্বুলী পাড়ার মন্দির দেখা শেষ করে লক্ষ্মীনারায়ণ দে মশায়ের বাড়ীতে বসে বিশ্রাম করছি, এমন সময় দেখি, একজন কালো রঙ, মুখে বসন্তের দাগ সাদামাটা মানুষ ডান হাতের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ ও তর্জনীতে দুটি ছোট ছোট পিতলের পাতলা খঞ্জনী বেঁধে বাজাতে বাজাতে পথে হেঁটে আসছে। তার বাঁ কাঁধে ঝুলছে ময়লা কাপড়ের ঝোলা, চালে ডালে আনাজে ভর্তি। তার পিছু পিছু হৈ চৈ করে চলেছে এক পাল ছেলে।

কোয়ালি গায়ক! 'এই লোকটি কোয়ালি গান করে'—পার্শ্ববর্তী ভদ্রলোকেরা বললেন। কোয়ালি গান, সে আবার কি? লোকটিকে বসানো হল আমার সামনে। সমবেত ভাবে অনুরোধ করা হল গান ধরার জন্য। ক্লান্ত লোকটি হয়তো ক্ষুধার্ত, আমার দিকে নম্র লাজুক চোখ দুটি একবার তুলে দু-বার গলা ঝেড়ে, গান ধরলো। নিখাদ পঞ্চমে স্বর খেলছে, পয়ারে বাঁধা গানের ভাষা সরল টানে উচ্চারণ করছে, আর সেই কণ্ঠস্বরে উচ্ছলিত হচ্ছে ভক্তিস্রোত। চোখ বন্ধ করে, হাঁটুভোর ধূলির আস্তর পরা লোকটি গাইছিল:

নম নম ব্রাহ্মণ্য ভগবতী গঙ্গে।
কতদিনে হেরিব মা সুমেরি তরঙ্গে॥

পরিচ্ছন্ন তীব্র গলায় এমন তীক্ষ্ণ স্পষ্ট উচ্চারণ, সহজ একটানা সুরের গানকে বিশিষ্ট করে তুলছিল। সে গানের সুর ও আবেগ আমাদের সকলেরই মন স্পর্শ করছিল।

কোয়ালি গান গরুকে বন্দনা করে রচিত ও গীত হয়। গীত হয় হিন্দুর ঘরে ঘরে। বছরের যে কোন দিন যে কোন ঘরের দুয়ারে গিয়ে দাঁড়ায় কোয়ালি গায়ক। বাড়ীর গিন্নীমায়ের কাছে আবেদন করে, তাঁর অনুমতি পেলে গোয়ালে গিয়ে গরুর কাছে গান হয়। সারা বছরের যে কোন দিন গরু-ভক্তি ও গরু-পূজার গান গাওয়া হলেও, ভাদ্রমাসেই এই গান বেশি গাওয়া হয়। কারণ এইসময় গো-পার্বণ প্রভৃতি হিন্দু অনুষ্ঠানগুলি চলে। রাধা অষ্টমীর দিন গোয়ালপূজা—ভগবতী পূজা। গৃহস্থ ঘরে ভগবতীর মূর্তি থাকে, বেলকাঠের অথবা পিতলের মূর্তি। হাঁড়ির ভিতর ধান, তার ভিতর অর্থাৎ লক্ষ্মীর সাজের মধ্যে ভগবতী-মূর্তি রাখা হয়। রাঢ় অঞ্চলে গরু আর লক্ষ্মী একই মানসিকতায় পূজিত হয়। বঙ্গদেশের সর্বত্র ভগবতী পূজা বা গোয়ালপূজা প্রচলিত আছে। তার সঙ্গে কোয়ালি গানও শোনা যায়। হুগলী জেলায় গোয়ালপূজা আছে, কোয়ালি গানও শোনা যায়। দার্জিলিং জেলাতেও কোয়ালি গান বিখ্যাত।[১] মানভূম অঞ্চলে সারা কার্ত্তিক মাস ধরে কোয়ালি অর্থাৎ কপিলা গান চলে। বিহারে কোয়ালি গায়ককে গোয়ালঘরে বসে কিছু না কিছু খেতে হয়, তাতে গৃহস্থের পুণ্য হয়। বাঁকুড়ার ঘরে ঘরে গান গেয়ে কোয়ালি গায়কেরা পয়সা চাল ইত্যাদি পায় দক্ষিণা হিসাবে। ভগবতীর পূজা হয় বৎসরে প্রতি তিনমাসে—ভাদ্র, পৌষ ও চৈত্র মাসে। প্রতি তিন মাসের শুক্লপক্ষের বৃহস্পতিবারে পূজা হয়। পূজা করেন ব্রাহ্মণ পুরোহিত। বেতের পালি, গোটা সুপারি, আর পৌষ মাসে নতুন সাদা ধানের উপর রাখা হয় ভগবতী মূর্তি। ১লা মাঘ 'এখাণ'[২] দিনে রাত্রে পূজা হয়, উঠানপূজা—বার-লক্ষ্মী অর্থাৎ ভগবতী। শিয়াল না ডাকলে বার্ থেকে [উঠান থেকে] লক্ষ্মীকে ঘরে তোলা হয় না।

১। দার্জিলিং ও হুগলী জেলার কোয়ালি গানের পরিচয় 'পরিশিষ্ট' অংশে দেওয়া হল।

২। বাঁকুড়া জেলায় এই উপলক্ষে বিশেষ পরব হয়।

'কোয়ালি' শব্দটি 'কপিলা' শব্দ থেকে এসেছে। কপিলাই ভগবতী। কোয়ালি গায়কেরা বংশানুক্রমিক গায়ক। আমাদের সামনে বসে যে শ্রীমান মাণিকদাস গান করছে, সেও গান শিখেছে তার পিতার কাছ থেকে।[৩] একমাত্র মুসলমান ছাড়া সব ঘরেই গান করতে হয় এদের। বীরভূম, বর্ধমান ঝুমকা, ধানবাদ প্রভৃতি দূরাঞ্চলেও এরা গান করতে যায়।

গান একটানা গেয়ে গেল মাণিকদাস। গানটির মধ্যে বিষয়গত ভাগ আছে। নাম আছে আলাদা আলাদা বিষয় বা সর্গের। সমগ্র গানটির ভিন্ন ভিন্ন অংশের ভিন্ন ভিন্ন নাম বললো গায়ক। যথা ভগবতী পালন কথা, গোরু-বাছুরের জন্ম কথা, গৃহস্থের মঙ্গল বা বৌদের পালন কথা, কপিলা মঙ্গল, ভগবতীর জন্মকথা. বন্দনা, বৌদের কথা, কপিলার জন্মকথা ইত্যাদি নানা নাম। পুরা গানটি শুনে মনে হল, গানটির সঙ্গত নাম হচ্ছে 'ভগবতী মঙ্গল' বা 'কপিলা মঙ্গল'। গানটির প্রথমাংশে 'বন্দনা'। দ্বিতীয় অংশে 'ভগবতীর জন্মকথা'। তৃতীয় অংশ 'ভগবতীর পালন কথা' [কিভাবে গরুর পালন-সেবা করতে হয়]। চতুর্থ বা শেষ অংশে 'বৌদের কথা' বা 'বৌদের পালন কথা' [বৌ-রা কিভাবে লালন-পালন করেছিল অর্থাৎ উপেক্ষা করেছিল, অনাদর করেছিল কপিলাকে]। অনতিদীর্ঘ গানটি মোটামুটি এই চার ভাগে বিভক্ত। সমগ্র গানটি[৪] নিচে দেওয়া হল [বিষয়-নাম সজ্জা আমাদের]:

বন্দনা

নম নম ব্রাহ্মণ্য ভগবতী গঙ্গে।
কতদিনে হেরিব মা সুমেরি তরঙ্গে॥
নবকৃষ্ণ ভগবতী আছেন যার ঘরে।
তার হিতা পরম সুখ, যমে কাঁপে ডরে॥
গোধন সমান ধন মা আর কি বা আছে।
ধনে অঙ্গ বিরাজ গাভীর শরীরে॥
আপনার ক্ষীর লয়ে তুষ্ট হবে দেবদেবা।
আর সদা সুখ ভোগ করেন নির্মল শরীর॥

৩। গায়ক তার পিতার নাম বললো 'পেতাব চন্দ্র দাস', সাং কুঞ্জবন।
৪। উচ্চারণ অনুযায়ী বানান লেখা হয়েছে, এতে বাঁকুড়ার ভাষা-বৈশিষ্ট্য ধরা পড়বে!

ভগবতীর জন্মকথা[৫]

দেবতারা বলে মা অবনীতে চল।
দোহাই শিবের যদি আর কিছু বল॥
দেবতার কথা আজি এড়াতে নারিল।
আর স্বর্গ হতে কপিলা গাভী মর্তভূমে এল। ২।
মর্তভূমের কথা যবে কপিলা শুনিল।
আর অঝোর নয়নে গাভী কাঁদিতে লাগিল॥
তেই মর্তভূমে আজ যাইব কেমনে।
চারি মাসের জলকাদা আমি হাঁটিব কেমনে॥
বরষায় বিষম দুঃখ মা পাবো চারিমাস।
আর বাইরে বাঘের ভয়, ঘরে মশা ডাঁস।
তেই মর্তভূমে আজ যাইব কেমনে।
পেছনে বেঁধে মোর পায়ে ছাঁদন দড়ি।
চারিটি বাঁটের দুগ্ধ লইবেক কাড়ি॥
অন্য ঘরে বাঁধবে বাছুর ভিন্ন ঘরে গাই।
সারারাত্রি মায়ে ছায়ে দেখা-শুনা নাই॥
আজ মা হইয়া পুত্রে দুখ দেখিব কেমনে। ২।
একটি বাঁটের দুগ্ধ লুকায়ে রাখিব।
কোন চক্ষে দিবে ধূলি ঘুরাইবে চক্রে।
আর কোন অপরাধে আমি চোখে ধূলি নেব বক্ষে॥
কপিলা ছিলেন মা কল্পতরুর নিকটে।
মর্তভূমের দেবঋষি যাইলেন করপুটে॥
তোমায় প্রহার করিবে যখন যত নরগণ।
আর হস্ত পেতে নব আমরা তেত্রিশ দেবগণ॥

ভগবতী পালন কথা

গোরুর পালন কর গোরু বড় ধন।
গোরুতে বহিয়ে বুলে এ তিন ভুবন।

৫। এই অংশের অবশ্য নাম হওয়া উচিত 'ভগবতীর মর্ত্যে আগমন কথা'।

সংসারের মধ্যে মা পূজিবে গোধন।
যার সেবা আপনি করেছেন লক্ষ্মীনারায়ণ॥
আজ লক্ষ্মী হইতে ভগবতী মা তোমার গুণ বড়।
এক দোন্ন গবুরে হয় সংসার পবিত্র।
অতি প্রাতঃকালে যেবা গুয়ালি কেড়ে যায়।
গঙ্গাস্নানের ফল সে ঘরে বসে পায়।
রৌদ্র বাড়িলে যেবা বাসি গুয়াল কাড়ে।
ভগবতীর মুখেতে গোবর গন্ধ ছাড়ে॥
পান খাই চোকা গোয়ালে যে ফেলে।
আর পান-বসন্ত রোগ ধরে গোরুর গায়॥
এলাউ চুল করে নারী গুয়ালে প্রবেশ।
চামিটা-বসন্তে তার গোরু ধন খসে॥
চৈত্রে পোষ ভাদ্র মাসে গুয়ালে দেয় মাটি। ২।
নব লক্ষ ধেনুর পাল যায় গুটি গুটি॥
ভাদ্রমাসে গুয়ালে যেবা তাল ভেঙে খায়।
আর তালবেতাল তার গোরু ধন যায়॥
শনি মঙ্গলবারে যেবা গুয়ালে দেয় মাটি।
নব লক্ষ ধেনুর পাল যায় গুটি গুটি।
ভগবতীর চরণধূলি লাগে যার গায়।
সর্বপাপ মুক্ত হয়ে বৈকুণ্ঠেতে যায়।
শনি মঙ্গলবার যেবা গোবুর বিলায়।
তার বাড়ী ছেড়ে লক্ষ্মী অন্যবাড়ী যায়॥
রবিবার দিনে যেবা মৎস্যপোড়া খায়।
ধড়ফেড়া রোগে তার গোরু ধন যায়॥
গুয়াল কাড়িয়া যেবা গুয়ালে হাত পুছে।
আর উকুনে কাতর তার গোরুধন ঘুচে॥
গুয়ালের ছাতায় যেবা কাপড় শুকায়।
উডা-বসন্ত রোগ ধরে গরুর গায়॥
আলতা সিন্দুর পরে হাত পা না ধুয়ে গুয়ালে সেমায়[৬]।

৬। প্রবেশ করে।

তার অপরাধের ভাগি ভগবতী গৃহস্থকে ভোগায়॥
কাঠাল খাইয়ে ভোতা মা গুয়ালে ফেলে।
কাঠালা-বসন্ত রোগ ধরে গোরুর গায়॥
রম্ভা খাইয়ে চোকা যেবা গুয়ালে ফেলে।
আর রক্ত বসন্তে তার গোরু ধন যায়॥
ভিজা ভাতের জল নে যেবা গুয়ালেতে রাখে।
আর উকুনে কাতর তার গোরু ধন ঘুচে॥
ঝেটিয়ে পেটিয়ে রাখে গুয়ালেরি কোণে।
চরিতে কপিলা গাভী দুঃখ ভাবে মনে॥
এতকগুলি পালন সেবা মা করিল যেই বা জন।
হরি বল—অনায়াসেতে পেয়েছেন তিনি লক্ষ্মীনারায়ণ॥

বৌদের পালন কথা

ছয় বৌ ডাক দিয়ে মা কয় নীলাবতী।
আজ ভগবতীর পালন সেবা মা গো কর নিতি নিতি॥
ছয়টি দিনের ছয় বৌয়ের গিন্নীমা পালা কেটে দিল।
আর প্রথম গুয়ালি কাড়া মা বৌটির হল॥
বড় বৌয়ের পালি গেল মা মেজ বৌটি এল।
আর মেজ বৌ বলে আমার হাড় জ্বালা হল॥
সেজ বৌ শুনে বলে গায়ে এল জ্বর।
আর ন বৌটি বলে মাগো কাড়িতে নারিব গুয়াল, নিকাইব ঘর॥
এসো গো মা ছোট বৌমা কুলের নন্দন।
তোমায় নিতে হবে কিছু মা গোরুর পালন॥
বৌকে পরিতে দিল মা দিব্য পাটের শাড়ী।
আর কর্ণেতে কুণ্ডল দিল গলাতে মাদুলি॥
ছড়া পাঁচ ছয় গড়ে দিল মা সোনার চাঁপাকলি।
গুয়াল কাড়িতে দিল সুবর্ণের ঝুড়ি॥
রমঝম্ শব্দে বৌমা গুয়ালে দিল পা।
আর গুয়ালের গোবুর মাটি দেখে বৌ কপালে মারে ঘা॥
আর অঙ্গে গোবুর মাটি মা ফেলিব কেমনে।

ঘরে গিয়া অন্ন আমি খাইব কেমনে ॥
বাবা যদি বিবাহ দিত মা নিগুরারি[৭] ঘরে।
তবে কেন সাদা শংখে মা গবর নাগিত।
সোয়ামির ভাগ্যে আমি বসিতাম খাটে
আর গোবুরের গন্ধে আমার মনপ্রাণ ফাটে ॥
সুবুদ্ধার বৌকে অমনি মা কুবুদ্ধি ঘটাল।
তুলিয়ে ঝাঁটার মূড়া গোরুকে মারিল ॥
ছয় মাসের গর্ভ গাইয়ের খসিয়া পড়িল।
আর অঝর নয়নে গাভী কাঁদিতে লাগিল ॥
কেঁদে চলে গেল পাল মা, ফিরে নাহি এল।
চালের বাতা ধরে বৌরা নাচিতে লাগিল ॥
জ্বালা গেল ঘুচে মা শ্বশুর ঘরের পাল।
আর সাঁঝ সল্‌তা[৮] মাড়ুলি গুয়ালি কাড়া গো মা
দিয়া শ্বশুর ঘরের ঘুচিল জন্‌জাল ॥
বজ্জর ভাঙিয়া মা গিন্নীর শিরে পড়ে।
আজ কেন আসে নাই মা, দেখিনে আমার ভগবতী ঘরে ॥
দধি দুগ্ধ ঘৃত মধু লয়ে গিন্নী মা মথুরায় করিলেন গমন। ২।
আর মধ্য পথে ভগবতী মোর দিলেন দরশন ॥
এই গো মা ভগবতী মোর কি হয়েচে বল।
আজ কেন দেখি মা তোমার বিরস বদন ॥
শুন গো মা গিন্নী মা আমি তাই বলি তোমারে।
ছয়টি দিনের ছয় বৌ মা তোমার ছয় রঙ্গ করে ॥
বড় বৌটি মাগো তোমার নামে চন্দ্রকলা।
আর গুয়ালি কাড়তে যায় গো মা ঠিক দুফর বেলা ॥
ছোট বৌটি মাগো তোমার আদর আদরী।
তুলিয়ে ঝাটার মূড়া ভেঙেছে পাঁজরগুলি।
চল মোর ভগবতী মোর চল ঘরে ফিরে চল।

৭। যাদের গরু নাই এমন।
৮। সাঝ সকাল।

ঐ ছয়টি দিনের ছয় বৌকে মা বনবাসে দিব।
নাপিত ডাকিয়া বৌদের আবস্তা করিব॥
দশটি আঙ্গুল কাটিয়া বৌদের পাকাবো পোলতায়।
হাত কাটিয়া বৌদের দিবুথা বনাবো॥
কান কাটিয়া বৌদের প্রদীপ গড়াবো।
মস্তকের ঘৃত নয়ে প্রদীপ জ্বালিব।
জিহ্বায় কাটিয়া বৌদের কলাপাতে দোব।
চক্ষু কুড়িয়া বৌদের শুকনিকে খাওয়াবো॥
নাক কাটিয়া বৌদের কুত্তাকে খাওয়াবো।
বুকের রক্ত দিয়ে বৌদের আলিপনা দোব॥
এলাউ কেশ নিয়ে বৌদের চামর ঢুলাব॥
এতকগুলি বচন যখন নিজে গিন্নীমা কইল।
আর পুনরায় ভগবতী মোর ঘরে ফিরে এল॥
বৌদের ললাটে ভগবতীর চরণ ধুয়াল।
মাথার কেশেতে গিন্নী মা চরণ পুছাল॥
কুয়ালিকে ডাকিয়া গুয়ালে সেবায় করিল।
দধি দুগ্ধ দিয়ে কোয়ালির সেবায় করিল।
এইবার শাস্ত্রগুলি সব বলিতে লাগিল।
একে একে বলে গিন্নী মা, কোয়ালি পচ্যর বাঁধিল॥
দেখেন দিনে দিনে ভগবতীর পাল বাড়িতে লাগিল।
সেবাতে কপিলা গাই কি মা হইলেন মুগ্ধ।
এক এক কপিলায় দেয় একমণ দুগ্ধ।
ধনে ধান্যে ধেনুতে বাড়ালেন মহেশ্বর* ॥
হরি বল হরি।

হরিধ্বনি করে গান সমাপ্ত হল। গানের মধ্যে কোথাও পয়ার বন্ধের মিল হারিয়ে যাচ্ছিল, গায়কের স্মৃতিভ্রংশের ফলে নিশ্চয়ই। কোথাও কোন পদ দীর্ঘ হয়ে গেছে, কিন্তু যেহেতু গান—গানের টানাসুরের শোষণশক্তির ফলে সেগুলি ছন্দোপতন ঘটায় নি। গায়কের যে গুণটি আমায় সর্বাধিক আকৃষ্ট

করেছিল তা তার গান পরিবেশন করার উদাত্ত মন্দ্রিত ঢঙ। গলা নিখাদ, সুর উচ্চগ্রামে খেলছিল। ভক্তিভাবে গদগদ ছিল ঐ গায়কের মানসিকতা, অভিব্যক্তি।

এই গান শোনার পর দার্জিলিং জেলায় এবং হুগলী জেলায় কোয়ালি গান শোনার সৌভাগ্য আমার হয়। বাঁকুড়া জেলার কোয়ালি গানের সঙ্গে দার্জিলিং জেলার কোয়ালি গানের বিষয়বস্তু ও গায়কি-রীতির অমিল আছে। বাঁকুড়ার মাণিকদাসের গান ছিল দীর্ঘ পয়ারের ঢঙে সুর করে গাওয়া, দার্জিলিং জেলার গায়ক গেয়েছিল বিচিত্র উচ্চারণে, কেটে কেটে, শ্বাসাঘাত দিয়ে, সুরে তালে থেমে থেমে। দার্জিলিংয়ের গানটি ছিল ক্ষুদ্রাকার, তাতে কোন কাহিনী ছিল না।

হুগলী জেলায় শোনা গানটি অনেকাংশে বাঁকুড়া জেলায় শোনা গানটির অনুরূপ। গায়কি ঢঙও প্রায় এক। তবে হুগলীর গায়ক দুই হাতে বড় করতাল বাজিয়ে গান করছিলেন। গানটি কাহিনীধর্মী। বন্দনা, মর্তে আগমন, পালন-কথা প্রভৃতি ভাগ সেখানেও আছে। কিন্তু গানের ভাষা ভিন্ন।

আর্যসভ্যতার আদিকাল থেকে হিন্দুরা গরুকে সম্মান করেছে, সবিশেষ যত্ন করেছে। বেদে গোমাংস পূজায় নিবেদন, ভক্ষণ ও রন্ধন প্রক্রিয়া বর্ণিত হলেও গোধনকে অবহেলার উদাহরণ নেই। অবশ্য মহাভারত ও রামায়ণের যুগ থেকে গোধনের সেবা ও সংরক্ষণের মনোভাবের সর্বশেষ লক্ষ্য করা যায়। 'ভগবতী পালন কথা' অর্থাৎ কোয়ালি গানে সেই ভারতবর্ষীয় শাশ্বত মনোভাবেরই প্রকাশ ঘটেছে। আর্য ভারতবর্ষ গরুকে কোন্ সম্মান দিয়েছে তা জানার জন্য খুব বেশী দূর যেতে হবে না। 'গো ব্রাহ্মণ্য হিতায় চ'—এই মন্ত্রোক্তিতে বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণের আগে গরুর হিত স্মরণ করা হয়েছে। মহাভারতের 'অনুশাসন পর্ব' ভালো করে পাঠ করলে দেখা যাবে যে সর্ব জাতি-বর্ণের উচ্চে যেমন ব্রাহ্মণকে স্থান দেওয়া হয়েছে, তেমনি গরুকেও সর্বপ্রযত্নে রক্ষা করতে বলা হয়েছে। বলা হয়েছে গো দানের থেকে শ্রেষ্ঠ দান আর কিছু নেই। ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের কাছে শরশয্যায় শায়িত ভীষ্ম গোদান ফল, গোদান প্রসঙ্গে গো-প্রশংসা, গোদান বৈগুণ্যে নৃগনৃপতির কৃকলাসজন্ম, গোদান প্রশংসায় উদ্দালকি—নচিকেতা সংবাদ, যমকর্তৃক গোদান পরিপাটী বর্ণন, গোহরণ ও গোবিক্রয়ের পাপ, কপিলা দান মাহাত্ম্য—কপিলা লক্ষণ, গোজাতির পূর্বজন্ম বৃত্তান্ত, গোসেবা মাহাত্ম্য, গোময় মাহাত্ম্য—গোলক্ষ্মী সংবাদ, স্বর্গীয় গোজাতির

মর্তে অবতরণ প্রভৃতি অনেকগুলি অধ্যায়ে ঐ একই বিষয়ে আলোচনা করেছেন।

অনুশাসন পর্বের 'কপিলাদান মাহাত্ম্য, বশিষ্ট সৌদাস সংবাদ' অধ্যায়ে বলা হয়েছে 'গোনাম কীর্তন করিয়া শয়ন ও গাত্রোত্থান, প্রাতঃকাল ও সায়ং-কালে গোসমুদয়কে নমস্কার, গোময় ও গোমূত্র দর্শনে অবজ্ঞা পরিহার এবং গোমাংস ভক্ষণের বাসনা পরিত্যাগ করা অবশ্য কর্তব্য। যাঁহারা এইরূপ নিয়ম প্রতিপালন করিতে পারেন, তাঁহারা অবশ্যই পুষ্টিলাভে সমর্থ হবেন। গোসমুদয়কে অশ্রদ্ধা করা কদাপি বিধেয় নহে। মনুষ্য সর্বসময়ে বিশেষতঃ দুঃস্বপ্ন দর্শনের পর গোনাম কীর্তন করিবে। গোময় মিশ্রিত জলে স্নান ও গোকরীষে [ঘুঁটেতে] উপবেশন করা অবশ্য কর্তব্য।' এই সব নির্দেশের মধ্যে যে মনোভাব কাজ করেছে আমাদের শোনা কোয়ালি গানের মধ্যে সেই মনোভাবই কাজ করছে। শাশ্বত ভারতীয় সংস্কৃতির পরিচয় এই ভাবেই লোকসংস্কৃতির মধ্যে আজও বিরাজ করছে।

পরিশিষ্ট

১৯৭৬ সালের ৩রা মে তারিখে আকাশবাণীর 'জেলাবেতার' অনুষ্ঠানে কলকাতা থেকে আর্য চৌধুরীর সম্পাদনায় দার্জিলিং জেলা থেকে একটি কোয়ালি গান প্রচার করা হয়েছিল। গানটির 'বৈশাখ মাস' অংশ ছাড়া অন্য সবটুকু রেকর্ড করা আছে। লক্ষণীয়, গানটি প্রতি মাসের নাম স্মরণ করে রচিত। গানটি ছিল এইরকম—প্রতিটি চরণ দুবার করে উচ্চারণ করা হয়েছিল :

জ্যৈষ্ঠ মাসে গরুর হইবে যত রোগের বিঘ্নি।
হুশিয়ার হও গরুর লাগি সর্বলোকে জানি।
আষাঢ় শাওনে দেওয়ার পানি গরুর সিনান,
ক্ষেতের কাছে গরু গিলার বাইচা রবে জান।
ভাদ্র মাসে ক্ষেতের কাছে যদি হৈল শেষ,
এই মাসেতে গরু গিলার বাইচা রবে জান।
আশ্বিন কার্তিক গরুগিলার কোন কর্ম নাই,
সর্বলোকে শুনে কথা আমি কইয়া যাই।
অঘন মাসে প্রথম শীতে গরুর হবে পাল,

মাঘ মাসেতে কাড়া শীতে ঘটেরে জঞ্জাল।
ফাল্গুন মাসে কচিয়ার বউ বড়ই উশানের দিন,
মনের খুশী গরু গিলায় নাইরে চক্ষুত নিন্।
চৈত্র মাসের শুকনা দিনে গরুর যতন,
হালোআ চাচার গরু হৈল ভাই সাত পীরের ধন।
তোমার বাড়ী আসিল রে ভাই লোকের কুয়ালি।
সর্বলোকে শুনে কথা যার আছে গোহালি।

হুগলী জেলার চাঁতুর গ্রামে [তারকেশ্বর পোষ্ট] কোয়ালি গান শোনার সৌভাগ্য হয়েছিল ২০।৩।৫৭ তারিখে সকালে। তখন চৈত্র মাস। গায়কের নাম শ্রীরবীন্দ্রনাথ গায়েন [গ্রাম: দেওড়া, পো: রাউতপুর, জেলা : হুগলী]। বর্তমান বয়স প্রায় ৫০ বৎসর। তাঁর আট বছর বয়স থেকে তিনি এই গান গাইছেন। তাঁরা বংশ পরম্পরায় এই গান গাইছেন হুগলী ও বর্দ্ধমান জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে। তাঁর ভাইয়েরাও এইভাবে গান গেয়ে জীবিকা অর্জন করেন। বাউল, শ্যামাসঙ্গীত, সত্যপীরের গান, শিবায়ন, দুর্গার শাঁখা পরানোর গানও তাঁরা গেয়ে থাকেন। কোয়ালি গান তাঁরা বেশী গান ভাদ্র মাসে। ভাদ্র মাসেই 'গোল [গোয়াল] অষ্টমী'। গায়ক বললো তাদের 'গোয়ালী' গান স্বরচিত নয়, বই থেকে নেওয়া। বইয়ের নাম 'শিবায়ন গীত'—চণ্ডীদাস বিরচিত। গায়কের হাতে ছিল 'করতাল' অর্থাৎ বড় খঞ্জনী। খোল, করতাল, হারমোনিয়াম সহযোগেও তারা গান পরিবেশন করে, প্রয়োজন হলে বা আসরের চাহিদা অনুযায়ী। এরা এ গানকে ভগবতী পালন, কোয়ালি বা গোয়ালি গান বলে। বাঁকুড়ায় শোনা গানের সঙ্গে হুগলীতে শোনা গানের সুরগত পার্থক্য বিশেষ নেই। কাহিনীও প্রায় এক, তবে বর্ণনার বৈচিত্র্যে বাঁকুড়ার গানটি শ্রেষ্ঠ। হুগলীর গানটি ছিল এই রকম :

বন্দনা

বল কে বুঝিতে পারে মা তোমার মহিমা :
বলে কতদিনে দয়া করিবেন অভয়া।
বলে গেরস্তর মঙ্গল কর মা তুমি মহামায়া॥
মা গো—কে বুঝিতে পারে গো মা তোমার মহিমা।
ব্রহ্ম আদি দেবগণ দিতে নারে সীমা॥

মর্ত্তে আগমন

ভগবতী ছিলেন দেখুন কল্পতরু তলে।
বিশ্বকর্মা মহাদেব ডাকিলেন তাহারে।
শোন শোন গাভী মাতা আমার কথা নেবে।
আজ স্বর্গ ধাম হতে তোমার মর্ত্তে যেতে হবে॥
মর্ত্তে যাবার কথা যখন গাভী শুনেছিল।
আকাশ ভাঙিয়া যেন মস্তকে পড়িল॥
সুধা রসে খেতে আমি কেমনে খাব ঘাস।
আজ চোখে ঠুলি দিয়ে নর ঘুরাইবে চক্রে।
দিন বন্দী করি যবন পৃষ্ঠেতে চড়িবে॥
শোন শোন গাভী মাতা আজ নাইকো তোমার ভয়
তেত্রিশ কোটি দেবতা মিলে যাবো কিন্তু আমি।
এই কথা গাভী মাতা যখন শুনিল।
আজ আনন্দে গাভী মাতা নাচিতে লাগিল॥
তবে এই পালনগুলি নিবরিয়া[১০] গেল।
গুয়াল কাড়বার তিন বোয়ের পালা করে দিল।
কোথায় গো বড় বৌমা হরেরি নন্দন।
তোমা হতে হোক কিছু মা গরুরি পালন।
বড় বৌ বলছেন বাবু গায়ে এল জ্বর,
হ্যাগা না পারিব গুয়াল কাড়তে, না নিকাইব ঘর।
আজ মেজ বৌ কোথায় গো হরেরি নন্দন,
তোমা হতে হোক কিছু মা গরুর পালন।
মেজ বৌ বলচেন বাবু জ্বালার উপর জ্বালা,
হ্যাগা বুঝিয়া দেখ না বাবু ছোট বৌয়ের পালা।
ছোট বৌকে পরাচ্ছেন দেখুন দুর্বো পাটের শাড়ী।
গুয়াল কাড়তে দিলেন স্বুবর্ণের ঝুড়ি।
রমেঝমে করে ছোট বৌ গুয়ালে দিলেন পা,
মাগো গোরুরি গোবর দেখে কপালে মারছে ঘা।
বলে মা বাপ বিবাহ দিত নিগোরুরি ঘরে,

১০। বিবরিয়া [বর্ণনা করিয়া]।

সাধের খ্যাকাতে দেখ গোবর লাগিবে!
সুবুদ্ধির বৌকে তখন কুবুদ্ধি ধরিল,
ধরিয়া ঝাঁটার বাড়ী গাভীকে মারিল।
তবে পঞ্চ মাসের গর্ভ ছিল গর্ভ নষ্ট হল।
মাগো, কেঁদে কেঁদে ভগবতী পথেতে চলিল।
দূর দূর করি ধেনুর পাল তাড়াইয়া দিল।
চালের বাতা ধরে ছোট বৌ হাঁপিতে লাগিল।
কেঁদে কেঁদে ভগবতী পথে চলে যায়,
পথমধ্যে গোয়ালিনীর সঙ্গে দেখা হয়।
এত বলে ধরে দেখ ছোট বৌয়ের গায়ে।
ধরিয়া ঝাঁটার বাড়ী পাজরেতে মারে।
তবে এই কথা গুয়ালিনী যখন শুনিল,
কেঁদে কেঁদে ভগবতীর চরণে ধরিল।
এত বলে গরু দেখ তার ফিরায়ে আনিল,
ময়ূরের পালকে তখন গুয়াল ছাইল।
বলে কোথায় গো ছোট বৌমা কুলেরি নন্দন,
আজ ভগবতীকে প্রণাম কর বলে যে দিলাম।
ছোট বৌ হেঁট হয়ে প্রণাম করেছিল,
আজ বুড়ীর হাতে খাঁড়া ছিল বসাইয়ে দিল।
একচোটে ছোট বৌয়ের মাথা যে কাটিল,
মাথার খুলি নিয়ে ধুনি জাগাইল।
দশ আঙুল কেটে নিয়ে সলতে জোগাইল।
এক গুয়াল গুরু ছিল সাত গুয়াল হল।
এই সব পালনগুলি যে পালিতে পারে।
ভগবতী তাদের ঘর নাহি ছাড়তে পারে॥…
সধবায় শুনিলে নাম সুখে দিন যায়।
বিধবায় শুনিলে নাম মোক্ষ ফল পায়॥
সধবায় শুনিলে নাম জঞ্জাল হবে দূর।
উজ্জল রাখিবে সতীদের উজ্জল সিঁদুর।

ভক্তি করিলে মাগো চণ্ডালের হয়।
অভক্তি করিলে মা তো ব্রাহ্মণের নয়।

গায়ক প্রতি দোরে দোরে খঞ্জনী বাজিয়ে এই গান গেয়ে ভিক্ষা করছিলো। বাঁকুড়ার গায়কের মতো একই চরণ ফিরে ফিরে দুবার করে গাইছিলো না। তবে গানের উক্তি বিশেষের উপর জোর দেবার জন্য কিঞ্চিৎ দু-একটি চরণের দুবার উচ্চারণ দেখা গেল। 'তবে' 'মাগো', 'আজি' প্রভৃতি শব্দগুলি প্রায় প্রতি চরণের প্রথমেই উচ্চারিত হচ্ছিল। আর হুগলীর গায়কেরও যে স্মৃতিভ্রংশ হচ্ছিল তা গানটি পড়লেই বোঝা যায়, কারণ কাহিনীর সূত্র অনেক জায়গাতেই ছিন্ন হয়ে গেছে।

৪

মনসামঙ্গলের আসর

শেষ রাতে যখন গানের আসর থেকে ফিরছিলাম, তখন মনে জাগছিল মনসার 'দেওয়াশী'[১] পদ্মলোচন দে-র কথা—মনসার রূপার মুকুট চুরি হয়ে গেছে। চুরি হয়ে গেছে শুধু দেবীর মুকুট অলঙ্কার নয়, চুরি হয়ে গেছে এবং আজও চুরি হয়ে যাচ্ছে বঙ্গ সংস্কৃতির রাজ ঐশ্বর্য লোকসংগীত। মনসামঙ্গলের গান শ্রাবণ মাসের ১লা থেকে শ্রাবণ মাসের সংক্রান্তি পর্যন্ত আজও প্রতি রাত্রে গাওয়া হয় রামপুর [বাঁকুড়া] তাঁতিপাড়ায়, কিন্তু সে গানের অতীত ঐশ্বর্য ও মাধুর্য চলে গেছে। ক্ষীণ অবশেষটুকু আছে। তবু যা আছে তারই পরিচয় নিতে গিয়ে বিস্মিত হতে হয়েছে।

প্রায় পাঁচ পুরুষ ধরে এই দেবস্থানে দেবীর পূজা ও মঙ্গল গান হয়ে আসছে। এককালে শ্রাবণ সংক্রান্তির পরের দিন ১লা ভাদ্র এখানে ঝাঁপান হত। এখন আর হয় না। পদ্মলোচনের পূর্বপুরুষেরা রোগে চিকিৎসার ঔষধ দিতেন। স্ত্রীরোগ, জরজারি, খোসবিষ, চুলকানি, কানপাকা, সাপেকাটা, বাতব্যাধি প্রভৃতির ঔষধ। মন্ত্র পড়ে সাপের বিষ নামাতেন তাঁরা।[২] আজও সে সব বিধি-নিয়ম রীতি-স্বভাব বেঁচে আছে, তবে তার প্রতি বিশ্বাস এবং সে সবের প্রভাব প্রতিপত্তি কমে গেছে। গলায় বড় বড় রুদ্রাক্ষের মালা, কপালে গোল সিঁদুরের টিপ, পরনে নতুন ধুতি, দীর্ঘাঙ্গ কালোবরন 'দেওয়াশী' কথা বলছিলেন শান্ত বিনম্র কণ্ঠে। আজ তাঁর উপবাস। সংক্রান্তিতেই মূল পূজা ও উৎসব, গান এবং আচার পালন। তাই উপবাস করে আছেন তিনি।[৩] সর্পমন্ত্রের পুঁথিপত্র এবং

১. বাঁকুড়া শহরের উত্তর প্রান্তে অবস্থিত রামপুরের মনসা মন্দিরের সামনে শ্রাবণ সংক্রান্তির (১৩৮৩) রাত্রে মনসা মঙ্গল গানের আসর।

২. দেওয়াশী<দেবদাসী। এখানে 'দেবদাস' বুঝতে হবে। যিনি মনসার সেবা পূজা ও নিত্য-[illegible] ব্যবস্থা করেন।

৩. তাঁরা বললেন মন্ত্রই সব নয়, যদিও মন্ত্র আছে। প্রধান হচ্ছে দ্রব্য গুণ: দ্রব্য গুণেই সর্প দংশনের বিষ নামে, রোগী বাঁচে, মন্ত্রে নয়। মন্ত্র পড়ে নানা ভঙ্গি বিধান করে মানুষের মনে বিশ্বাস আনতে হয়। মন্ত্রের প্রকৃত মূল্য সেই খানেই।

মঙ্গল গানের বই আছে তাঁদের ঘরে। আছে পুরানো খাতায় লেখা মনসার পালা গান।[৪]

মাথার উপরে চাঁদোয়া। ধূলায় ভর্তি রাস্তার উপর শতরঞ্চ পেতে গানের আসর। ১৪/১৫ জন মানুষ গানের আসর জমিয়েছেন। সামনে দেবী মনসার মন্দির। বিদ্যুতালোক সজ্জায় সজ্জিত।[৫] মন্দিরের মধ্যে স্থাপিত 'মনসার চালিটি'[৬] প্রায় মানুষ সমান উঁচু এবং সুষমায় অসাধারণ। মনসা চালিটির তিনটি থাক। সর্বোচ্চে মাথার উপরে ময়ূরচড়া কার্তিক—হাতে ধনুক বান, মধ্যে দণ্ডায়মান রাধা ও কৃষ্ণ, সর্ব নিম্নে চালিটির মূল ভাগে বেদীর উপরে কালো কষ্টি পাথরের মতো কালো রঙের মনসা মূর্তির মুখের গড়ন খুব সুন্দর। সোনার চোখ, নাক, নাকে নাকছাবি। মায়ের দুই পাশে দুই সখীমূর্তি দাঁড়িয়ে আছেন, তাঁদেরও চোখ সোনার। মায়ের মাথায় সোলার কাজের রূপার বরণ সুন্দর মুকুট। মনসাদেবীর ডান ও বাম পাশে, সামনে বাঁকুড়ার বহু পরিচিত টেরা-কোটার হাতি ঘোড়া, মনসার 'বারি'[৭]—তাতে সদ্য ভাঙা সবুজ মনসাসিজ পাতা। ঊর্ধ্ব-বাহু দারুমূর্তি নিতাই গৌরও আছেন দেবীর এক পাশে।[৮]

গানের আসর বসেছে গোল হয়ে। গায়ক দাঁড়িয়ে গাইছেন না। গায়ক বাদক সকলেই বসে। গান আরম্ভের প্রাক মুহূর্তে আসরের মাঝখানে একটি বন্ধ ঝাঁপিতে একটি সাপ এনে রাখা হল। খুব বড় কাঠের ধূপাধারে ধূপ জ্বালানো হল। হারমোনিয়াম দুটি, সঙ্গে সঙ্গতের তীব্রতা জুড়ে দেবার জন্য

৪. বাঁকুড়ায় মনসা পূজো হয় কোথাও ঘটে, কোথাও পটে, প্রধানতঃ নব নির্মিত মূর্তিতে। এক-দিনের পূজা। সরস্বতী ঠাকুরের মতো গড়ন সে সব মূর্তির। তবে হংসের স্থানে আছে ফণাশীর্ষ সর্প। পদ্মাসীনা মনসার মূর্তিপূজা খুব জাঁকজমকের সঙ্গে হয় সাধারণতঃ অনুন্নত হিন্দু সমাজে।

৫. আসরে 'দেব সাহিত্য কুটীর' প্রকাশিত রাধানাথ রায়চৌধুরীর 'পদ্মপুরাণ—মনসা মঙ্গল' বইটি থেকে 'বাসর' বিষয়ক গান গাওয়া হল। পুরুলিয়া থেকে ১৩৩৬ সালে প্রকাশিত চৈতন্যদাস মণ্ডলের 'বৃহৎ মনসামঙ্গল' থেকে গাওয়া হল 'গৌরাঙ্গ' বিষয়ক গান। দুজন গায়ক ভিন্ন ভিন্ন বিষয় গাইলেন কিন্তু উভয়েই গাইলেন খাতা বা বই দেখে।

৬. মন্দির ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছে ভক্তদের চেষ্টায়। কিন্তু বিজলী বাতির ব্যবস্থা করে দিয়ে যান বাঁকুড়ার মন্দির প্রেমী শ্রীঅমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। তৎকালে তিনি বাঁকুড়ার ডেপুটী ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন।

৭. মনসার চালিটি গড়েছেন পাঁচমুড়ার (বাঁকুড়া) বিখ্যাত মৃৎশিল্পীরা।

৮. 'বারি' হচ্ছে মনসা পূজা উপলক্ষে জল ভরে আনার জন্য মাটির ঘট, যার গায়ে সর্প মূর্তি আছে। এগুলিও বাঁকুড়ার বিখ্যাত মৃৎশিল্পের নিদর্শন।

তালে তালে বাজবে 'খত্তাল'। আর বাজবে 'বিষম ঢাকি'। 'বিষম ঢাকি' মনসামঙ্গল গানের বিশিষ্ট বাদ্যযন্ত্র। অনেকটা বড় আকারের ডুগডুগি বা ডমরু যেন। ছাগলের ভুঁড়ি শুকিয়ে ছাওয়া হয়েছে। প্রধানতঃ ডান হাতের তর্জনী ও অন্য আঙ্গুলের আঘাত দিয়ে বাজাতে হয়। ১২-১৩ ইঞ্চি দীর্ঘ এবং প্রায় ৬ ইঞ্চির মতো ব্যাসার্ধ—এই বিষম ঢাকির দু-মুখ টেনে বাঁধা আছে যোলটি সুতোর টানে। কোমর সরু [কবিতায় নারী কোমরের সঙ্গে তাই তুলনা দেওয়া হয়] এই যন্ত্রটির মাঝখানে সুতোর টানাগুলির উপর আছে একটি চওড়া সুতোর বোনা বেল্ট। এই বেল্ট দিয়ে টিপে ধরতে হয় বাম হাতে এবং বাম হাতের টিপনি দিয়ে তিন রকম 'বোল' তোলা হয়—চড়া, খাদ ও গমক। এক হাঁটুর উপর ধরে অন্য হাঁটু গেড়ে বসে অদ্ভুত ভঙ্গিতে বাজানো হচ্ছিল বিষম ঢাকি।[৯] এঁরা নিজেরাই বিষম ঢাক তৈরী করেন।

এই আসরে মনসা মঙ্গলের আরম্ভ থেকে অগ্রগতি পর্যন্ত সমস্ত প্রকারের গানই পরিবেশিত হল নাটকীয় ভঙ্গিতে। মনসা মঙ্গলের গল্পরসের সঙ্গে মিশে যাচ্ছিল নাট্যরস। তালে তালে মনসা মঙ্গল গানের পরিবেশন মাতাল করে দিচ্ছিল শ্রোতাদের। ভক্তিভাবের ঢুলু ঢুলু পরিবেশ নয়, গান গাওয়ার প্রাণবান ভঙ্গিতে রম্ রম্ করছিল আসর। গল্পরসের ক্ষুধা যে কতখানি—শ্রোতাদের আবেশ দেখে তা বোঝা যাচ্ছিল।

প্রথমে একজন 'মনসা বন্দনা' করলেন, উচ্চকণ্ঠে মন্ত্রপড়ার মতো করে। তারপর আরও তিনজন। এই ধরণের সুরহীন উচ্চারণে বন্দনা ও বিষয় প্রস্তাবনকে বলে 'সাকি'।[১০] 'সাকি' হচ্ছে সর্পবিষ ঝাড়া বা সর্প শান্ত করা মন্ত্রেরই অঙ্গ।

প্রথম সাকি

অস্তিকস্য মুনির্মাতা ভগ্নী বাসুকীস্তথা
জরৎকারুমুনি পত্নী মনসাদেবী নমস্ততে।
মা মনসার জয় মা মনসার জয় মা মনসার জয়

৯. রাঢ়ের সংস্কৃতি নিছক অভিজাত ও অনভিজাত সংস্কৃতিতে বিভক্ত নয়। এখানের সংস্কৃতি মূলতঃ মিশ্রসংস্কৃতি।

১০. রাত্রি ১০-৩০ ঘটিকায় গান আরম্ভ হল। যন্ত্রে ও সংগীতে অংশগ্রহণ করেছিলেন—বিজয় কুমার দে, পদ্মলোচন দে, নাড়গোপাল চন্দ, বাসুদেব দে প্রভৃতি। একজন বালকও ছিল, নাম মৃত্যুঞ্জয় দে। আর ছিলেন অশীতিপর এক বৃদ্ধ—রতন চন্দ্র গরাই।

দ্বিতীয় সাকি

আরে আরে উড়ঙ্কু কুড়ঙ্কু বায়
কোন্ কোন্ ফুলে পূজেছেন বিষহরি মায়।
আউড়ি বাউড়ি কউড়ি এই তিন ফুলে
পূজেছেন বিষহরি মায়।
তুমি লাও মা পুষ্পের হার—
আমাকে দাও মা বিদ্যার ভার।
মা মনসার চরণে কোটি কোটি প্রণাম,
কোটি কোটি প্রণাম।

তৃতীয় সাকি

উর মাগো ব্রাহ্মণী আস্তিক জননী।
মা তুমি নিজগুণে কর কৃপা অধম দাসে।
তুমি হও গুরু মাগো আমি হব দাস।
তব চরণ স্মরণে আম্‌কাদের অঙ্গের
কালকুটির বিষ হয়ে যাক বিনাশ।
মা মনসার চরণে কোটি কোটি প্রণাম,
কোটি কোটি প্রণাম।

'সাকি'[১১] বলার সঙ্গে সঙ্গে হারমোনিয়ামের সুর দেওয়া হচ্ছিল। তারপর আরম্ভ হল 'বন্দনা'—দিক্ বন্দনা ও নানা দেবদেবীর বন্দনা হল উচ্চ কণ্ঠে। এরই সঙ্গে 'গুরু বন্দনা'। আসরে বসে ভিন্ন ভিন্ন গায়ক এক একটি অংশ বলে যাচ্ছিলেন। কোন একজন এই সব 'সাকি' অথবা 'বন্দনা' করলে যে এক ঘেয়েমি আসতে পারতো তার অবকাশ ছিল না এই পরিবেশন পদ্ধতির মধ্যে।

বন্দনা—

মহাজ্ঞানে বিশ্বপূজিতা মনসার চরণে
কোটি কোটি প্রণাম।
মা মনসার চরণে কোটি কোটি প্রণাম।
জরৎকারু মুনির চরণে কোটি কোটি প্রণাম।
আস্তিক মুনির চরণে কোটি কোটি প্রণাম।

১১. যতদূর মনে হয় 'সাকি' অর্থাৎ 'সাক্ষী'। দেবী মনসাকে সাক্ষী রেখে মূল কার্য বা গান আরম্ভ করা হয়। সংকীর্তনের আগে 'গৌরচন্দ্রিকা'র মতো

ওস্তাদ গুরু ক্ষুদিরামের[১২] চরণে কোটি কোটি প্রণাম।
পূর্ব দিকে বন্দি করি ভাসুরে, পশ্চিমে বন্দি বৈদ্যনাথ।…
উত্তরে বন্দি করি ভীমাকায়, দক্ষিণে বন্দি করি জগন্নাথ।
চারিকোণ বন্দি আমি রহিলাম বসে।
কি করিতে পারে বাদি আপনার আশিষে॥
দেবীর সাক্ষাতে কেরে যে বা করিবে ঘা।
তার শিক্ষায় দীক্ষায় গুরুর মুণ্ডে তুলে মারি বাম পা॥

এগুলি যেন ঝাঁপানের সময় মাচায় চড়ে এ পক্ষের গুনিনের ও-পক্ষের গুনিনকে নানা কথা বলার রীতিতে উচ্চারিত হচ্ছিল। বন্দনা ও ভীতি প্রদর্শনের এই কথোপকথন রীতি বেশ কিছুক্ষণ চললো। তার সঙ্গে হারমোনিয়াম বা বিষম ঢাকি ছিল না। তারপর আরম্ভ হল সুরে গান—আসরে আনীত সব কটি বাদ্য-যন্ত্র সহযোগে। গান ধরলেন গায়ক।[১৩] তিনিও বন্দনা আরম্ভ করলেন। তাঁর সঙ্গে 'ধুয়া' ধরলেন অন্যান্য সকলে। ধুয়া ছিল—'জয় জয় মনসাদেবী এসো গো মা'।

মাগো বন্দিয়া যুগল পাণি বন্দ্যো মাতা চাঁদবণিক
কার্ত্তিক জননী—মা মনসা গো মা।
জয় জয় মনসাদেবী এসো গো মা।

লক্ষণীয়, প্রতিটি পর্যায়ের গান আরম্ভের সময় লয় থাকছে যতটা সম্ভব বিলম্বিত। কিন্তু সমাপ্তি ভাগে পৌঁছেই লয় দ্রুত থেকে দ্রুততর করে গাওয়া হচ্ছিল এই আসরে পরিবেশিত মনসামঙ্গল গানে। এই গানের সঙ্গে ঐতিহাসিক পৌরাণিক ও ভৌগোলিক প্রাচীন সূত্র জড়িয়ে আছে। প্রতিটি চরণ দুবার করে গাওয়া হচ্ছিল ফিরে ফিরে। আর গীত কথামালার চাঁদ সদাগরের সমগ্র জীবন-কাহিনী বলা আছে সূত্রাকারে।

আমি কি মা বন্নিতে পারি শুন গো মা জননী
নিজ গুণে তরাও জননী গো মা।
জয় জয় মনসাদেবী এসো গো মা॥
চাঁদবেনে সদাগর পাইয়ে শিবের বর
বাদ কৈল তোমা সনে গো মা।

---

১২. 'ক্ষুদিরাম' ছিলেন এদেরই পূর্বপুরুষ। ৮২ বছর বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়। তার বংশের 'ফকির' নামক ব্যক্তিও গায়ক ছিলেন। বংশ পরম্পরায় এখানে এরা মনসামঙ্গল গেয়ে আসছেন।

১৩. সুকুমার দাস।

জয় জয় মনসাদেবী এসো গো মা ॥

বেহুলা বেনার ঝি রূপের তুলনা কি

রজনী বঞ্চিল বাসঘরে গো মা।

জয় জয় মনসাদেবী এসো গো মা ॥

ওমা কোলে নয়ে মৃতপতি পোহাইয়া কালে গতি

দেবপুরে সবে শপথিলে গো মা ॥

এতক্ষণ পরে মনসা মঙ্গলের সুর মাধুর্য শ্রবণ করে শ্রোতার মন চকিত ও আনন্দিত হয়ে উঠেছে। কিন্তু বন্দনা বৈচিত্র্য শেষ হল না এখনো। কালী স্তব আরম্ভ করলেন অন্য আর একজন গায়ক।[১৪]

জগৎ জননী মাগো ও ভুবন বেড়া মায়া

মায়ের চরণে কে দিল লাল জবার মালা।

'মায়ের চরণে কে দিল লাল জবার মালা' এই ধুয়া দিতে দিতে দীর্ঘ কালী বন্দনা যথারীতি সমাপ্তি ভাগে দ্রুত লয়ে এল এবং অচিরে শেষ হল। কালী বন্দনা শেষ হবার পর আবার স্পষ্ট বলিষ্ঠ কণ্ঠে মন্ত্র উচ্চারণ করা হল :

এতেক বলিয়া মাতা মারিলেন করাঘাত।

উঠিয়ে বিষ দেন প্রভু ত্রিলোকের নাথ ॥

সেই নীলাম [?] কর মা গো যে মন্ত্রে জিয়াইলে বালা

লখিন্দরে

সেই মন্ত্র জিয়াও জিয়াও হুংকার দেন—

ও—ও—হরদেব নমঃ শিবায় নমঃ শিবায় ॥

বিষ প্রাপ্তি এবং জীয়ন মন্ত্র প্রাপ্তি কথার পর পুনরায় ঐ একই ঢঙে একই ব্যক্তি আরম্ভ করলেন 'মথন' পাঠ। তিনি অবশ্য স্মৃতি সম্বল করেই বলতে আরম্ভ করলেন :

মথন মথন বিষ সাগরের কূলে

তোর তেজে সদাশিব পড়িলেন জলে ॥

প্রবেশ করিলি দেহে রক্ত করি জল।

শিব অঙ্গে বিষ আর না করিস বল ॥

যে তোরে সৃজিল তার অঙ্গে কর ঘা।

অনাদি হুংকারে বিষ ভস্ম হয়ে যা ॥

---

১৪. হাবুলচন্দ্র দে মোদক।

মস্তক ছাড়িয়ে বিষ ঘা মুখে আয়।
হাড়ি ঝি চণ্ডীর বরে কামিক্ষির আড্ডায়॥
কমলেতে কেলি করে ভ্রমর ভ্রমরি।
পদ্মবনে উপজিল পরম সুন্দরী॥
কন্যা দেখি বাপ তার মদনে মাতিয়ে।
ধরিবারে চলিলেন বাহু প্রসারিয়ে॥
হাস্য বলে হাসি একি বড অপরূপ রঙ্গ।
বাপে ঝিয়ে কমল বনে করে রঙ্গ ভঙ্গ॥
মন্ত্র শুনি সঙ্গিনীর উপজিল দ্বিস।
মূল মন্ত্রে ভস্ম হয় কালকুটির বিষ॥

'মথন' অংশে[১৫] কাহিনীর মধ্যে সুসংলগ্নতা নেই। 'মথন' অংশ আবৃত্তি শেষ হবার পর, আমাদের বিস্মিত করে, আরম্ভ হল 'গৌরাঙ্গ বন্দনা'। মনসার সঙ্গে গৌরাঙ্গর যোগ কি—প্রশ্ন তুললেন আমার সুগায়ক সঙ্গী।[১৬] এই অঞ্চল বৈষ্ণব অধ্যুষিত অঞ্চল। গৌরাঙ্গ স্মরণ না করে, হরিধ্বনি না দিয়ে, এ অঞ্চলের কোন লোকসংগীত আরম্ভ বা শেষ হয় না। বৈষ্ণব প্রভাব রাঢ় অঞ্চলে, বিশেষ করে মল্লভূম অঞ্চলে এমনই গভীর ও সুবিস্তৃত। 'গৌরাঙ্গ বিষয়ক' গানের ব্যবহার সেই কারণে আকস্মিক বা বেমানান নয়। 'নিমাই তুই কি সন্ন্যাসে যাবিরে'—এই ধুয়া ছিল ঐ গৌরাঙ্গ বিষয়ক গানে—অর্থাৎ গৌরাঙ্গ বন্দনায়। গানটি পরিবেশনের রীতি অবশ্য অন্যান্য গীতাংশের মতো একই।

শুধু গৌরাঙ্গ বিষয়ক গানই নয়, রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক গানও গাওয়া হয় এই মনসামঙ্গল আসরে। গৌরাঙ্গ বিষয়ক গানের সঙ্গে সর্পভয়, বিষজ্বালা, চাঁদ সদাগর বা মনসা পূজার কোন যোগ নেই, কিন্তু রাধাকৃষ্ণ বিষয়ে আছে সেই যোগ। যেমন 'পুরাণো খাতা'[১৭] দেখে গাওয়া 'অথ কৃষ্ণসার' কথায় কালিয়দমন বৃত্তান্ত বর্ণিত হয়েছে।

১৫. এই অংশটি গায়কদের পুরাণো খাতা থেকে নেওয়া।

১৬ অরবিন্দ চট্টোপাধ্যায়, অধ্যক্ষ সুরনির্ঝর সংগীত বিদ্যালয়, বাঁকুড়া।

১৭. গায়কদের কাছে আমরা দুটি পুরানো খাতা দেখেছি। কালো কালিতে লেখা একটি সাধারণ পাটা দেওয়া 'এক্সারসাইজ' খাতা, অন্যটি সুন্দর করে বাঁধানো বড সাইজের খাতা এবং লাল কালিতে লেখা। প্রথম খাতাটিতে তারিখ নেই, কোন রচয়িতার নামও নেই। তবে ওঁরা বললেন গায়ক গোবিন্দ দে-র পিতামহ ৺দিগম্বর দে রচিত ও গীত গানের সংকলন আছে খাতা দু'টিতে। দ্বিতীয় খাতাটির লেখা ১৩৭৩ সালে। প্রথম খাতাটির মধ্যে আছে—বন্দনা, পাথর গড় গান, কালীর স্তব, অথ কৃষ্ণসার, মনসার স্তব, অথ গৌরাঙ্গ সার, শ্রীশ্রীহরি সহায় (জল সংবাদ), অথ পরীক্ষিত রাজার সর্পাঘাত, মথন প্রভৃতি।

কান্থ গেল ধেন্থ নয়ে কালিদহের কূল।
নানা রসে কমল ভাসে তায় ফুটেছে কূল।

তারপর যথারীতি জলপানের সময় গোধন কুল অচৈতন্য হয়ে পড়লো এবং কালিয়দমন মানসে কৃষ্ণ ঝাঁপিয়ে পড়লেন কালিদহের নীল গভীর জলে এবং শতপাকে বিজড়িত ও দংশিত হলেন।

বিষের জ্বালায় কৃষ্ণচন্দ্র হইলেন অচেতন।
আকুল হইয়া কাঁন্দে যত রাখালগণ॥
বলাই বলিছে ভাই বুদ্ধি কেন হর।
আপন বাহন গোরুড় তারে স্মরণ কর॥
এত শুনি কৃষ্ণচন্দ্র করিল স্মরণ।
কুশদ্বীপের মাঝে গোরুড়ের আসন টলিল॥
ধ্যানেতে জানিল গোরুড় স্মরণ বিবরণ।
কালিদহে কালিনাগে গিলিছে নারায়ণ॥
কে মারিতে পারে মোর প্রভু নারায়ণ।
আজি গিয়ে কালিনাগের বধিব জীবন।

গোরুড় এসেছে এই সংবাদ শুনে কালিনাগ পেট থেকে উগরে দিল কৃষ্ণকে এবং 'কৃষ্ণের অঙ্গেতে যত বিষ লেগেছিল/চমক মারিয়া বিষ উড়াইয়া দিল'। কৃষ্ণ বিষয়ক এই গানের মধ্যে সাপ ও বিষের বিষয় থাকলেও কৃষ্ণ বিষয়ক অন্য একটি গান 'জল সংবাদে'[১৮]—কোন সর্প দংশনজাত জ্বালা বা প্রতিকারের কথা নেই। জল সংবাদের বিষয়—'রূপ দেখি আঁখি ঝুরে গুণে মন ভোর।' রাধা কৃষ্ণকে দেখেছেন, মুগ্ধ হয়েছেন এবং কৃষ্ণের সঙ্গে মিলিত হতে আকুল অভিলাষ প্রকাশ করেছেন—এই বক্তব্যটিকে সঙ্গীতের সুরে ধরা হয়েছে। 'জল সংবাদ' গীতাংশে লৌকিক রূপজ মোহই প্রাধান্য পেয়েছে।

কমল নয়ন কৃষ্ণ কদম্বের তলে।
কামিনীমোহন রূপ দেখে মন ভুলে॥

জল সংবাদ শেষ হবার পর শ্রাবণ সংক্রান্তির মধ্যরাত্রে 'বাসর' বিষয়ক গান আরম্ভ হল; সাতালি পর্বতচূড়ার লোহার বাসর ঘরে চাঁদ সদাগরের শেষ পুত্র লখিন্দরের সর্প দংশনে মৃত্যু-বিষয়ক গানকেই 'বাসর' বলে। দুর্ভাগিনী বেহুলার

১৮ 'পুরাণো খাতার' অন্তর্গত। (পূর্ব টীকা দ্রষ্টব্য)

মনোবেদনা ব্যক্তিত হচ্ছিল গানের ধুয়ায়—'কেন বাসর ঘরে এলাম/প্রাণনাথে হারাইলাম গো'।

ও মা বাস' ঘরে বসি জাগে লখাই ও বেহুলা গো
কেন বাস' ঘরে এলাম।
ও মা সাপিনী সন্ধাতে নারে জানিল কমলা গো
কেন বাস' ঘরে এলাম।
ও মা কি বুদ্ধি করিব এবে পোহাবে রজনী গো
কেন বাস' ঘরে এলাম।
ও মা লখাই বেহুলা বাসর ঘরেতে বসিয়া গো
কেন বাস' ঘরে এলাম।
ও মা নিদ্রা নাহি যায় দোঁহে আছয়ে জাগিয়া গো
কেন বাস' ঘরে এলাম।
ও মা সুতার সঞ্চার পথে নিরখে সাপিনী গো
কেন বাস' ঘরে এলাম।
ও মা প্রবেশ করিতে নারে ভয়ে কাঁপে প্রাণি গো
কেন বাস' ঘরে এলাম।

তবু সব সচেতনতা মিথ্যা হয়ে আসে। কালনিদ্রা নেমে আসে সম্ভ বিবাহিত দুই দম্পতির চোখে। সেই অবসরে বাসর ঘরে প্রবেশ করে কালনাগিনী, কিন্তু দংশন করে কুণ্ঠিত হয়। নাগিনী বলে এমন সুন্দর লখাইকে 'বিনা অপরাধে আমি নারিব দংশিতে গো'। ঘুমের ঘোরে লখাইয়ের পদাঘাত লাগে সাপিনীকে। এবং সেই পাপ স্মরণ করে দংশন করে সাপিনী। যে দংশন অমোঘ মৃত্যু ছাড়া আর কি :

সর্পাঘাতে লখীন্দর আকুল হইল।
জাগহ বেহুলা বলি বলিতে লাগিল॥
সুখে নিদ্রা যাও তুমি পালঙ্ক উপরে।
চেয়ে দেখ মোর পদে সর্পাঘাত করে।
চমকে বেহুলা উঠে বলে প্রাণনাথ॥
অমঙ্গল কথা কেন বল অকস্মাৎ॥
লখিন্দর বলে বামা করহ শ্রবণ।
মোরে দংশী ভুজঙ্গিনী করে পলায়ন॥

গান এই ভাবে অগ্রসর হয়ে যায়। বিষয় ভেদে ধুয়া যায় পাল্টে। রাত্রি চতুর্থ প্রহর স্পর্শ করে। সমাপ্তি টানা হয় গানের। না হলে অন্য দলের অন্য গায়ক এসে বসেন আসরে। অথবা পরের দিনের জন্য গান অপেক্ষা করবে। পরের রাত্রে গান ধরা হবে সেইখান থেকে যেখানে গান শেষ হয়েছিল পূর্ব রাত্রে। অবশ্য যথারীতি 'বন্দনা' ও পাঠ শেষ করে তবে গান আরম্ভ হবে।**

** বিষ্ণুপুর সন্নিকট 'অযোধ্যা' গ্রামে 'দশহরা' উপলক্ষে যে মনসামঙ্গল গান শুনেছিলাম গৌর পণ্ডিতের আসরে তার গায়কি রীতি রামপুরের গায়কি রীতির সঙ্গে সম্পূর্ণ ভিন্ন। সে আলোচনা ভিন্ন প্রবন্ধের বিষয়।

৫

গিন্নীপালন উৎসব

চমকটা লেগেছিল এই কারণেই। পুরুষের প্রবেশ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। অথচ উৎসব। হলই বা মেয়েদের উৎসব। সেখানে পাঁচ বছরের ছেলেদেরও যাওয়া চলে চলবে না।

গিন্নী পালনের খোঁজে আমি যাইনি। গিয়েছিলাম অযোধ্যার দশহরা উৎসব দেখতে। এবং মনসামঙ্গল গান শুনতে। আমি মধ্য রাঢ়ের কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষিত, মনসামঙ্গল পড়েছি—নারায়ণদেবের নাম জানি, নাম জানি কেতকাদাস ক্ষমানন্দের, কিন্তু মনসা পূজা বা মঙ্গল গান কি রকম হয় জানি না। বাংলাদেশের ছেলে, বাংলায় মনসা মঙ্গলের আদি উৎসব ও সর্বাধিক প্রচার ও প্রসার—তবু মঙ্গল গান শুনিনি এই লজ্জা দূর করতেই ট্রেনে-বাসে-হেঁটে অযোধ্য ছুটে ছিলাম। আতিথ্য গ্রহণ করেছিলাম অযোধ্যাবাসী জনৈক বন্ধুর।[১]

মনসামঙ্গল শুনলাম,[২] দেখলাম দশহরা উৎসবের রাজরাজেশ্বরী রূপ। ভুবন মনমোহিনী, সর্বলোকরঞ্জনী মনসাকে চিনলাম। এবং উপরি পাওনা হিসাবে পেয়ে গেলাম গিন্নীপালন উৎসবের গান-গল্প, রহস্যময় বৃত্তান্ত। ঠিক উপরি পাওনা বললে ভুল হবে। দশহরার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গি জড়িত এই গিন্নীপালন উৎসব। অযোধ্যার দশহরার মুখবন্ধ, দশহরা উৎসব-গঙ্গার গঙ্গোত্রী। ওখানে মনসা পূজা ও উৎসব হয়ে থাকে জ্যৈষ্ঠ মাসের ১৫ দিন ধরে। দীর্ঘ পনেরো দিন ধরে উৎসব শুরু হয় গিন্নীপালন উৎসবের গৌরচন্দ্রিকা করে। এই রীতিই চলে আসছে স্মরণাতীত কাল থেকে।

এখন অযোধ্যার ভৌগলিক ও ঐতিহাসিক পরিচয় নেওয়া যাক। বিষ্ণুপুরের

১. জগবন্ধু বন্দ্যোপাধ্যায়। অযোধ্যায় 'উপর পাড়ায়' পৈতৃক বাড়ী। চাকুরী কারণে থাকেন বাঁকুড়া শহরে।

২. মনসার পূজারী গৌর পণ্ডিত অপূর্ব মনসামঙ্গল গান। তাঁর বাড়ী অযোধ্যায়—মনসা মন্দিরের পাশে।

[বাঁকুড়া : বিষ্ণুপুর] মল্লরাজারা যখন বিষ্ণুপুরের রাজধানীকে গুপ্ত বৃন্দাবন রূপে গড়ে তুলেছিলেন তখনই বোধ হয় অযোধ্যার নাম করণ হয়। আসল বৃন্দাবনের অনুকরণে বিষ্ণুপুরের চারপাশের গ্রামগঞ্জের নাম তাঁরা নতুন করে করেছিলেন। গত শতাব্দীতে অযোধ্যা বর্ধিষ্ণু গ্রামে পরিণত হয় নীলচাষ করে[৩]। এখানের বন্দ্যোপাধ্যায় বংশ আজও আছে, কিন্তু সমস্ত গৌরব এখন পড়তির দিকে। 'দেবোত্তর' নামে যে রাজবাড়ী, মন্দির মঞ্চ এখনও আছে তা দেখলে বোঝা যায়। আর্য সংস্কৃতির, বৈষ্ণব সংস্কৃতির প্রসার এখানে কতখানি অযোধ্যার পূর্বদিকে জয়কৃষ্ণপুর, পশ্চিমে দামোদরপুর এবং লোহালাড়া, উত্তর দিকে লায়েক বাঁধ ও আটচূড়া, দক্ষিণদিকে দ্বারকেশ্বর নদ ও ওপারে চড়ুইকুঁড় এবং রাণী খামার। অযোধ্যা গ্রামে বর্তমান লোকসংখ্যা প্রায় ২ হাজারের মতো। সমগ্র অধিবাসীদের মধ্যে প্রায় শতকরা দশভাগ তপশীলী জাতি-ভুক্ত অধিবাসী। সমগ্র অযোধ্যা গ্রামে তারা ছড়িয়ে ছিটিয়ে বাস করছে। এই গ্রাম পাঁচটি পাড়ায় বিভক্ত—নামো পাড়া, মাঝো পাড়া, উপর পাড়া, কামার পাড়া, কানকেঁদো পাড়া[৪]। মাঝো পাড়ায় মনসার থান। আর উপর পাড়ায় ব্রাহ্মণ, বৈদ্য বেশী। অধিবাসীদের বাসস্থানের খোঁজ নিয়ে দেখা যাবে এখানে লোকায়ত সংস্কৃতি মিলেমিশে আছে আর্য সংস্কৃতির সঙ্গে ঐ ভাবে। আর অযোধ্যার প্রাচীন রাজবাড়ী, রাসমঞ্চ, পাথরের মন্দির[৫] প্রভৃতির খোঁজ নিতে নিতে পেয়ে যাবেন 'গিন্নীপালন' উৎসবের উৎস!

দশহরা উপলক্ষে মনসাপূজার মূল উৎসব দিনের ১৪ দিন আগে যে মঙ্গলবার সেদিন এখানে 'গিন্নীপালন' উৎসব হওয়ার বিধি। এ বৎসর গিন্নীপালন উৎসব হয়েছিল ১১ই জ্যৈষ্ঠ [১৩৮৩]।

গিন্নীপালন উৎসবের দিন সকালে অযোধ্যা গ্রামের নানা পরিবার থেকে গিন্নীরা এসে জমায়েত হন 'মনসামাড়ে' অর্থাৎ মনসামন্দিরের সামনে ও ভিতরে। পার্শ্ববর্তী গ্রাম থেকেও বউড়ী, ঝিউড়ী, বিবাহিতা মেয়েরা আসেন উৎসবে অংশ নিতে। এদের মধ্যে সধবা ও বিধবা উভয়েই থাকেন। না, কুমারী মেয়েরা থাকেন না, তাঁরা অংশ গ্রহণ করতে পারবেন না। ৫০-৬০-৮০-১০০ জন পর্যন্ত গিন্নী এসে দাঁড়ান মনসা মন্দিরের সামনে। সুবেশিনী সুসজ্জিতা ভক্তিমতীরা

৩। Bankura District Gazetteer—1911, By Amiya Banerjee.

৪। সব থেকে নীচু পাড়া বলে বর্ষায় ভীষণ কাদা হয়—তাই এ রকম নাম।

৫। মাকড়া পাথরের মাঝারি মন্দির, উপর পাড়ায় অবস্থিত। মন্দিরটি পরিত্যক্ত।

পূজা প্রণাম করেন মনসাকে[৬]। মনসার মাথায় ফুল চড়ানো হয়। মায়ের অনুমতি নেওয়ার জন্য। একে বলে 'ফুলকাড়ানো'। চড়ানো হয় পদ্মফুল। উৎসব করার ব্যাপারে মায়ের অনুমতি হলে দেবীর মাথায় চাপানো ফুলগুলি থেকে একটি ফুল ছিটকে পড়বে মেঝেতে। সেই ফুলটি অনুমতি স্বরূপ দেওয়া হয় 'রাজার গিন্নীর' হাতে। রাজার গিন্নীই হচ্ছেন গিন্নী পালন উৎসবের মূল পরিচালিকা, প্রধানা নির্দেশিকা। তাঁকে সম্মান দিয়ে তাঁর অনুমতি নিয়ে নিভৃত নির্জন নদীপুলিনে উৎসব চলে। এ বৎসরের প্রধানা ছিলেন রাজার গিন্নি অর্থাৎ শ্রীমতি হররাণী দেব্যা[৭]।

হররাণী আমাদের কাছে গিন্নীপালন উৎসবের কথা বলতে বলতে কেঁদে তিনি বললেন, জগতের মঙ্গল কামনা করে, পাড়া-প্রতিবেশী ঘর-গৃহস্থের মঙ্গল কামনা করে উৎসব শুরু হয়! "জগতের, পৃথিবীর যেন শান্তি হয়'—এই বলে মায়ের কাছে, মা মনসার কাছে আমি প্রার্থনা করি। তারপর অনুমতি দিই উৎসবের।"

মনসার কাছে প্রার্থনা ও প্রণাম নিবেদন করেন রাজার গিন্নী। তাঁকে অনুসরণ করে অন্য সব নারীরা প্রণাম নিবেদন করেন। বাদ্য বাজনা সহকারে মেয়েদের দল এগিয়ে চলেন অদূরে গ্রাম-পার্শ্ববর্তী দ্বারকেশ্বর নদের দিকে। নদীতে শীর্ণ জলরেখা। এই নদীপ্রান্তে এসে বাদ্যকর বা অন্যান্য পুরুষেরা মেয়েদের সঙ্গ ত্যাগ করেন, ঔৎসুক্য দমন করেন। এবার মেয়েরাই নামবেন নদীগর্ভে। নদীতে জল প্রায় নেই। বিস্তৃত বালুভূমিতে তাঁরা পা-ফেলে হাঁটবেন, ধীর আনন্দময় সারি বেঁধে চলবেন। এগিয়ে যাবেন ওপারে একটি নির্জন চরের দিকে। এঁরা যাকে বলেন 'চটাই'। সেই চটাই-য়ে আছে সামান্য গাছ—আছে একটি আম গাছ। বট গাছও আছে।[৮] শংখ, প্রদীপ, বরণডালা, খাবারদাবার, পান ও মশলা, ফুল ও ফুলের মালা, আলতা সিঁদুর গিন্নীদের

৬। মন্দিরের ভিতর মনসা একা নন। পদ্মাবতী, কালী ভবানী, ওলাই চণ্ডী, জয়া, বসন্ত কুমারী, কালীবুড়ী, আশাবরী প্রভৃতি অন্যান্য দেবীরাও আছেন। মন্দিরটি সাধারণ দুর্গামণ্ডপের মতো, ইটের তৈরী।

৭। পরলোকগত মুরলীমোহন গঙ্গোপাধ্যায়ের স্ত্রী। নামোপাড়ায় বাড়ী।

৮। 'চটাই' সম্বন্ধে একটা ভীতির আবরণ সকলেই গড়ে তুলছিলেন, লেখকের কাছে। সেখানে কোন সময়েই যেতে নেই, ফটো তোলা বারণ, মা মনসার নিষেধ আছে, অমান্য করলে বিপদ হবে ইত্যাদি।

সঙ্গে থাকে। তেল গামছা নিতেও ভোলেন না। কারণ ঐ উৎসব অনুষ্ঠানের মাঝখানে পাঁচবার স্নান করার নিয়ম।

এই গিন্নীদের দলে শুধু উচ্চ অভিজাত ঘরের মেয়েরা থাকেন তা নয়। সর্বশ্রেণীর, সর্বজাতির গিন্নীরা এই উৎসবে যোগদান করার অধিকারী। বাউরী, কামার, নাপিত প্রভৃতি নিম্নবর্ণের গিন্নীরা সসম্মানে এখানে স্থান পান। এবং সেদিন স্থানীয় লোক-বিশ্বাস মতে, সব গিন্নীই 'মা মনসা'।

এই বিচিত্র বিশিষ্ট অনুষ্ঠানের পিছনে কিম্বদন্তী ও লোক-বিশ্বাস বর্তমান। শুনলাম—স্বয়ং মা মনসা যোগদান করেন গিন্নীরূপে। তাঁরা বললেন—এককালে মায়ের রথ ছিল সাতখানা। একখানা এখনো আছে। মা যে রথে চড়ে যান তার প্রমাণ আমরা পাই। আমাদের আগে আগে মা যান। নদীর জলে রথের চাকা ঘুরতে থাকে। অন্য একটি কিম্বদন্তী বলে, একদিন পুরাকালে পাড়ার মেয়েরা যখন 'গিন্নী' 'গিন্নী' খেলছিল তখন মা মনসা ছদ্মবেশে তাদের সঙ্গে খেলতে আসেন। তার থেকেই গিন্নী পালন উৎসবের চল্ হয়েছে।

চটাই। নদীর মধ্যে উচু বালুময় স্থান। চটাইয়ের সামনে নদীর জল গভীর। প্রশস্ত নির্জ্জন স্থানে সম্পূর্ণ স্বাধীন ভাবে মেয়েদের উৎসব। কবে থেকে এই উৎসবের প্রচলন হল সঠিক জানা যায় না। স্থানীয় বৃদ্ধরা বললেন, এখানের মনসা পূজা চাঁদ সদাগরের সময় থেকে চম্পানগরের পূজাবিধি অনুযায়ী হয়! যাই হোক, অসূর্যম্পশ্যা পর্দানশীন যুগেও এমনি করে বাড়ীর মেয়েরা বৌ-বিধবারা স্বাধীন ভাবে উৎসব করতে সুযোগ পেতেন, ভাবতেও বিস্ময় জাগে। মেয়েরা চটাইয়ে পৌঁছোবার পর নিজেরাই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে নেন স্থানটি। তারপর আম গাছের নীচে বিশেষ স্থানে ঘট স্থাপনা করে মনসার পূজা করা হয়। মায়ের পূজা ও ভোগ ও রাগ হয়। আরতি হয়। মায়ের কাছে ভূলুণ্ঠিত প্রণামে মনে মনে মানত করেন অনেকে। এখানে এই চটাই-এ মানত করেন অনেকে। এখানে এই চটাই-এ মানত করলে অবশ্যই পূর্ণ হবে নিভৃত আকাঙ্ক্ষা। আর যাঁদের পূর্ববর্তী মানত, পূর্ব পূর্ব বছরের মানত সফল হয়, তাঁরা লুটিয়ে পড়েন দেবীর অনুগ্রহ স্মরণ করে। তাঁরাই ফলমূল, মিষ্টি, তেলেভাজা, পান ও মশলা আনেন দেবীকে দেবার জন্য, দেবীকে দিয়ে তারপর গিন্নীদের মধ্যে বিতরণ করার জন্য।

মায়ের পূজা করে, ভোগ আরতি সমাপন করে গিন্নীরা সারা গায়ে তেল-হলুদ মাখেন। তারপর দাঁতে মিশি দেন। তখন ভক্তিমতীরা হয়ে ওঠেন

গৌরব গরবিণী, রসিকা রঙ্গরঙ্গিনী। জলের সঙ্গে মেয়েদের চিরকালের সখিত্ব। জল আর নারীর স্বভাব এক। এখানে জনমানবহীন নির্জনতায় জলের সঙ্গে মেশে উচ্ছল কলকাকলী। স্নান সেরে উঠবার পর, খাওয়া দাওয়া চলে। সত্ত রান্না করে অন্নগ্রহণ ও অন্নদান করা হয় না এখানে। যা কিছু খাদ্য পানীয় সবই আনা হয় যে যার ঘর থেকে। আগের দিন থেকে সঞ্চয় করে রাখেন গিন্নীরা বা গতরাত্রে প্রস্তুত করে রাখেন রাত জেগে।

খাওয়া দাওয়া হাসি ঠাট্টা প্রাণের কথা কানাকানি করার মাঝে মাঝে স্নান চলে। যেমন 'কেষ্ট-রাধা'র গান :

প্রাণ সখীরে পটে আঁকা মূরতিমোহন,
ঘটে কি না ঘটে সখী পটে করি দরশন।
পটে আঁকা মূরতি মোহন॥
একদিন হেরেছিলাম শ্রীযমুনার ঘাটে
সেইরূপ ছবি আঁকা এই চিত্রপটে—
বটে বটে বটে সখী সেহ নাগর বটে।
ঘটে কি না ঘটে সখী পটে করি দরশন।
পটে আঁকা মূরতি মোহন॥
কহ সখী উহারে রসকথা কহিতে,
আড় নয়নে মুচকি হেসে আমার পানে চাহিতে
ও যে করে ধরি আদর করি নিজ করে ধরিতে।
আনি তাপিত অঙ্গ শীতল করি—করি উহায় আলিঙ্গন
পটে আঁকা মূরতি মোহন॥

কালো মিশি দিয়ে কালো করা দাঁতে বড় মধুর হাসতে হাসতে বালবিধবা 'খাঁদুদিদি'[১] এই গান গেয়ে শোনালেন। আজ তাঁর বয়স ৮০ বছর। তিনি তাঁর দশ বছর বয়স থেকে গিন্নীপালন উৎসবে যাচ্ছেন। রান্নাঘরের এক পাশে বসে, কিছুক্ষণের জন্য রান্না বন্ধ করে রেখে তিনি পুনরায় খালি গলায় গান ধরলেন :

আজো কি আনন্দময় মিথিলা ভুবন হেরি রে,
মিথিলা ভুবনে ভুবনমোহন রাম বরবেশধারী রে॥

১। রাধারাণী বন্দ্যোপাধ্যায়। মাঝো পাড়ায় ভায়ের বাড়ীতে থাকেন। ভাইয়ের নাম আদিত্যগোপাল গাঙ্গুলী।

যত সব মিথিলার নারী স্বর্ণপ্রদীপ হাতে করি,
তারা উলু লু লু ধ্বনি দিতে দিতে
রাম ঘিরিঘিরি নাচে রে।
আজো কি আনন্দময় মিথিলা ভুবনে হেরি রে।।

সেই 'মিথিলাভুবন' যেন সৃজিত হয় ঐ চটাই-এ। ওখানে সেদিন যে শুধু গানের পর গান চলে তা নয়—ওখানে সেদিন নাটংও হয়। 'রামসীতার বিবাহ' পালা। একজন গিন্নীকে পুরুষবেশ পরিয়ে রাম সাজানো হয়, অন্য আর একজন সাজেন সীতা। গায়ে হলুদ, অধিবাস, ছাদনাতলায় চারি চক্ষের মিলন ও মালাবদল এবং বাসর সব অনুষ্ঠানই চলে নাটকীয়ভাবে হাস্যকলরোলের মধ্যে। গিন্নীপালন উৎসবের মূল রঙ্গ এই রামসীতার বিবাহকে কেন্দ্র করে জমে ওঠে।[১০] রঙ্গে রসে গানে উল্লাসে অভিনয়ে জমজমাট আনন্দ।

রাধাকৃষ্ণ আর রামসীতা এই দুই পৌরাণিক জোড় সেদিন বাস্তবে আবির্ভূত হন। যেখানে প্রেম, যেখানে বিরহতাপিত অঙ্গ ও শীতল সমাপ্তি— সেইখানেই রাধাকৃষ্ণ। কিন্তু রাধাকৃষ্ণের মধ্যে বৈধ বিবাহ নেই। তাই রাধাকৃষ্ণকে নিয়ে শেষ পর্যন্ত গ্রামীণ নারীদের একটি অতৃপ্তি থেকেই যায়। অথচ রামসীতার সামাজিক বিবাহে আছে গৃহমিলনের সুখ। যাঁরা অন্বেষণ করবেন তাঁরা দেখতে পাবেন, রামসীতার কাহিনী সমগ্র বাঁকুড়া জেলার লোক-গানে ও লোকসাহিত্যে বহুল ভাবে ছড়িয়ে আছে। তার থেকে সহজেই বোঝা যায় রামসীতাকে রাঢ় বাংলার মানুষ এক বিশেষ অনুরাগে আপন করে নিয়েছেন। গিন্নীপালন উৎসবের গানেও সেই লক্ষণ। এই উৎসবের যজ্ঞেশ্বর-যজ্ঞেশ্বরী, কৃষ্ণ-রাধিকা নয়, রাম ও সীতা। দু-জন গিন্নীকে রাম ও সীতা সাজাবার জন্য 'মনসা মাড়' থেকে আনা ফুল, ফুলের মালা, চকখড়ি প্রভৃতি দিয়ে দেওয়া হয়।

রস অভিনয়ের ভঙ্গিতে কোন পুরনারী দ্রুত তালে পা ফেলে এগিয়ে এসে রামের চিবুক ছুঁয়ে গান ধরলেন :

সীতা এত সুন্দরী রাম
তুমি কেন কালো হে ?

১০। এবারে গিন্নাদের মধ্যে রাম সেজেছিলেন শিবানী দেবঘরিয়া, সীতা সেজেছিলেন বিমলা কর্মকার।

রামের আর লজ্জা করলে চলে না। তিনিও সপ্রতিভ প্রেম গদগদ ভঙ্গিতে গানের সুরে উত্তর দেন :

সীতা সহবাসে আমি
হইব সুন্দর হে।

অন্য সখী বলেন

রাস্তা থেকে শুনে এলাম
তুমি বড় ভালো হে,
এখানে এসে দেখি ও রাম
তুমি বড় কালো হে।

নিন্দা শুনে মৃদুমন্দ হাসি ছড়িয়ে আড় চোখে একবার রাজকন্যা সীতাকে দেখে নিয়ে বররূপী রাম উত্তর দেন :

সীতা সহবাসে আমি
হইব সুন্দর হে।

সহবাস রসে মগ্ন বাসর ঘরের সমস্ত সৌন্দর্য ও ভালোবাসার উৎসার ঘটে ঐ চটাইয়ে। সত্ত্ববিগত রঙ্গের স্মৃতিতে পাঁচ সন্তানের মা যমুনা মুখার্জীর দু-চোখে আলো চকচক করছিল যখন ঐ গানটি গেয়ে শোনাচ্ছিলেন গিন্নী-পালন উৎসবের তেরো দিন পরে।

রাম সীতার বেশবাসও লক্ষণীয়। রাম সীতা অর্থাৎ বরকনেকে নতুন কাপড় পরানো হয়। নতুন গামছাও দেওয়া হয়। পদ্মফুলের গয়না পরানো হয় কনেকে। আর মাথায় দেয়া হয় বটপাতার মুকুট। নিপুণিকারা দ্রুত ছাদে সন্ত ভাঙ্গা বটপাতা গেঁথে সুন্দর মুকুট তৈরী করেন।

কাল্পনিক বাসর ঘরে রামকে নিয়ে আর একটি গান :

ওগো রাজার জামাতা
দুটো কওনা রসের কথা।
আমরা সকল যুবতী,
নিজ নিজ পতি ছেড়ে রাম
আমরা এসেছি হেথা।
দুটো কওনা কথা রাম
আমরা তোমায় ভালোবেসেছি ॥

রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক মেয়েলি গানের সংখ্যাও কম নয়। এই সব গান কে

রচনা করেছেন—এখন আর ঠিক ঠিক জানা যায় না। বহু গান বহুদিন ধরে গাওয়া হচ্ছে। আবার সদ্য রচিত নতুন গানও আছে। যাঁদের কণ্ঠে সুর আছে, যাঁরা সহজেই গান করতে পারেন, তাঁদের মধ্যে সঙ্গীত রচয়িত্রীও আছেন। এমন এক সঙ্গীত রচয়িত্রীর সঙ্গেও আমাদের দেখা হয়েছিল। তিনি বিধবা এবং বৃদ্ধা হয়েছেন। তাঁর নাম 'কর্তা'। সবাই তাঁকে ডাকেন কর্তা নামে। বর্ধিষ্ণু পরিবারের একজন গায়িকা, গান রচয়িতাকে সবাই কেন 'কর্তা' নামে ডাকছেন, জানতে চাইলাম। জানতে পারলাম—তিনি হচ্ছেন 'কর্তা মা'। তার থেকে অবশিষ্ট রয়েছে শুধু 'কর্তা'! তাঁর বয়স প্রায় সত্তর বছর।[১১] এ ছাড়াও জানা গেল চটাইয়ে গান বিতরণ, গান যোগান দেবার অধিকারী নাকি একজন নাপিতানী। তাঁর সঙ্গেও দেখা হল—তাঁর কুঁড়েঘরে, মাঝোপাড়া ও উপরপাড়ার সীমায়। দুয়ারে ছাগল বাঁধা। উনানে ভাত চাড়িয়েছেন তাঁর ছেলের বউ। নাপিতানীর বয়স হয়েছে, চোখে তেমন দেখতে পান না। গলা ধরে গেছে, কদিন ধরে মনসাপূজা উৎসবের স্নান-আহারের অনিয়মে। তাঁর নাম রেণু প্রামানিক। তাঁর গলায় রাধাকৃষ্ণের গানই বেশী :

শ্যাম সুন্দর হে—মাটির প্রদীপ
জ্বালিয়ে ছিলুম মাটির ঘরে।
দেবালয়ে আসন পেতে
আজকে তোমায় আনবো ডেকে।
এসো আমারো মনে—সেই বৃন্দাবনে,
বাঁশি বাজবে প্রাণে রয়ে রয়ে।
শ্যাম সুন্দর হে ··· ··· ···।

ভাঙা গলায় সপ্রতিভ ভঙ্গিতে গান গাইছিলেন রেণু প্রামাণিক। তাঁর কণ্ঠের আকুল দরদের সঙ্গে প্রেম আর ভক্তি মিশেছিল। তিনি পুনরায় গাইলেন :

কালো অঙ্গ গৌর কেন হলে ভাই,
আমি শুধাই তাই!
আমি যে তোর শ্রীদাম সখা
চিনতে কি পার না ভাই।

১১। শ্রীমতী রাজেশ্বরী বন্দ্যোপাধ্যায়, বয়স ৭০ বছরের বেশী। উপর পাড়ায় বাড়ী।

ওরে ব্রজের ঋণ কি এতই ভারি
ব্রজে থাকলে কি শোধ হত নাই
কি অভাবে দীনের অধীন
পরেছ ভাই ডোর আর কোপিন,
হাতে হাতে দিয়ে তালি লুকালে ভাই বনমালী।
ওরে আমারে লুকাতে বলে তুই লুকালি নদীয়ায়।
কালো অঙ্গ গৌর কেন হলে ভাই!

কৃষ্ণকে কত আপন করে জানলে এমন করে 'ভাই' বলা যায়! কালো কৃষ্ণ গোপিনীদের এমনই বন্ধু। কিন্তু সেই কৃষ্ণ যখন চৈতন্যরূপে নদীয়ায় গৌর অঙ্গ নিয়ে আবির্ভূত হলেন তখন দেখা গেল রসমূর্তি ছেড়ে তিনি যোগীমূর্তি ধরেছেন। ঐ গৌরাঙ্গরূপ সন্ন্যাসী মূর্তির মধ্যে যে সখা-শ্রেষ্ঠ কৃষ্ণ লুকিয়ে আছেন তা কেমন করে ভুলবেন চিরন্তনী নারী গোপিনীরা?

গান গাইতে গাইতে পয়ার-বন্ধে কবিতা উচ্চারণ করে গেলেন রেণু প্রামাণিক! গায়িকার নিজস্ব জীবন-ধর্মের প্রতিফলন ঘটেছে এই পয়ারবন্ধে:

গোচারণে ছিল কৃষ্ণ সুদামের সনে।
হেনকালে পড়ে গেল শ্রী রাধিকা মনে॥
সখী নাই দূতী নাই কি নিয়ে যাইব।
শ্রীরাধিকার কুঞ্জে যেয়ে নাপতানী হব।
কাঁকেতে আলতার ঝুড়ি হস্তেতে নরুনি!
ধীরে ধীরে চলেন কৃষ্ণ যথা বিনোদিনী।
বিনোদিনী বিনোদিনী বিনোদিনী রাই।
আলতা পরাবার জন্য নাপতানী যাই।
কৃষ্ট ডাকে ঘন ঘন আলতা পরিতে।
কুঞ্জে ছিল সখীগণ শ্রবনিল কানে॥
নয় বুড়ি কড়ি আমি অগ্রে গুণে লবো।
যে জনা পরিবে আলতা তাহারে পরাবো।
এসো গো সুন্দর রাধে বস গো আসনে।
[শুন শুন শুন রাধে] না হেলাও গা।
অগ্রেতে বাড়িয়ে দিবে দক্ষিণের পা॥

সুন্দর রাধার হাতে আছে দুই সরু শংখ।
চাঁছিতে চাঁছিতে কৃষ্ট লিখে দিলেক নৌক।
চাঁছিতে চাঁছিতে কৃষ্ট ভাবে মনে মনে।
আপনার নাম কেনে লিখিনু চরণে।
ওগো ওগো বিন্দে দুতি জল নিয়ে এসো।
আলতা তো ধুয়ে দুব, না রাখিব পায়ে।
আলতা তো ধুয়ে দিলম নাম না উঠিল।
ঐখানেতে শ্রীরাধিকা ভিয়ানে [?] [১২] বসিল।
গোবিন্দের মনে আনন্দ হইল।

টানা টানা খুশী খুশী সুর সহযোগে এক নাটকীয় কাহিনী বর্ণনা করতে করতে গায়িকা হেসে উঠেছিলেন। এইসব গান যোগান দিয়েই গিন্নীপালনের উৎসব জমজমাট করে আসছেন গায়িকা কত না বছর ধরে। রেণু প্রামাণিকের বয়স এখন প্রায় পঞ্চাশ বৎসর। কৃষ্ণরূপে মুগ্ধা রাধা-প্রেমে প্রেমবতী এইসব গিন্নীরা সে যুগেও ছিলেন, এ যুগেও আছেন। কিন্তু ভাবের কথা ভাষা দিয়ে গান গেয়ে শোনাতে কজন পারেন? রেণু প্রামাণিক আবার গান ধরলেন— রাধার দুঃখ বৃদ্ধার কণ্ঠে যুবতীর অন্তর্বেদনা হয়ে ঝরে পড়লো :

আমি কেন কেঁদে মরি কিষ্ট রূপ ধরি
দাঁড়াবো চরণ ছেঁদে
আমার দে গো মোহন চূড়া বেঁধে।
আমি কিষ্ট হব তোমায় রাধিকা সাজাবো
পাথারে ভাসায়ে একদিন মথুরায় যাবো।
দুঃখ জানে না জানে না জানাবো জানাবো
যেদি হয় শ্যাম বিচ্ছেদ এ।
আমায় দে গো মোহনচূড়া বেঁধে।
আমি নীলবসনী তোমায় নীলবসন পরাবো
কপালে সিঁদুরের বিন্দু দিয়ে দিবো।
এমন একদিন লুকাইবো
দিব না তো তোরে স্বপনেও দেখা।

১২। 'ভিয়ান' নয়, কথাটা হবে 'ধিয়ান' (ধ্যান)।

গানটির বক্তব্য হৃদয় স্পর্শ করে। রাধা কৃষ্ণের দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হয়েছেন। বিরহ ব্যথাতুরা রাধা কৃষ্ণ-বিরহ সহ্য করতে না পেরে অদ্ভুত উপায়ে প্রতিশোধ নিতে চাইছেন। শ্রোত্রীগণের মর্মলোকে দূরায়ত অলৌকিক বৃন্দাবনের রাধা এমনি করেই নেমে আসেন, এখানেও নেমে এসেছেন।

উপর পাড়ায় হরিমতি মুখার্জী বৈঠকী সুরে নির্ভুল গেয়ে শোনালেন আর একটি প্রেমগীতি। অভিসারিকা রাধা মূর্ত হয়ে উঠেছিল সে গানে :

গিরিধারী সাথে মিলিতে যাইব
সুন্দর সাজে সাজায়ে দে।
অধর রাঙায়ে দে তাম্বূল রাগে,
চরণে আলতা পরায়ে দে।
লাখ লাখ যুগ পরে শুভদিন এল,
মেউদি রঙে হাত রাঙায়ে দে। [১৩]

রাগমিশ্রিত এ গানটিতে অভিসারিকা রাধা আর বাসকসজ্জিকা রাধা মিলে মিশে গেছে। কাঁপা কাঁপা মিষ্টি সুরে গানটি গাইতে গাইতে হরিমতি মুখার্জী তাঁর প্রৌঢ় বয়সের পরিধি থেকে আমাদের নিয়ে যেতে পেরেছিলেন যৌবনের প্রেমরঙে রাঙা দিনগুলিতে। শুধু রাধার কথা নয়, নয় শুধু কৃষ্ণের কথা, গিন্নীপালন উৎসবে রঙ্গিনী গায়িকাদের আপন মনের সলজ্জ বাসনা গীতরূপ ধরে প্রকাশ পায়। যেমন এই গানটি :

আমি মানসবনের সোহাগ ফুলে
গেঁথেছি হে হার।
এসো হে হিয়ার রাজা গলাতে পরাবো তোমার।
মনের সাধে বাহুপাশে বাঁধিব,
তুমি মধুর হেসে
প্রেমাবেশে পিও এ অধর সুধারসে।
কভু প্রেমে গাঁথা রব
প্রাণে প্রাণে মিশে রব হে প্রভু আমার। [১৪]

১৩। গানটি হয়তো প্রাচীন 'রেকর্ড' সংগীতও হতে পারে।

১৪। গায়িকা অমলা দাসগুপ্তা, বিধবা, উপর পাড়ায় বাড়ী। বৃদ্ধা, কিন্তু গাইলেন অপূর্ব, গায়কি চঙ চমৎকার।

গিন্নীপালন উৎসবে গিন্নীরা শুধু যে প্রেম পীরিতের, বিরহ মিলনের গান করেন তা নয়, সব গানই যে তাঁদের নিজের রচিত তাও নয়। অতুলপ্রসাদী, শ্যামাসংগীত, রবীন্দ্রসংগীত, কীর্তন, আধুনিক গান, বহু প্রচলিত সিনেমার গান, ভজন গানও কেউ কেউ গেয়ে থাকেন। রাজার গিন্নী হররাণী আমাদের কাছে যে ভাবে গিন্নীপালন উৎসবের আন্তর মানসিকতাটি উদ্ঘাটন করেছিলেন তাতে ভক্তি ভাবেরই প্রাধান্য ছিল। তিনি যদিও গেয়েছিলেন—'আমি বৃন্দাবনে বনে বনে ধেনু চরাবো/খেলবো ধুলবো রাধা বলবো বাঁশি বাজাবো'—তবু দু-চোখে জলের ধারা বইয়ে আকুল আর্তস্বরে কৃষ্ণকীর্তন করলেন 'রাধা রাধা গোবিন্দ গোবিন্দ' ধ্বনি দিতে দিতে। 'কৃষ্ণনাম আমায় কে শোনালো' গানের সুরে তাঁর এই আকুল জিজ্ঞাসার মধ্যে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিল অন্তরনিস্রাবী ভক্তি। মাঝখানে প্রীতি আনন্দের নাটকীয়তা রেখে তাকে ভক্তিভাবে মণ্ডিত করে তোলাই গিন্নীপালন উৎসবের সবিশেষ বৈশিষ্ট্য। ভাবে ভরা দার্শনিক বৈরাগ্যের গানও তাই চলে। 'কর্তা'র অর্থাৎ রাজেশ্বরী বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিজের রচিত এমন একটি গান শুনিয়েছিলেন রেণু প্রামাণিক :

আর কতদিন থাকবো হরি এ ভাঙা ঘরে,
আমার আশা মায়ায় ঘর পুড়েছে
নিন্দা অঝোর সংসারে!
মন মনের আশা তেতোলা করি,
সাধুসঙ্গ হরি কোথা, পাই না মিস্তিরি
আবার রাজেশ্বরী কয়
ও তোর মিস্তিরি পাবার নয়।
কৃষ্ণ বলে কাঁদলে পরে ভক্তের কৃপা হয়।
ও যে গুরু গোবিন্দ বলে ও তোর মিস্ত্রী এলে
বসে বসে কর না দালান সিংহাসন তুলে।
সিংহাসনের প্রদীপ কি হবে,
গুরুর কৃপায় প্রদীপ জ্বালিবে।
হরি ও আশায় নিরাশ করো না একেবারে।
আর কতদিন রাখবে হরি এ ভাঙা ঘরে॥

দুঃখের বিষয়, গানে-গল্পে নৃত্যে নাটকে গিন্নীদের যে উৎসব এমন প্রাণময়, সে উৎসবে আমরা যেতে পারিনি। পূর্বেই বলেছি, পুরুষের প্রবেশ সম্পূর্ণ

বিদ্ধ। তাই সাধারণ গৃহবাসিনী গিন্নীদের মুখের কথা শুনে শুনে ঔৎসুক্য প্রশমন করতে হয়েছে। তাঁরা কতটা বলেছেন, কতটা গোপন করেছেন তাও জানি না। তবে রঙ্গরসিকতার অনেক কিছুই যে গোপন করেছেন বোঝা যায় হাসি হাসি মুখে আমাদের প্রশ্নের উত্তর দেবার ধরণ দেখে।

দুপুর গড়িয়ে বিকাল হলে, গিন্নীরা ঘরে ফেরার পথ ধরেন। সার বেঁধে ঘরে ফিরতে ফিরতে তাঁরা সমস্বরে হরিধ্বনি দিতে থাকেন। কিন্তু সারা দিনের ঐ আনন্দ মিলনের শেষ গান কি নেই? আছে। বড় বেদনার, বড় ব্যথার সে গান। নিভৃত নির্জনে, মুক্ত প্রকৃতির মাঝখানে, আদিগন্ত বিস্তৃত আকাশতলে, সোনালি-ধূসর নদীবক্ষে যে হৃদয় বিনিময়ের সুযোগ এসেছিল, সে সুযোগ আবার আসবে এক বছর পরে। তাই ঘরের পথে পা ফেলবার আগে বুকের ভিতরের সূক্ষ্মতন্ত্রীতে হাহাকারের সুর বাজে। সেই হাহাকারকে গানের পদে বেঁধে গাইলেন সত্তর বছরের বৃদ্ধা সু-গায়িকা অমলা দাশগুপ্তা:

কাঁদেরে পরাণ আজি
তোমা সবে ছেড়ে যেতে,
বিধি জানেন কবে দেখা হবে
পুনঃ ভূ-জনাতে।
মিনতি করিয়ে সই—
এবার আমি বিদায় হই
পতি সনে মিলিতে।
কাঁদেরে পরাণ আজি
তোমা সবে ছেড়ে যেতে।

বাইরের এই আনন্দ আহ্লাদই সব নয়, স্বামী-সোহাগিনীদের ঘরে আছেন স্বামী। সারাদিন তাঁর সঙ্গে দেখা নেই। তাই সতীলক্ষ্মী গৃহিনীদের মনে জেগেছে আর এক আকুলতা—ঘরে ফেরার আকুলতা। 'চটাই' ছেড়ে তাই সবাই ঘরের পথে।

'দিনের আলো নিভে এলো সুয্যি ডোবে ডোবে'-অস্তগামী রাগরক্তিম সূর্যকে ডুবতে দেখেছেন গিন্নীরা। যাবার সময় কলমুখরতা ছিল, হুলুধ্বনি আর রংতামাসার উচ্ছলতা ছিল, ফিরে আসার সময় তা নেই। তাঁরা সংযত, গম্ভীর, আত্মস্থ। ধীর পা ফেলে তাঁরা সারিবদ্ধ ভাবে ফিরছেন। তাঁরা সকলেই বড় ক্লান্ত, বিষণ্ণ। তাঁরা হরিধ্বনি দিতে দিতে এসে দাঁড়ালেন সেইখানে যেখান

থেকে যাত্রা সুরু হয়েছিল। গ্রামের মধ্যে 'মাঝো পাড়ায়' অবস্থিত সেই মনসামাড়ে। এখানে এসে দেবী মনসাকে তাঁরা পুনরায় প্রণাম নিবেদন করেন। গিন্নীদের প্রত্যেকের হাতে এখানে সাজা পান দেওয়া হয়। তারপর ছত্রভঙ্গ হয়ে যে যার আপন আপন ঘরের আঙিনায় এসে দাঁড়ান। ঘরের বউ অথবা বোন যিনি আজ স্বয়ং মনসা, ঘরে ফিরলে তার পায়ে ঘড়া উপুড় করে জল ঢেলে দেওয়া হয়। পাড়া কাঁপিয়ে অন্ধকার মথিত করে বেজে ওঠে শঙ্খ। ভিজে পায়ে উঠোনে দাঁড়িয়ে উৎসব ফেরৎ গিন্নী তখন বলবেন—জিজ্ঞাসা করবেন:

সোনার প্রদীপ জ্বলে ঘরে
ঘরে কেন আলো?

শাশুড়ী কি ননদিনী অথবা অন্য জায়েরা উত্তর দেবেন—

গিন্নী গেছে গিন্নী পালনে
ঘরের সব ভালো॥

দশহরা উৎসব

বাংলার ঘরে ঘরে দশহরার দিন মনসা পূজা হয়। তুলসীতলায় বা অন্য কোন পবিত্রস্থানে বা উঠোনে একটি কাঁচা গোবরের ড্যালার উপর একটি, তিনটি বা পাঁচটি মনসাসিজ পাতা গেঁথে মনসাকে পূজা নিবেদন করেন ব্রাহ্মণ পুরোহিত। অথবা মনসাসিজ গাছের তলায় বসেও পূজা হয়, পূজা হয় মনসাথানে। ঐ পূজার সময় দশ রকমের দশটি ফল নিবেদন করতে হয়। দশহরা অর্থাৎ দশটি পাপ[1] হরণ করেন যিনি। কিন্তু দশহরার সঙ্গে মনসার যোগ হল কেন?

এর উত্তর আমরা জানি না। দশহরার দিন শুধু মনসার পূজাই হয় না, দেবী গঙ্গার পূজা নিবেদনের বিধানও আছে হিন্দু পঞ্জিকায়। কোন কোন পণ্ডিতের আলোচনা[2] পড়লে মনেই হয় না যে দশহরার দিন মনসার দিন, মনে হয় সেদিন বুঝি গঙ্গারই দিন। যাই হোক, জ্যৈষ্ঠ বা আষাঢ় মাসে যে দিনে দশহরা হয় সেই দিনে হিন্দু গৃহস্থ পরিবারে আত্মীয় কুটুম্বের আগমন ঘটে। দই মুড়ি মুড়কি চিড়া মিষ্টি আম জাম প্রভৃতি দিয়ে 'ফলার' খাওয়া হয়। ভারি সুন্দর নিয়ম। ঘরে ঘরে যখন আত্মীয় মিলনের আনন্দ, আহারে বিহারে আনন্দ প্রকাশের নানা রীতি তখন আকাশের দিকে চোখ পাতিয়ে থাকে প্রবীন সব নারীপুরুষ। কারণ দশহরার দিন বৃষ্টি না হওয়া অমঙ্গল। দশহরার দিন বৃষ্টি হলে সাপের বিষ থাকে না। বিষধর সাপও নির্বিষ হয়ে পড়ে। এই দিন হিন্দুর ঘরে ঘরে ঢাকিরা ঢাক বাজিয়ে যায়। আর দুপুর গড়িয়ে বিকাল হতে না হতে দলে দলে নারী-

---

১। এ বছর দশহরা হয় ১লা আষাঢ়, ১৩৮৫। গুপ্তপ্রেস ডাইরেক্টরী পঞ্জিকায় লেখা আছে—ঘ ১০।৫৯।৬ সেঃ মধ্যে দশহরা। শ্রীশ্রীগঙ্গা পূজা ও শ্রীশ্রীমনসাদেবীর পূজা। দশবিধপাপক্ষয়কামনায়া গঙ্গায়াং স্নাতব্যম্। অত্র গঙ্গা স্নানে পাঠ্যমন্ত্রা—"অদত্তানামুপাদানাং হিংসা চৈবাবিধানতঃ। পরদারোপসেবা চ কায়িকং ত্রিবিধং স্মৃতম্॥ পারুষ্যমনৃতঞ্চৈব পৈশুন্যঞ্চাপি সর্বশঃ॥ অসম্বন্ধপ্রলাপশ্চ বাঙ্ময়ং স্যাচ্চতুর্বিধম্॥ পরদ্রব্যেষবভিধ্যানং মনসাঽনিষ্টচিন্তনম্। বিতথাভিনিবেশশ্চ ত্রিবিধং কর্মমানসম্॥ এতানি দশ পাপানি প্রশমং যান্তু জাহ্নবী। স্নাতস্য মম তে দেবি জলে বিষ্ণুপদোদ্ভবে॥"

২। দ্রঃ ভারতকোষ [দশহরা], বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ সং।

পুরুষ বালক-বালিকা আসে মুড়ি-মুড়কি ভিক্ষে করতে। এরা দিন-ভিখারী নয়, কিন্তু দশহরা উৎসবের অনুষঙ্গ, এদের প্রার্থনা পূরণ না করলে উৎসবের পূর্তি ঘটে না।

অযোধ্যা গ্রামের৩ দশহরা উৎসব মল্লভূমের দর্শনীয় উৎসবগুলির মধ্যে একটি। ভিহর বা পোরকুলের তুষুমেলা, এক্তেশ্বরের শিবের গাজন, বেলিয়াতোড়ের ধর্মরাজের গাজন, বাঁকুড়ার রথের মেলা, বিষ্ণুপুরের দুর্গোৎসব নিঃসন্দেহে বিখ্যাত ও বিশেষ দ্রষ্টব্য। কিন্তু অযোধ্যার বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্য তুলনাহীন। অযোধ্যার দশহরায় স্থানীয় মা মনসার পূজাবিধির বৈচিত্র্য নান্দনিক দৃষ্টিতে যেমন সুন্দর তেমনি সামাজিক দৃষ্টিতে মহামিলনের মহাকাব্য রচনা করেছে।

অযোধ্যা বাঁকুড়া জেলার কোন গণ্ডগ্রাম নয়, বর্ধিষ্ণু গ্রাম এবং ঐতিহ্যমণ্ডিত। দ্বারকেশ্বর নদ তীরবর্তী এই গ্রামটি সংস্কৃত পঠনপাঠনের জন্য—কাব্য ব্যাকরণ স্মৃতি দর্শন ন্যায় পড়ানোর জন্য বিখ্যাত ছিল। এখান থেকে বহু পুঁথি সংগৃহীত হয়ে রক্ষিত হয়েছে বিষ্ণুপুর শাখা বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ সংগ্রহশালায়। নীলচাষের আমলে কয়েকটি নীলকুঠীর অধিকারী ও নীল ব্যবসায়ী এখানের বন্দ্যোপাধ্যায় বংশ জমিদারী পত্তন করেছিলেন। সেই অতীত গৌরব এখন লুপ্ত। তবু আছে রাধাদামোদর মন্দির দ্বাদশ শিব মন্দির, বৃহৎ ঊনিশচূড়া রাসমঞ্চ, চমৎকার পঙ্খের কাজকরা দোলমঞ্চ, কারুকার্যময় পিতলের রথ, বাড়ীর মধ্যে আছে 'দামোদর বংশীবদন'। এ সবই অযোধ্যা গ্রামের নামো পাড়ায় 'দেবোত্তর' এর মধ্যে অবস্থিত। গ্রামের উপর পাড়ায় একটী পাথরের পরিত্যক্ত মন্দির আছে, [এটি রাধাকৃষ্ণ মন্দির ছিল] যার শিলালিপিতে লেখা আছে :

বসু বানাঙ্ক গেশাকে
রাধাকৃষ্ণ পদান্তিকে
মুদা রাঘবদাসেন
সৌধ মন্দিরমর্পিত ৯৬৮

কথিত আছে, সোনামুখীর সিদ্ধান্ত পাড়ার ছেলে কালাপাহাড় ধ্বংস করেন এই মন্দির। গ্রামটি মূলতঃ পাঁচটি পাড়ায় বিভক্ত– নামো পাড়া, মাঝো পাড়া,

৩। কলকাতা থেকে ট্রেনে বা বাসে রামসাগরে নেমে হেঁটে নদী পার হয়ে আসা যায়। অথবা বিষ্ণুপুর থেকে সোনামুখীগামী বাস ধরে জয়কৃষ্ণপুর স্টপে নেমে তিন মাইল হেঁটে অযোধ্যায় আসা যায়।

উপর পাড়া, কামার পাড়া, কাদোকোন্দা পাড়া। বিষ্ণুপুর-জয়কৃষ্ণপুরের পথে গ্রামের মধ্যে ঢুকতে হলে গ্রামের উত্তর প্রান্ত নামো পাড়া দিয়েই ঢুকতে হয়। এই উপর পাড়াতেই ব্রাহ্মণ বৈদ্যদের বাস বেশী। গ্রামের প্রায় সব বর্ণের হিন্দুদের বাস। সমীক্ষা অনুযায়ী ২৩ বর্ণের মানুষ এই গ্রামের অধিবাসী, কিন্তু মুসলমানদের বাস নেই।[৪] অযোধ্যা গ্রামে এখন কাঁসা শিল্পের প্রসার ঘটেছে। গ্রামের লোকসংখ্যা বর্তমানে দুই হাজার। ব্রাহ্মণ প্রধান গ্রাম, যদিও অনুন্নত হিন্দু ও তপশীল সম্প্রদায়ের অধিবাসীরা গ্রামের সর্বত্রই ছড়িয়ে আছে। অযোধ্যা গ্রাম-নাম মল্লরাজাদের দেওয়া। বিষ্ণুপুরের চারপাশে জয়পুর, জয়কৃষ্ণপুর, মোথরা [মথুরা], যাদবনগর, গোপালনগর, রাধানগর, রামসাগর প্রভৃতি গ্রাম নাম বৃন্দাবনের অনুকরণে করা হয়। অযোধ্যা গ্রামের মধ্যস্থানে মাঝো পাড়ায় মনসামাড অর্থাৎ মনসামন্দির।

আমাদের আলোচ্য মনসামাড়টির প্রতিষ্ঠা করেন রায় বাহাদুর গদাধর বন্দ্যোপাধ্যায়, আনুমানিক ১৮৫০ সালের মধ্যে। মন্দিরের সামনের আটচালাটি প্রাচীনতর। মনসামাড়টির [মনসামণ্ডপ > মনসামাড] গঠন বৈশিষ্ট্য অনেকটা দুর্গা-মণ্ডপের মতো। ত্রিখিলানযুক্ত দুই অংশ সমন্বিত গৃহ, ভিতর অংশে দেবীদের অধিষ্ঠান। গত শতাব্দীর প্রথমের দিকে ১৮১৫—৩০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে দয়ে মাছ ধরতে গিয়ে জেলেদের জালে উঠে আসে 'আসাবারি'। প্রথমে তাঁকে রাখা হয় বুড়ো ধর্মতলায়, পরে প্রতিষ্ঠা করা হয় মনসামাড়ে।

মনসামাড বা আটচালা দর্শনীয় কিছু নয়, দর্শনীয় মাড়ের মধ্যে দেবীদের অবস্থান। মন্দিরের মধ্যে একটি দেবী নয়, মনসাসহ সাত দেবী। স্থানীয় কেউ কেউ বললেন মনসার ছয় বোন। যথাক্রমে শংখ, পদ্মা, কালীবুড়ী, মনসা, বসন্তকুমারী বাসুকী ও তক্ষক।[৫] ঐ সাত দেবী ছাড়াও এখানে কালী, চণ্ডী,

৪। P.516—517, West Bengal District Gazetters BANKURA, Amiya Kumar Banerji, 1958.

৫। এই রকম সাতদেবীর নিদর্শন অন্যত্রও আছে। মেদিনীপুর জেলার সাঁকরাইল থানার অন্তর্গত বনপুরা গ্রামে। এখানে আছে 'সাত ভাউনী' [সাতভবানী, সাতবহিনী]। যথা—দুয়োগরহনি, শাখারীবুড়ী, দিয়াশাবুড়ী, কুবরিয়া বুড়ি, কেঁউদবুড়ী, গোপয়া-বুড়ী। এরা অবশ্য মনসা নন। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য বলেছেন : 'বীরভূম জেলার সর্বত্র পাঁচটি কিংবা সাতটি ঘট মনসা বলিয়া সর্বত্র পূজিত হয় এবং তাহারা পরস্পর ভগিনী বলিয়া কথিত হয়।' পৃঃ ২০৭, বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, ১৯৫৮।

শীতলা, কালভৈরব, সর্বমঙ্গলা, ধর্মরাজ ইত্যাদি। এইসব দেবদেবীর কোন মূর্তি নেই। প্রধান দেবীদেরও মূর্তি নেই, কেবল মুখ। দেবীদের সোনার চোখ নাক প্রভৃতি দেখা যাচ্ছে। দেবীদের মাথার উপর চাঁদোয়া টাঙানো আছে। আর সিমেন্টের ছাদ থেকে ঝোলানো একটি লোহার রডে ঝুলছে একটি দু-শিখাযুক্ত অনন্ত প্রদীপ।

অযোধ্যায় দশহরাকেন্দ্রিক মনসাপূজা ও উৎসব আরম্ভ হয় পনের দিন আগে থেকে। দশহরার পনের দিন আগের কোন এক মঙ্গলবারে 'গিন্নীপালন' উৎসবের মধ্য দিয়ে দশহরা উৎসবের সুরু।[৬] এখানে উৎসবের বৈচিত্র্যের সঙ্গে মনসামঙ্গল গান গাওয়ার নিত্য ব্যবস্থা আছে। দশহরার আট দিন আগে 'ঢাকে খাড়ি' হয়। ঐ দিন সকালে পূজারী গ্রামের প্রত্যেক বাড়ীতে গিয়ে ঢাকে খাড়ির সময়ে উপস্থিত থাকবার জন্য অনুরোধ করে আসেন। রাত্রি ১২/১২½ টার সময় ঢাকে খাড়ি হয়। সেদিন বিকাল থেকেই সমস্ত দেবীকে পদ্মফুল দিয়ে সাজানো হয়। মধ্যরাত্রে পূজারী আকুল আহ্বানে দেবীদের জাগান। এই সময়ে দেবীদের মাথা থেকে একটি পদ্মফুল খসে পড়ে। তখনই ঢাকে খাড়ি পড়ে। অর্থাৎ বাইরে প্রতীক্ষমান ঢাকীরা ঢাক বাজাতে সুরু করে। ঢাকে খাড়ি পড়ার পর গ্রামের উপস্থিত বিশিষ্ট অভ্যাগতদের সম্মান দেওয়া হয়। মর্যাদার স্তর অনুযায়ী মালা পরানো হয়। সাত দেবীর সাতটি মালা দেওয়া হয় সাতজনকে। প্রথমে মালা দেওয়া হয় বাবু বাখুলের [বাবু পরিবারের] একজনকে। পরেরটি গোঁসাই বাখুলের একজনকে। ঢাকে খাড়ি পড়ার পরের দিন রাত্রি থেকে 'গাজন বসা' আরম্ভ হয়। 'গাজন বসা' অর্থাৎ ভক্তা নাচ। প্রতিদিন দুবার মনসামঙ্গল গানও আরম্ভ হয়, বিকাল পাঁচটায় একবার, রাত দশটার পর আর একবার।[৭] মূল গায়কের নাম গৌরচন্দ্র পণ্ডিত [৪৩]। তিনিও মনসার পূজারী।[৮] ইনি দৌহিত্র-সূত্রে পূজারী। পণ্ডিত উপাধিধারী তিনটি পরিবার [মন্দিরের পাশেই তাঁদের ঘর] দেবীর নিত্যপূজা করেন। অদ্বৈত পণ্ডিত, শীতল পণ্ডিত, গোপাল পণ্ডিতদের পিতা ৺ভবতোষ পণ্ডিত ছিলেন মূল পূজারী। এঁরা বর্ধমান জেলায়

৬। 'গিন্নীপালন' উৎসব সম্বন্ধে আলোচনা পূর্বেই একটি স্বতন্ত্র প্রবন্ধে করা হয়েছে।

৭। দশহরার পরের দিনের গান আমরা শুনেছি। এঁরা গান 'ভাসান' গান, 'ঝাঁপান' গান নয়। বড় সুন্দর এঁদের গানের সুর ও পরিবেশন রীতি।

৮। মনসা প্রধানত মেটেদের [জেলেদের] পূজা। পণ্ডিতেরা কিভাবে পূজারী হলেন জানি না।

পণ্ডিতদের সঙ্গে আত্মীয় সূত্রে আবদ্ধ। এঁরা জাতিতে ডোম। আগে ছিলেন 'আকুড়ি', এখন উপাধি 'পণ্ডিত'। দশহরার দিন পার্শ্ববর্তী বেন্দা গ্রামের ছাতাইতরা এই পূজায় অংশ গ্রহণ করেন।

দশহরার দিন ভোর থেকে পরের দিন সকাল পর্যন্ত একের পর এক অনুষ্ঠান। এই অনুষ্ঠান-বৈচিত্র্যই আমাকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করেছিল। নিত্য জানা মানুষের মধ্যে কত যে অজানা সত্তা ও স্বরূপ আছে তাই দেখতে পেয়েছিলাম এই অনুষ্ঠানগুলিতে। কিছু লৌকিক ও অধিকাংশ অলৌকিকের সমাবেশে দশহরা উৎসব। লৌকিক ও অলৌকিকের মধ্যে ব্যবধান যে কোথায়, সীমা যে কোনখানে, জানা যায় না। ভক্তের দৃষ্টিতে এই সব অনুষ্ঠানের ব্যঞ্জনা এক, দর্শকের দৃষ্টিতে আর. এমনটি হবার বোধ হয় উপায় নেই। স্থূল দর্শককেও ভক্তে পরিণত করে অনুষ্ঠানগুলি এবং নিয়ে যায় অলৌকিকতার পরিধির মধ্যে।

দশহরার দিনরাত্রির ২৪ ঘণ্টার অনুষ্ঠান মূলতঃ দ্বাদশ ভাগে বিভক্ত: ১ ঊষায় নিত্য পূজা ও মাঙ্গলিক আরতি, ২ প্রণাম-সেবা-খাটা, ৩ ধুনা পোড়ানো, ৪ গঙ্গাপূজা, ৫ আগুন সন্ন্যাস, ৬ ফুল কাড়ানো, ৭ সই পাতানো, ৮ স্নানযাত্রা, ৯ স্নান, ১০ ঘাটে পড়া ও ঘাটে তোলা, ১১ প্রত্যাবর্তন, ১২ শুদ্ধিকরণ।[১]

অনুষ্ঠানগুলি পর পর এইভাবে সাজানো হলেও দেখা যায়, কোন কোন অনুষ্ঠানের পাশাপাশি অন্য অনুষ্ঠান আরম্ভ হয়ে গেছে। এর মধ্যে সর্ব প্রধান অনুষ্ঠান স্নানযাত্রা ও প্রত্যাবর্তন। উপরিউক্ত তালিকায় প্রথম সাতটি অনুষ্ঠান সারাদিনের অনুষ্ঠান। তার পরের চারটি অনুষ্ঠান চলে সারা রাতের মধ্যে। শেষ অনুষ্ঠানটি পরের দিন সকালের। অনুষ্ঠানগুলি প্রধানতঃ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। এক. মন্দিরকেন্দ্রিক, দুই. মন্দিরের বাইরের গ্রাম ও পাড়াকেন্দ্রিক। নিত্য পূজা নিবেদন করেন যে ডোম পণ্ডিত বংশ, তাঁদের সঙ্গে শত শত ভক্তের যোগ ঘটে এই সব অনুষ্ঠানে এবং তারই সঙ্গে গায়ক বাদক ও হাজার হাজার দর্শকের সমাবেশে এই উত্তাল আনন্দময়তা।

দশহরার দিন ভোরবেলাতেই আরম্ভ হয় ষোড়শোপচারে পূজা। দেবোত্তর পূজা। এই পূজা [মাত্র এই পূজাটিই] করেন ব্রাহ্মণ পূজারী। বছরের এই এক দিনই ব্রাহ্মণ পূজারী পূজা করার সুযোগ পান। এই একবার। ভোর থেকেই 'প্রণাম-সেবা-খাটা' আরম্ভ হয়ে যায়। দুই হাত প্রসারিত করে দণ্ডবৎ

১। জনৈক পূজারী বললেন, চাঁদ সদাগরের চম্পানগরে যে পূজাবিধি প্রথম প্রচলিত হয় এখানেও সেই সব বিধি-বিধান অনুসরণ করা হয়।

উপুড় হয়ে শুয়ে শুয়ে মন্দির পরিক্রমা করাকে কেউ কেউ 'দণ্ডীখাটা'ও বলেন। ভক্ত নারীপুরুষ স্নান সেরে আপন আপন 'মানৎ' অনুযায়ী দণ্ডীখাটে। প্রণাম-সেবা-খাটাদের ঘিরে ঢাকের বাদ্যি বাজে। ভক্তের সংখ্যা অনুযায়ী এ অনুষ্ঠান সারা সকাল ধরেই চলে।

ইতিমধ্যে 'ধুনা পোড়ানো' আরম্ভ হয়ে যায়। এ অনুষ্ঠান শুধু মেয়েদের। ভিতরে ১৫/২০ জন সিক্তবসনা মেয়েদের মাথায় বড় বড় মাটির সরা চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে বারবার। প্যাকাটি [পাটকাঠি], আখের খুয়া [ছিবড়ে], কাঠ-টুকরার উপর ধুনা ছিটিয়ে আগুন দেওয়া হচ্ছে বারবার।° 'একে মনসাপূজা তায় ধুনার গন্ধ' এই প্রবচনে ঠাট্টা আছে, কিন্তু এখানে ধুনার খুবই প্রাধান্য। চাকে খাড়ির দিন রাত্রেও ধুনায় মন্দির ভরে যায়। এখনও ধুনায় ঘর ভর্তি, অন্ধকার ঘরে দম বন্ধ হয়ে যায়। পরেও দেখবো ধুনার খুব বেশী প্রাধান্য।

পূর্বেই বলেছি, দশহরায় প্রধানতঃ গঙ্গাপূজা ও গঙ্গাস্নানের বিধি। এখানেও সেইজন্য বুঝি গঙ্গাপূজার একটি অনুষ্ঠান হয়। গ্রামের শেষ প্রান্তে অর্থাৎ দক্ষিণ প্রান্তে আছে 'দ' অর্থাৎ দহ, শুষ্ক বালুময়। প্রাচীনকালে এইখানে হয়তো নদীখাত ছিল, দ্বারকেশ্বর নদীখাতও হতে পারে। লোকবিশ্বাস, এই পথেই নাকি চাঁদ সদাগর বাণিজ্যে যেতেন। এই শুষ্ক দয়ের তীরে একস্থানে গোবরজল ছড়া দিয়ে পরিষ্কার ও পবিত্র করা হয়। তারপর ধূপধুনা চাঁদমালা দিয়ে গঙ্গার পূজা করা হয়। স্থানীয় ভট্টাচার্য ব্রাহ্মণেরা এই পূজা করেন। ভক্তারা এই সময়ে দয়ে যায়, হোম যজ্ঞ হয়। ঐ দয়ের জল তখন পরিণত হয় গঙ্গাজলে। এই ভাবেই ওখানে গঙ্গাকে আহ্বান করা হয়। ইতিমধ্যে অবশ্য ঐ দয়ের বুক খুঁড়ে প্রায় কাঠা খানেক একটি পুকুরের মতো করা হয়েছে। ঐ দয়ের 'গঙ্গাজলে' মনাসার পূজা আচার চলবে। রাত্রে মনসা সহ অন্যান্য দেবীরা ঐ দয়ে স্নান করতে আসবেন।

গঙ্গাপূজা শেষে ভক্তারা মনসামাড়ে ফিরলে 'আগুন সন্ন্যাস' আরম্ভ হয়। মাটির উপর আট দশ হাত লম্বা করে কাঠ কয়লার আগুন করা হয়, সেই জ্বলন্ত আগুনের উপর দিয়ে খালি পায়ে হাঁটতে হয়। একবার দুবার তিনবার হাঁটাহাঁটি করতে হয়। এই ধরণের অনুষ্ঠান বিকালে ও সন্ধ্যায় স্নানযাত্রার সময়ও দেখা যায়। সকালের অনুষ্ঠান করেন ভক্তারা। সন্ধ্যার অনুষ্ঠান সাধারণ মানুষ মানৎ অনুযায়ী করেন। প্রথমে আয়তাকার অগ্নিক্ষেত্রটির দুপাশে দুটি বড় গর্ত করা হয়। সেই গর্তে দেওয়া হয় জলজ 'দল'। তার উপরে কলাপাতা ও দুধ

ফেলে দেওয়া হয়। ভক্তার পা জল দিয়ে ধোয়ানোর পর ভক্তা ঐ দুধ ও জল মিশ্রিত একটি গর্তে দাঁড়ায়। তারপর জলন্ত আগুনের উপর দিয়ে হাঁটতে থাকে। একাধিক ব্যক্তি এই 'আগুন সন্ন্যাস' অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করে।

'ফুলকাড়ানো' অনুষ্ঠানটি আরম্ভ হয় দুপুরে। অনুষ্ঠানটি যেমন দর্শনীয়, তেমনি অভাবনীয়। ফুল কাড়ানো অনুষ্ঠানের মাধ্যমে দেবী মনসার অনুমতি নিতে হয়[১০]। স্নানযাত্রা উৎসবে যোগদানের অনুমতি। এই অনুমতি বা প্রত্যাদেশ নিতে হয় অযোধ্যার পাঁচ পাড়ার মানুষকেই। আলাদা আলাদাভাবে। যাঁরা ফুল-পড়া রূপ অনুমতি পান না তাঁরা লজ্জিত হন, তাঁদের নিশ্চয়ই কোন খুঁৎ হয়েছে, দোষ হয়েছে, সে বছর তাঁরা পাড়া-উৎসবে যোগ দিতে পারেন না। আমি উপর পাড়ার অধিবাসী এক বন্ধুর বাড়ী উঠেছিলাম, তাই উপর পাড়ার মানুষদের সঙ্গে ফুল কাড়ানো দেখতে গেলাম। তখন রৌদ্রঝলকিত মধ্য দুপুর। লাল বড় বড় ছাতা মাথায়, উপর পাড়ার বয়স্ক ও ছেলেরা এলেন মনসামাড়ে। তাঁদের সঙ্গে মন্দিরের মধ্যে দাঁড়ালাম ফুল কাড়ানো অর্থাৎ ফুল পড়া দেখবার জন্য। সপ্তদেবীরা একই বেদীর উপর পাশাপাশি রয়েছেন, তাঁদের মাথার উপর শতশত পদ্মফুলের রাশি সুসংবদ্ধ ভাবে সাজানো। সেই পদ্মরাশির উপর এক এক করে কয়েকটি পদ্মফুল চাপানো হল। পণ্ডিত পুরোহিত নীরবে আহ্বান করলেন। শাঁখ বাজালেন। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পূজা ও প্রণাম করলেন। তারপরে সমস্বরে উপর পাড়ার মানুষেরা চীৎকার আরম্ভ করলেন 'মা ফুল দাও' বলে। হাত জোড় করে উপর পাড়ার মানুষেরা সচীৎকারে প্রার্থনা করছেন, সংশয়ে ভক্তিতে আমারও চোখ ঝাপসা হয়ে এলো। তবু চোখ বিস্ফারিত করে রাখলাম, পলক যেন না পড়ে। ফুল পড়লো চার পাঁচ মিনিট পরে। একটি মাত্র ফুল উল্টে এসে পড়লো। অতগুলি ফুল চাপানো হলো, কিন্তু তাদের মধ্য থেকে একটি ফুলই ছিটকে এসে পড়লো। মনে হল, মা যেন ফুল ছুঁড়ে দিলেন। মা মা ধ্বনি তুলে আনন্দনৃত্য, আনন্দহাস্য। কারণ মা অনুমতি দিয়েছেন। আমিও যোগ দিলাম আনন্দনৃত্যে। এই আনন্দসম্মেলনে কখন নারীরাও এসে যোগ দিয়েছেন। সকলের কপালে সিঁদুরের ফোঁটা দেওয়া হল। তারপর নৃত্য বাদ্য জয়ধ্বনি সহকারে নিজ পাড়ার দিকে অগ্রসর হল দল। পয়সা ও বাতাসা ছড়াতে ছড়াতে দল চললো ষষ্ঠিবটতলা।

১০। ফুলপড়া রূপ অনুমতি পাওয়ার ব্যাপারটি অন্য দেবতার ক্ষেত্রেও দেখা যায়। বঙ্কিমচন্দ্রের 'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসে এই রকম একটি ঘটনার তাৎপর্য সুগভীর হয়ে দেখা দিয়েছে।

সই পাতানো অনুষ্ঠানটিকে এখানে বলে 'সই সয়লা'। সই সয়লা অনুষ্ঠানটি দশহরা উৎসবের মধ্যে এক নবতর বৈচিত্র্য এনেছে। মেয়েরা মেয়েদের সঙ্গে পাতায় সই, ছেলেদের সঙ্গে পাতায় 'সয়া' বা 'সয়লা'। অনুষ্ঠানটি হয় বিকালে। এ অনুষ্ঠানটিও লৌকিকে অলৌকিকে মেশা। স্বয়ং দেবী সই পাতাতে যান পাশের গ্রামে। গ্রামের নাম বিড়রা। এ সম্বন্ধে কিম্বদন্তী আছে। এক তিলির মেয়ে[১১] সাধ করেছিল যে মা মনসার সঙ্গে সই পাতালে বেশ হয়। অন্তর্যামিনী মনসা বৃদ্ধার ছদ্মবেশে তার সঙ্গে সই পাতাতে যান। এরই স্মৃতিতে প্রতি বছর দশহরার দিন ঐ গাঁয়ে সই পাতাতে যান। অবশ্য স্বয়ং মনসা যান না, যান 'আসাবারি'।

এক দেবী যখন সই পাতাতে চলে গেছেন, তখন মনসামাড়ের সামনে ও আশে পাশে দৃষ্টি দেওয়ার সময় হল। দেখলাম, নাটমন্দিরের সামনে প্রশস্ত রাস্তার উপর ৪০/৫০ জন 'ভক্তা' লাইন দিয়ে ঢাকের তালে তালে নাচছে। তাদের বাম হাত মাথায় তোলা, ডান হাতে অপর ভক্তার কোমর জড়িয়ে ধরা। ভক্তাদের খালি গা, গলায় সোলার মালা, কোমরে নতুন গামছা জড়ানো। সারা মেলা জুড়ে এমন ভক্তার মেলা তিন চারশ। ভক্তারা দু-শ্রেণীর। এক. সাধারণ ভক্তা ও দুই. 'শেরের ভক্তা' অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ ভক্তা। গিন্নীপালনের দিন থেকে মন্দিরে ভক্তাদের নিত্য সমাবেশ হতে থাকে। দেখলাম কোন কোন ভক্তার 'ভর' হচ্ছে।

এই ভর হওয়া ব্যাপারটি লক্ষণীয়। ধরুন, রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে একজন মানুষ। সুস্থ সবল। তার চারপাশে অন্যান্যরা ঘোরাফেরা করছে। লোকটি স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে আছে, মনসামন্দিরের ভিতরে দেবীদের দিকে। প্রায় ৫০ গজ দূরত্ব। লোকটির দৃষ্টি স্থির। তার চোখ ধীরে ধীরে বিস্ফারিত হচ্ছে। শরীর অনড় ঋজু হয়ে উঠছে। তারপর লোকটি হাই তুলতে থাকে, গা ভাঙতে থাকে। এই ভাবেই আচ্ছন্নের মতো কোমরের গামছাখানি খুব আঁট করে বাঁধতে থাকে। তার চোখ জ্বলজ্বল করছে। যেন পলকহীন সর্পচক্ষু। হাতে পায়ে মৃদু কাঁপন এসেছে এতক্ষণে। তারপর সাপ যেমন ফণা তুলে দুলতে থাকে তেমনি দুলতে থাকে কালো কষ্টিপাথরের মতো লোকটি। অবশেষে মাটিতে পড়ে যায়, আছড়াতে থাকে, আছাড়ি পিছাড়ি করতে থাকে মাটির উপর।

১১। মতান্তরে গোঁসাইদের মেয়ে।

সঙ্গের লোকেরা তাকে ধরে থাকে, কিন্তু ধরে রাখতে পারে না। ভক্তার ভর হয়েছে। ভক্তা তখন দাঁতে দাঁত চেপে সাপের মতো ফোঁস ফোঁস হিস্ হিস্ করছে। অকস্মাৎ লোকটি ছুটে যায় মন্দিরে। সেখানে বড় বড় ধুনাচিতে ধোঁয়া উঠছে গলগল। লোকটি তার উপর উপুড় হয়ে মুখ ব্যাদন করে হাক্ হাক্ শব্দে গিলতে থাকে ধোঁয়া। এই ধুনা ও এমন করে ধোঁয়া খাওয়া কেন বুঝলাম না। প্রায় সব ভর হওয়া ভক্তাই এমনি করে ধুনা খেতে ছুটছে এবং ছুটে বেরিয়ে আসছে।

এর মধ্যে দু'এক জন 'শেরের ভক্তা' প্রশ্নকারীদের প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেন, বিধান দিতে পারেন কোন সমস্যা সমাধানের। নিদর্শন দেখলাম ওপাশের 'বুড়ো ধর্মতলা'য়। এখানের আশুথতলায় এক ভক্তার ভর হয়েছে। ভক্তার নাম কমল মেটে। তাঁকে প্রশ্ন করছেন হেনা ব্যানার্জী (বাঁকুড়া শহরের মেয়ে, শ্বশুরবাড়ী অযোধ্যায়)—তাঁর মেয়ের এ বছরের পরীক্ষায় অনার্স থাকবে কি না? পূর্বে মেয়ের হায়ার সেকেণ্ডারি পরীক্ষায় পাস সম্বন্ধে এই রকম প্রশ্ন করে সঠিক উত্তর পেয়েছিলেন হেনা দেবী। ভক্তার ভরমুখীন প্রশ্ন-উত্তরের ব্যাপারটিকে বলে 'মুদা ভাঙানো'। মুদা ভাঙাতে হয় মুদ্রা দিয়ে। পাঁচ সিকা, একুশ সিকা, য'র যেমন সাধ্য দিয়ে মানৎ করতে হয়।

সন্ধ্যা সমাগত। সই পাতিয়ে দেবী 'আসাবাবি' ফিরে এলেন। মনসা-মাড়ের খোলা দুয়ারগুলি অনেকক্ষণ কাপড় দিয়ে ঘিরে দেওয়া হয়েছে। ভিতরে লোকদৃষ্টির আড়ালে মায়েদের অঙ্গরাগ হচ্ছে। তেল মাখানো হচ্ছে। তেল, সিঁদুর, মেথি, আমলা, হলদে কাপড় অঙ্গরাগের উপকরণ। স্নানযাত্রার অর্থাৎ দেবীদের স্নানে যাবার পূর্ব প্রস্তুতি। কাপড়ের ঘের খুলে নেবার পর দেখলাম মাকে টাটকা পদ্মফুল ও মালা দিয়ে সাজানো হয়েছে। সবার উপর ঝুলছে কলকে ফুলের মালা।

এবার আরম্ভ হবে 'স্নানযাত্রা', আসল অনুষ্ঠান, প্রধান উৎসব। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। শুধু মা মনসা নয়, সব মায়েরা ও অন্যান্য দেবীরা স্নানে বার হবেন। ভক্তারা মায়েদের মাথায় করে নেবে বলে গামছা দিয়ে বিঁড়ে প্রস্তুত করছে। মনসার স্বপ্নাদেশ-আদিষ্ট ভিক্ষাছেলের বাড়ী থেকে ফলমূল মিষ্টান্ন এলো। বিখ্যাত বাঁড়ুজ্যে বংশের (মহাদেব বন্দোপাধ্যায়ের বংশের) কোন ছেলেকে মনসা ভিক্ষা ছেলে রূপে গ্রহণ করেন। সেই ছেলের উপবীত ধারণের পর তাকে কাপড় ঢাকা দিয়ে নিয়ে আসা হয় মনসামাড়ে। এই ভাবে ছেলেটির প্রথম মুখ-

দর্শন করেন মা মনসা। এরাই স্নানযাত্রার আগে মনসাকে ফলমূল মিষ্টান্ন দিয়ে যায় রীতিসম্মত ভাবে।

মন্দিরের ভিতর এখন আরতি হচ্ছে। মায়ের স্নানে বার হবার আগে আর একটি অনুষ্ঠান আছে। তাকে বলে 'ছোটাবারি'। ছোটাবারি অর্থাৎ মন্দিরের মধ্যকার দ্বিতীয় ও তৃতীয় সিঁড়িতে সাজানো ছোট ছোট মনসার বারিঘট মাথায় নিয়ে ভক্তারা দয়ের দিকে ছুটে যাবে এবং জল ভরে নিয়ে ছুটে আসবে। ইতি-মধ্যে সমবেত ভক্ত নারী ও পুরুষেরা কাঁদতে আরম্ভ করেছে। মাকে মন্দির শূন্য করে বার করে নিয়ে যাওয়া হবে, তাই কান্না। মনসাকে মাথায় নেবে সুবল ছাতাইত। পুরুষানুক্রমে এই ছাতাইত বংশের মানুষেরাই মাকে মাথায় নেবার অধিকারী। সুবল ছাতাইত লম্বা চওড়া জোয়ান পুরুষ। তার ভর হয়েছে। তার চোখ লাল, গলায় মালা, কোমরে নতুন গামছা বাঁধা। কাঁপছে সে। মাটিতে পড়ে গেল অবশেষে।

মন্দিরের ভিতর থেকে ছোট ছোট ঘট মাথায় নিয়ে মন্দির থেকে বেরিয়ে এসে রাস্তার ধারে কাদোকোন্দা পাড়ার দিকে অর্থাৎ দয়ের দিকে ছুটে গেল কজন। দেবীরা বার হচ্ছেন ভক্তাদের মাথায় চড়ে। প্রথমে কালীবুড়ী, সর্ব্বশেষে আসাবারি। এর মধ্যে আরও ছোটাবারি ছুটে গেছে। বেদী থেকে দেবীদের তুলে নিয়ে আসার সময় সাধারণ মানুষ ও ভক্তাদের মধ্যে কাড়াকাড়ি চলে। ভক্তারা মুহূর্ত্তের জন্যও মাকে ছেড়ে থাকতে রাজি নয়। কাড়াকাড়ির মধ্যে একদল মাকে কিছুতেই বাইরে যেতে দিতে চায় না, অন্যদল সাগ্রহে মাকে নিয়ে আসতে চায়। মা যে যাবেন পাড়ায় পাড়ায় ঘরে ঘরে। তাই আগ্রহ।

সমস্ত মেলা কাঁপানো মাইক থেমে গেছে, বিপুল বাদ্যিবাজনাও থেমে গেছে। শুধু একটি ঢাক বাজছে, একটি কাঠি দিয়ে বাজানো হচ্ছে। মন্দিরের মধ্যকার তিনটি সিঁড়িই ফাঁকা। সব দেবী ও বারিঘট ভক্তাদের মাথায়। প্রধান সাতটি দেবীর সঙ্গে অন্যান্য দেবী ও অনেক ঘট। শেষ দেবী আসাবারি বার হবার সময় দেখি 'ছোটাবারি' নিয়ে যারা ছুটে গিয়েছিল তারা ছুটতে ছুটতে ফিরে আসছে। প্রায় পৌনে এক মাইল পথ, ছুটে গেছে এবং ঘট ডুবিয়ে নিয়েই ছুটে এসেছে। সময় লেগেছে ১৪/১৫ মিনিট। ভক্তারা সারাদিন উপবাস করে আছে তবু কোথাও ক্লান্তির চিহ্নমাত্র নেই। তাদের ছুটন্ত মুখে হিস্ হিস্ শব্দ। শূন্য বেদীতে কিছু বারিঘট ফিরে এসে রাখা হল।

পদ্মপুষ্পে সজ্জিত ঘট মাথায় নিয়ে অর্থাৎ দেবীদের সঙ্গে প্রায় শতাধিক ঘট

মাথায় নিয়ে সবাই যখন দাঁড়ালো তখন বাইরে রাস্তায় বড় অপরূপ দৃশ্য হল। বড় বড় বারিঘটে সাজানো হয়েছে মনসাসিজ পাতা ও পদ্মফুল, আর দেবীরা সেজেছেন শুধু পদ্মফুলে। বৈদ্যুতিক আলোয় রাস্তাঘাট আলোময়। এই যে দেবীরা স্নানে যাবার জন্য পথে নামলেন রাত্রি আটটার সময়, এই পৌনে এক মাইল পথ যেতে আসতে তাঁদের সারারাত সময় লাগবে। তাঁরা মন্দিরে ফিরবেন পরের দিন সকাল বেলা। তখন বেলা ৯/১০ টা।

স্থানীয় অধিবাসী আমার বন্ধু বললেন 'এই পরব আরম্ভ হল, আসল পরব'। চারিদিকে আলোয় আলো। ১০/১২ হাজার আনন্দিত নরনারী। দেবীদের মাথায় নিয়ে, বারিঘট মাথায় নিয়ে যে ভক্তরা চলেছেন তাঁরা ইংরেজী U অক্ষরের মতো সার নিয়ে চলেছেন। চলেছেন নয়, নাচছেন! মাথায় ঘট নিয়ে ধীর তালে নাচছেন যেন সাপ ফণা তুলে মৃদু দোলে দুলছেন। এই ভাবে মৃদু নাচতে নাচতে অগ্রসর হচ্ছেন স্নানযাত্রার যাত্রীরা। এবার বাজছে নানা ধরণের বাজি বাজনা, দলে দলে সংকীর্তনের দলও আছে। আকাশে আকাশে বারুদ বাজি চলছে। বড় মনোরম বড় হৃদয়গ্রাহী সব কিছু। স্নান যাত্রার গান গাইছে একটি দল—

মা তুই নাইতে যাবি গো
ক্ষীরাই নদীর কূল,
হাতে তুব লাল জবা
চরণে তুব ফুল।

মাঝো পাড়া ছাড়িয়ে, উপর পাড়া হয়ে, কামার পাড়া ছুঁয়ে, কাদোকোন্দা পাড়ার শেষ পর্যন্ত প্রশেসন চলবে। পাড়ায় পাড়ায় দেবীদের অভ্যর্থনা জানাবার জন্য প্রস্তুত নরনারী ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আরতি হবে, পূজা হবে, থরে থরে প্রসাদ সাজানো হয়েছে রাস্তার ধারে। সরায় আগুন জ্বালিয়ে ধুনা পুড়ানো হচ্ছে। খয়রা, মেঝে, বাগদীদের মেয়েরাও দেবী সম্বর্ধনার জন্য হাতে হলুদ জলের পাত্র নিয়ে ও জলন্ত প্রদীপ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

মাঝে মাঝে আগুন সন্ন্যাসও হচ্ছে! পিচ রাস্তার উপর দু'সার ঘুঁটে সাজিয়ে তাতে কেরোসিন ঢেলে আগুন জ্বালিয়ে গনগনে আগুন করা হল। এক ব্যক্তি তার বালক পুত্রকে কোলে নিয়ে খালি পায়ে এই আগুনের উপর দিয়ে হাঁটাহাঁটি করলো। তার কি মানৎ আছে কে জানে! দেবীকে শ্রদ্ধাভরে

প্রণাম করে এ রকম দৈহিক পীড়ন হাসি মুখে সহ্য করতে দেখে বিস্মিত হলাম। প্রশ্ন জাগলো মনে।

যাত্রায় বেরিয়ে দেবীরা প্রথমে এলেন ধর্মঠাকুরের কাছে। এখানে হলুদ জল দিয়ে পা ধুইয়ে দেওয়া হল। সেখান থেকে লক্ষ্মীজনার্দন মন্দির। এটিকে 'গোঁসাই দুয়ার' বলে। ইতিমধ্যে মেটে পাড়ার 'কুদর ভৈরব' এলেন তাঁর ভক্তার (মেথু বাগ্দী) মাথায় চড়ে। বড় চঞ্চল, বড় ছটফটে এই দেবতা। মনসার স্নান পর্যন্ত তিনি মায়ের সঙ্গে অর্থাৎ মনসার সঙ্গে থাকেন। মনসার স্নান শেষ হলে তিনি দ্রুত চলে যান নিজের জায়গায়। তারপর উত্তর পাড়ায় কালী মেলায় আবার হল আগুন সন্ন্যাস। কামার পাড়ায় স্নান যাত্রার দল থেকে 'আসাবারি'কে আহ্বান করে নিজের বাড়ী নিয়ে গেলেন রীতি অনুসারে বিমল কর্মকার। তাঁর বাড়ীর পূজা আরতি শেষে 'আসাবারি' যথাস্থানে ফিরে এলেন। এরপর ভৈরব তলা। সেখান থেকে গোপাল কর্মকারের বাড়ী। অবশেষে দয়ের কিনারে পৌঁছে যায় স্নানযাত্রার প্রশেসন।

এই পথটুকু পার হতেই রাত্রির দ্বিতীয় প্রহর প্রায় শেষ হতে চললো। দয়ের অদূরে U আকার ভেঙ্গে ভক্তার দল সমবেত হল। শুষ্ক বিস্তৃত নদীগর্ভের যেখানে সদ্য খনিত দহ করা হয়েছে, তার চারপাশে উৎসুক দর্শক, নারী ও পুরুষ। এখানে আলো নেই, সামান্যতম আলো জ্বালাও সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। দেবীরা স্নান করবেন অন্ধকারে। আমিও বালুর উপর হাঁটু মুড়ে বসলাম জলের কিনারে, আমাকেও দেখতে হবে স্নানবিধি।

বালি তুলে কাটা খাদের[১২] অদূরে সমবেত ভক্তাদের মধ্য থেকে একজন দুজন তিনজন করে আসতে লাগলো। প্রত্যেককে ধরে আছে দু তিনজন লোক। মুখে হিস হিস্ শব্দ করতে করতে মাথায় দেবীকে নিয়ে বা ঘট নিয়ে ভক্তারা ডুবছে উঠছে। তিনবার করে ডুবছে উঠছে। সঙ্গে সঙ্গে তাদের আচ্ছন্ন দেহ ধরে ডাঙ্গায় তুলে দিচ্ছে অন্য কয়েকজন। মাথায় দেবীঘট বা বারিঘট নিয়ে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ার দৃশ্য অন্ধকারে দেখাচ্ছিল যেন ফণাধারী সাপ স্নান করছে মাথা নামিয়ে নামিয়ে। দ্রুত স্নান করলেও সকলের স্নান করতে সময় লাগলো প্রায় এক ঘণ্টা।

এবার আরম্ভ হল 'ঘাটে পড়া' ও 'ঘাটে ওঠা'। সকলে স্নান করে ফেরার

১২ প্রত্যেক বছরই যে খাদ কেটে জল বার করার ব্যবস্থা করতে হয় তা নয়। জ্যৈষ্ঠ মাসে প্রচুর বর্ষণ হলে কোন কোন বছর দয়ে স্বাভাবিক জল থাকে।

পথে বাধা পেল। দয়ের পাড়ের উপর রাস্তার মুখে পরপর অনেক মানুষ শবের মতো উপুড় হয়ে শুয়ে আছে। এরা সবাই মা মনসার দয়া প্রার্থনা করছে। একেই বলে 'ঘাটে পড়া'। ঐ দয়ের ঘাটের কাছে চারটি বাঁশের খুটি পুতে বনফুলমালা দিয়ে সাজিয়ে একটি স্থান নির্দ্দিষ্ট করা থাকে। একেই ঘাটে পড়ার জায়গা বলে। স্নান শেষ হলে ধুনা জ্বালানো হয়। দুটি কাঠের পাটার উপর ধুনার থলা থাকে। একটিতে তিনটি, অন্যটিতে দুটি। এই পাটা দুটি দুজন মেয়ে ভক্তা মাথায় নিয়ে চলে যায় মায়ের মন্দিরে অর্থাৎ মনসামাড়ে। মনসা-মাড়ে ঐ ধুনাথলা পেঁৗছোলে এখানে দয়ের ধারে শুরু হয় "ঘাটে তোলা", অর্থাৎ প্রার্থীদের মনস্কামনা সম্পর্কে মায়ের আদেশ পেয়ে উঠে যায় এক এক করে।

সিক্ত বসনে আচ্ছাদিত শবের মতো শুয়ে থাকা এক একজনের কাছ থেকে প্রশ্ন শুনে নেয় এক ব্যক্তি। শেরের ভক্তাকে, যাঁর মাথায় মনসা, সেই প্রশ্ন বা প্রার্থনা কানে কানে বলা হয়। তিনি উত্তর বলে দিচ্ছেন এক এক করে। মধ্যস্থ লোকটি সেই উত্তর প্রশ্নকর্তা বা প্রশ্নকারিণীকে বলে দিচ্ছেন। উত্তর পেয়ে তিনি উঠে যাচ্ছেন। ২০/২৫ জনের প্রশ্ন উত্তর শেষ হতে কত সময় লাগবে জানি না। ক্লান্ত ক্ষুধার্ত আমি বন্ধুর বাড়ী ফিরলাম। তখন মধ্যরাত।

ঘুম ভেঙ্গে গেল বোম বারুদের শব্দে। তখন রাত তিনটে। বাইরে বেরিয়ে এলাম। হাউই, চরকি, ভুঁইচম্পা, আসমান গোলা, বোম্, বাতিগাছ, বিজলী বোম প্রভৃতির আলোর লীলা ও শব্দের সমারোহ আমাকে ঘর থেকে পথে টেনে নিয়ে গেল। তখনও ৮/১০ হাজার নরনারী U আকারে সাজানো ভক্তাদের সারির আগে পিছে নেচে গেয়ে চলেছে। দেবী এসেছেন পাড়ায়, দেবী চলেছেন দুয়ারে দুয়ারে স্পর্শ দিয়ে, এমন রাতে কে ঘুমিয়ে কাটাবে!

বুকের মধ্যে প্রশ্ন জাগলো—একি শুধুই উৎসব? তবে আমার মতো আগন্তুক অভাজনের চোখেও বার বার জল আসছে কেন? কেন মনে হচ্ছে দুঃখ দারিদ্র্য মিথ্যা, মিথ্যা মানুষে মানুষে জাতি ও বর্ণে ভেদ। সবাই আনন্দ করছে, সবাই খুশী, সবার মুখেই হাসি। যখন অযোধ্যা গ্রামে এসেছিলাম তিন দিন আগে, একজন গ্রামবাসী পরিচয় দিয়েছিলেন—'এটি হাসির গ্রাম, দুঃখ আছে দৈন্য আছে কিন্তু গ্রামের মানুষ হাসতে জানে'। কথাটি সত্য, সহজ সত্য। রাতের পথে আনন্দিত ভক্তিমতি একজন বলছেন—'বেঁচে থাকি তো সামনের বছর দেখতে পাবো।' পূবের আকাশে মেঘের গায়ে গায়ে উষার আলো জাগছে।

কাঁধের ক্যামেরা ও টেপ রেকর্ডার সামনে মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করলাম এই আনন্দ উৎসারণের দেবীকে, এই মহামিলনের দেবীকে, এই জাগ্রত অবিস্মরণীয় রাত্রির অধীশ্বরীকে। দেবীরা মন্দিরে ফিরলে পূজা আরতির মধ্য দিয়েই হয় 'শুদ্ধিকরণ' অনুষ্ঠান। আনন্দের মধ্যে, সর্বমিলনের মধ্যেই তো নিখিল মানবমনের শুদ্ধি! অযোধ্যায় মনসা শুধু আনন্দের দেবী নন, তিনি শুদ্ধিরও দেবী।**

** ১৩৮৩ সালের ২৩/২৪/২৫ জ্যৈষ্ঠ এবং ১৩৮৫ সালের ১লা ও ২০শে আষাঢ় অযোধ্যায় গিয়ে সমীক্ষা করা হয় দশহরা উৎসব সম্বন্ধে। বাঁকুড়া জেলার সর্বত্রই মনসাপূজার বিশেষ প্রচলন। একটি স্থানের মনসা পূজাবিধির খুটিনাটি যতটা সম্ভব তুলে ধরা হল।

৭

মল্লরাজধানার ঝাঁপান

১.

সাপ বড় সুখী। নোংরায় থাকে না। একটা মশা সহ্য করতে পারে না, গর্তে একটা পিপড়ে থাকলে বেরিয়ে আসে। সাপের গা ঠাণ্ডা*। শীতকালে সাপকে বড় শীত পায়, তাই গরম খোঁজে। গরম কালে মানুষেরই মত হাওয়া খেতে বার হয়। পুরুষ সাপের বিষ থাকে না, মেয়ে সাপেরই বিষ। সাপিনীরাই বিষধরী। পুরুষ সাপ হচ্ছে ঢ্যামনা, ঢোঁড়া প্রভৃতি। খরিস বা গোখুরা সাপের সঙ্গে ঐ সব পুরুষ সাপের সঙ্গম দৃশ্যকে বলে 'শংখ লাগা'।[১] বিষ-সাপের বাচ্চার অর্থাৎ 'ডেকা বাচ্চা'র বিষ মারাত্মক। সাপ জন্মের দু'তিন দিন পরেই তার মুখে বিষ জন্মাতে পারে। বোড়া সাপের ডিম হয় না, একেবারে বাচ্চা হয়। একবারে একশোটা বাচ্চাও হয়। সাপের মুখের ভিতরে দুপাশে দুটি বিষের থলি থাকে। দেখতে অনেকটা রসুন কোয়ার মতো। ঐ দুটি থলি ছুরি দিয়ে কেটে ফেলে দেওয়া হয়। তাকেই বলে 'সাপের বিষ দাঁত' ভেঙে দেওয়া। প্রকৃতপক্ষে দাঁত ভাঙা হয় না। দাঁত ভাঙলে সাপ খাবে কি করে, আহার ধরবে কি করে! জীব চেরা হলেও চকচক করে দুধ খায়। কলা ঠিক খেতে পারে না। তবে 'কলাপাকা'র অংশ দাঁতে কেটে নিতে পারে। বিষথলি কেটে দেওয়ার পরেও সাপের মুখে বিষ হয়, বিষশিরার কাজ ঠিক চলতে থাকে, তবে থলির অভাবে সে বিষ জমতে পায় না। সাপের বিষ আমরা বিক্রী করি না, মা বিষহরির দ্রব্য নিয়ে আমরা ব্যবসা করি না। আমরা ব্যবসায়ী নই, আমরা মায়ের ভক্ত। সাপ ধরার কোন মন্ত্র নাই। সাপ ধরা সবই করণকৌশলের

উপর নির্ভর করে। সাপের চোখে চোখ রেখে গতিবিধি লক্ষ্য করতে হয়। ঝপ্ করে লেজটা ধরে শূন্যে তুলে নাড়া দিতে হয়, তাতেই সাপ জব্দ। সাপের বিষ নামানো মন্ত্র আছে বইকি, একটি মন্ত্র শুনুন, ঝাঁপানের সময় 'চোট' লাগলে এই মন্ত্র বলতে হয়—

হেড দলদল উপর আসমান
মুই মারি বিষ খোদা প্রমাণ।
খোদা গুরু মহম্মদ শিষ
মারো ধাক্কায় নাই বিষ।
কার আজ্ঞায়? মা মনসাদেবীর আজ্ঞায়॥[১]

এ সব মন্ত্র অন্য লোককে বলতে নেই। আরও মন্ত্র আছে—'বিষবন্ধন' মন্ত্র। সাপে কাটলে কাটার আশপাশ হাত দিয়ে দেখতে হয় ঠাণ্ডা কি না। যতদূর ঠাণ্ডা ও কালচে, ততদূর বিষ উঠেছে। তার উপর 'বন্ধন' দিতে হয়। কোন দড়া দড়ি দিয়ে বাঁধা নয়। মন্ত্রপূত 'জলপড়া' দিয়ে বন্ধন দিতে হয়। তারপর বিষ নামানোর মন্ত্র পড়তে হয়, ফুঁ দিতে হয়। বিষ নামে। প্রায় মরা মানুষও বাঁচে। সবই গুরুর কৃপা, মা বিষহরির অনুগ্রহ। গৌরাঙ্গ সার, কৃষ্ণ সার, কালীবীজ, অষ্টাঙ্গ সার প্রভৃতি মন্ত্রও আছে। রোগীর চরম অবস্থায় এই সব মন্ত্র ব্যবহার করা হয়। কোন 'বিষপাথর' আমরা ব্যবহার করি না। অবশ্য বিশেষ প্রয়োজন হলে গাছগাছড়ার ব্যবহার হয়। তবে মন্ত্রই সব। মুখ দিয়ে চুষে বিষ তোলার রীতিও আছে। দুবারের বেশী মুখে করে বিষ টানা যায় না। খুব সংকট হলে তিনবার টানতে হয়। যে মুখে করে বিষ টানে তার সারা অঙ্গে জ্বালা ধরে যায়। সব সময় খেয়াল রাখতে হবে যাকে সাপে কেটেছে তার পেটের দিকে বিষ যেন এগিয়ে না যায়। ঐ 'জলপড়া', ঘরের 'সাপকাটি'তে যেমন লাগে তেমনি ঝাঁপানে অসাবধান সাপকাটিতেও লাগে। আসমানের জল ধরে রাখতে হয়। ঐ জল ও ধান দুর্বা একটি ঘটিতে রেখে মন্ত্র পড়া হয়। সে জল যত্ন করে রক্ষা করা হয়। বিষ নামাতে 'জলপড়া', ছাড়া 'মাটিপড়া'ও ব্যবহার করা হয়। আর, সব মন্ত্রই ব্যবহার করা যায় না। আমাদের খাতায় এমন কিছু মন্ত্র আছে, যা পূর্বপুরুষ গুণীনরা ব্যবহার করতেন, আমরা ব্যবহার করি না। পূর্বপুরুষের

১ কিম্বদন্তী অনুযায়ী ছদ্মবেশিনী বৃদ্ধা মনসার কাছ থেকে যিনি বিষমন্ত্রের পুঁথি পেয়েছিলেন তিনি পড়তে জানতেন না। দেবীর কৃপায় তিনি পুঁথি দেখে যা বলতেন তাই হত মন্ত্র। তাই বিষমন্ত্র মূলতঃ অর্থহীন শব্দ সমষ্টি।

নিষেধ আছে। আমাদের মেয়েরাও বিষবিদ্যা শেখে। আমাদের বংশে কুড়ানি দেবী মস্ত গুণীন ছিলেন। এখন এই মেয়েটি বিষবিদ্যা শিখছে।

এই সব সর্পকথা শুনেছিলাম বিষ্ণুপুরের শাঁখারি বাজারের কালীমাড়ে বসে। বক্তা চণ্ডীচরণ নন্দী। আমার সামনে বসে আছে কুমারী মালা নন্দী, ১৩/১৪ বছর বয়স, ভারি সুশ্রী ও শান্ত, উজ্জ্বল সুন্দর চোখ মুখ। এই মেয়েটিই গত বছর রাজবাড়ীর ঝাঁপানে 'মাচানে' উঠে সাপের খেলা দেখিয়েছিল। মালা নন্দীর পিতার নাম শশধর নন্দী। এ পাড়ার বিখ্যাত গুণীন অকলঙ্ক নন্দী। তাঁর শিষ্য শিষ্যা অনেক। ঝাঁপানে গুরুর সঙ্গে অংশ গ্রহণ করার জন্য দূর দূরান্তর থেকে অনেকেই এসেছেন। এসেছেন কালী বাগীশ ও তাঁর কন্যা। এঁরাও বড় নামকরা গুণীন। কন্যা যুবতী, নাকি এ বছর ঝাঁপানে নামবে। গত বছর মালা নন্দীর কানের লতিতে, নাকে, ঠোঁটে, হাতের আঙুলে মোট আটটি সাপ কামড়ে ধরে ঝুলেছিল। সে এক অপূর্ব দৃশ্য!

কালীমাড়ের একপাশে মনসার অবস্থান। কারণ আদি 'মনসা মাড' নষ্ট হয়ে গেছে। মনসা অর্থাৎ কোন মূর্তি নয়, রয়েছে বাঁকুড়া-পাঁচমুড়ার বিখ্যাত মৃৎশিল্পের নিদর্শন মনসার 'চালি', মনসার 'বারি', হাতি ঘোড়া— ছোট ও বড়, সংখ্যায় অনেকগুলি। শ্রাবণ সংক্রান্তির সকাল থেকেই বিভিন্ন অনুষ্ঠান এই মনসামাড়ে। প্রথমে 'খইধারা'। শ্রাবণ মাসের শেষের দিকে মাঠের কাজ শেষ হয়েছে. তাই এই পরব। এ বছর হয়েছে বাইশে শ্রাবণ মঙ্গলবার। ঐ দিন নতুন হাঁড়ি-কড়ায় রান্না হয়েছে. ভাজা পোড়া নিরামিষ খাওয়ার রীতি, 'ফলারে'র নিয়ম। তারপর 'বার পালন' অথবা 'বার কামানো'। ঐদিন সংক্রান্তির আগের দিন। দাড়ি কামিয়ে, নখ ফেলে, স্নান করে শুদ্ধ হতে হয়, 'উপাস' (উপবাস) করতে হয়। তারপর 'মাথ্‌লো' অর্থাৎ 'মাথল্ দিন'। শ্রাবণ মাসের সংক্রান্তির দিন 'মাথল্যে'। মাথল্ অর্থাৎ খলরূপিণী মায়ের পূজার দিন, মনসা খলরূপিণী। ভিন্ন মতও আছে। মাথল্ অর্থাৎ মা-ক্ষণ, মায়ের ক্ষণ, মায়ের সময়, মায়ের দিন। মা মনসার দিন, শ্রাবণ সংক্রান্তির দিন সকাল থেকে নানা আচার অনুষ্ঠান। সকাল থেকে মায়ের পূজা আরম্ভ হয়। পূজা হয় দুধ চিড়া ফল মিষ্টান্ন দিয়ে। পাড়া পড়শী সবাই পূজো দেন এই মনসামাড়ে। এখানে শাঁখারি বাজারে এখন বিকালে (বৃহস্পতিবার, ১৩৮৫) 'ষোল আনা'র পূজা হচ্ছে। পূজা করছেন পুরোহিত বংশী চক্রবর্তী। ষোল আনার পূজার শেষে

প্রধান গুণীন অকলঙ্ক নন্দী (৭০/৭২ বছর বয়স) শিষ্যদের নিয়ে মায়ের মাড়ে[৩] বসে মা মনসাকে সাপ খেলা দেখাচ্ছেন। তিনিই আবার মনসার গান করছেন, বন্দনা গান। শিষ্যদের হাতে হাতে 'বিষম ঢাকি'[৪] বাজছে। যেন গোপনে মায়ের সামনে তাঁরা প্রস্তুত হচ্ছেন, আশীর্বাদ প্রাপ্তির অপেক্ষা করছেন। কাল থেকে এঁরা সব উপবাস করে আছেন। উপবাস ভঙ্গ করে স্নান খাওয়া সেরে ঝাঁপান যাত্রার জন্য প্রস্তুত হবেন। শেষ বিকালে তাঁরা যাবেন বিষ্ণুপুর 'রাজবাড়ী', মল্লরাজাদের বর্তমান বংশধরের সামনে ঝাঁপান হবে। শান্ত ভক্তিস্থির কণ্ঠে মৃদুস্বরে গান চলছে—মায়ের বন্দনার গান—

একটি ফুলের লেগে এত অভিমান গো।
দুয়ারে বসিয়ে দুবো ফুলেরি বাগান গো॥
মাগো, নম নম নমো মাগো নমো নারায়ণী। (ধুয়া)
কি দিয়ে পূজিব মাকে মনে ভাবি তাই গো।
স্বর্গে পূজে দেবলোক, পাতালে পূজে বলি গো॥
মাগো, নম নম নমো মাগো নমো নারায়ণী॥
মাগো দুগ্ধ দিয়ে পূজবো কিগো বাছুরে আগে খায়।
পুষ্প দিয়ে পূজবো কিগো ভ্রমরে মধু খায়॥
নম নম নমো মাগো নমো নারায়ণী।

এক একটি সাপের 'পেঁড়ি' অর্থাৎ ঝাঁপি খুলে মনসাকে দেখানো হচ্ছে। অকলঙ্ক নন্দী—প্রধান গুণীনের গানের সঙ্গে ধুয়া দিচ্ছে অন্য সকলে, সমবেত কণ্ঠে। যে কটি সাপ দেখানো হল, সবই খরিস গোখুরা। ৮/১০টি সাপ। সাপগুলি বলিষ্ঠ, তাজা, দীর্ঘদেহী। কবে কোন এক সময়ে বনের সব রাখাল মিলে মা মনসার পূজা করেছিল, তারই কাহিনী চললো গানে গানে। সর্পদেবী মনসার বর্ণনায় সর্প-অলংকারেরই প্রাচুর্য—

ঢোঁড়া ঢ্যামনা মা তোর দুয়ারের প্রহরী।
সব রাখাল মিলে বনফুল তুলিব গো। (ধুয়া)
উদয়লাগ লাগ[৫] মা তোর গলাভরা মালা।
সব রাখাল মিলে.........

৩ 'মাড়' শব্দটি এসেছে 'মণ্ডপ' বা 'মন্দির' শব্দ থেকে।

৪ 'ঢাকি' অর্থাৎ ছোট ঢাক। অনেকটা ডুগডুগি বা ডমরুর মতো। একদিকে ডান হাতের আঙুল দিয়ে বাজাতে হয়, বাম হাত দিয়ে ধরে। 'বি-সম' অর্থে কেউ 'বিসম ঢাকি'ও বলেছেন।

৫ নাগ>লাগ।

হেলালাগ লাগ মা তোর কোমরেরই ডোরা।
চিরুনিয়া লাগ মা তোর চুল বিনাবার দড়ি।
অনন্তলাগ লাগ মা তোর মাথায় ছত্র ধরি।
শিয়ড়চাঁদা লাগ মা তোর আসন বসিবারি।
সব রাখাল মিলে ··
শংখ চক্র গদা পদ্ম বনমালা ধরি।
অন্তরীক্ষে উড়ালো বিষ, বল হরি হরি।

'হরিধ্বনি' দিয়ে গান শেষ হল।

আজ ঝাঁপান। আগামী কাল ১লা ভাদ্র। আগামী কাল রাখী পূর্ণিমার দিন এখানে 'পান্তাপরব' 'রান্ধাবাড়া' পরব। আগামী কাল সকাল থেকেই গুণীনরা সাপের ঝাঁপি নিয়ে ঘরে ঘরে সাপ খেলা দেখাতে যাবে। পয়সা পাবে, 'সিধা' পাবে মানৎ পূরণের। আর বিকালে গুণীনদের আপন আপন পাড়াতে আসর বসবে, মনসার গান হবে, সাপ খেলানো হবে। মল্লরাজধানী বিষ্ণুপুরে প্রায় সব পাড়ায় আছে 'মনসামাড়', কোন কোন পাড়ায় আনা হয়েছে মনসা দেবীর মূর্তি।[৬] আগামী কাল অর্থাৎ ১লা ভাদ্র ভাসানো হবে মনসা বারি বা মনসা মূর্তি।

২.

বিষ্ণুপুর মল্লরাজবাড়ীর সামনের প্রশস্ত রাস্তা ও অঙ্গনে ঝাঁপান হবে। বেলা চারটে থেকে লোক জমছে, নারী পুরুষের ভিড় বাড়ছে। দূরাগত ও স্থানীয় অধিবাসীরা আসছেন। জিপ গাড়ী ও রিক্সার ভিড়। ভিড় ক্যামেরা গলায় সাংবাদিক ও গবেষকদের। এখনো কেন কোন দল এলো না? আকাশে এখানে ওখানে মেঘ ভাসছে, কিন্তু পৃথিবীতে ঝকঝকে রোদ। এত রোদে 'সাপ উঠবে না' তাই আসতে দেরী। বিষ্ণুপুর শহরের শাঁখারি বাজার ও ক্যাওট পাড়া থেকে প্রধান দুটি দল আসে। এবারে এরাই একে অপরের প্রতিপক্ষ। প্রথম দল রক্ষণশীল মনোভাবের, দ্বিতীয় দলের চালচলন নিয়ম

৬ মনসামূর্তি তৈরী করে পূজা, আধুনিকতার লক্ষণ। বিষ্ণুপুরের 'নিমতলা' পাড়ায় দুটি মনসা-মূর্তি তৈরা হতে দেখেছি। একজন যুবক শিল্পীর নাম—সুবল ফৌজদার। বৈলাপাড়ার মিউনিসি-প্যালিটির পাশের বাউরীরা অর্ডার দিয়েছে। মূর্তির মূল্য ৪০ টাকা! চতুর্ভুজা দণ্ডায়মানা মূর্ত্ত, এক হাতে কমণ্ডলু, পায়ের কাছে বেহুলা-লখিন্দর। একটি ক্যালেণ্ডারের ছবি দেখে মূর্তিটি তৈরী হচ্ছে।

বহির্ভূত আধুনিক। প্রথম দল রাজার প্রীতিভাজন, দ্বিতীয় দল রাজার প্রজা—তারা 'প্রজাসত্ত্বে' জমি পেয়েছে। প্রথম দল যায় রাজাকে ভালোবেসে 'নাগদর্শন' করাতে। দ্বিতীয় দল যায় নিয়মরক্ষা করতে। তারা রাজার উপসত্বভোগী, একটা হলেও সাপ নিয়ে তাদের যেতে হবে।

দক্ষিণে মল্লরাজাদের আদি কুলদেবতা মৃন্ময়ী দেবীর মন্দির, তার পাশে রাধাশ্যাম মন্দির। উত্তরে 'পাথর দরজা'। পূর্বে ছোট ছোট গাছগাছালির ওধারে সুবৃহৎ লালজীউ মন্দির। পশ্চাতে জৌলুসহীন ঐশ্বর্যশূন্য জীর্ণ রাজবাড়ী। এখানেই থাকেন বর্তমান বৃদ্ধ রাজা কালীপদ সিংহঠাকুর।[৭] মল্লরাজারা নাগবংশীয়, তাই 'নাগদর্শন' তাঁদের কৌলিক রীতি। প্রতি বছর পালন করতে হয়। রাজার নাগদর্শনের পর সর্বজন সমক্ষে ঝাঁপান আরম্ভ হয়। এই রীতি। সাপ খেলায় যে দল সর্বসম্মতিক্রমে প্রথম হয় সেই দল পায় অভিনন্দন এবং রাজা করেন পুরস্কৃত। আগে সর্পগুণীনরা আসতো 'চৌদলে' (চতুর্দোলা), এখন আসে 'মাচানে'। কোন কোন মাচানের উপর থাকে 'বাঘ', মাটির তৈরী। তার উপর বসে গুণীন খেলা দেখায়। একে বলে 'বাঘ ঝাঁপান'। বাঘ ঝাঁপান খুব শক্ত কাজ, যে সে গুণীন পারে না। সাপ খেলা দেখাতে দেখাতে নানা রকম 'আড়াআড়ি মহড়া' চলে, 'খাওয়াখাওয়ি' চলে। এক দলের গুণীন অন্য দলের সাপকে মন্ত্র পড়ে নিস্তেজ করে দেয়। গুণীন 'বান্' মারে অন্য দলের গুণীনকে। অন্য দলের মারণ উচাটন বান 'কাটান' করে। এ সব কাজ হয় নীরবে, কখনও সরবে 'ধূলাপড়া' ছুঁড়ে। বান খেয়ে গুণীন অজ্ঞান হয়ে পড়ে। সাপের লেজ কামড়ে দিয়ে কোন গুণীন সাপকে উত্তেজিত করে। কেউ বা মুখের মধ্যে সাপের মুখ পুরে দিয়ে, এমন কি গোটা একটা সাপ (লাউডগা প্রভৃতি ছোট সাপ) মুখে পুরে দিয়ে বাহাদুরী দেখায়।

বেলা পড়ে আসছে, আলো মরে যাচ্ছে। আসছে ক্যাওট পাড়ার দল। প্রথমে একটি সাইকেল-চাকা গাড়ীতে দেবী মনসার মূর্তি। দেবী চতুর্ভুজা, পদ্মাসনা, তাঁকে বাম হাতে পিছন ফিরে পূজাপুষ্প দিচ্ছে চাঁদ সদাগর।[৮] তারপরে একটি ছোট চৌদলে আছেন মনসা অর্থাৎ ঐ পাড়ার বারোয়ারী মনসাদেবী। এতে কোন মূর্তি নয়, প্রতীক বারিঘট ও হাতিঘোড়া (সবই মাটির) রাখা হয়েছে পদ্মফুলের মধ্যে চৌদলের ভিতরে। চৌদলটি দুজন কাঁধে করে

৭ এঁরা মল্লরাজাদের দৌহিত্র বংশ।

৮ এই ভাবে মনসামূর্তি নিয়ে ঝাঁপানে আসা নিয়ম-বহির্ভূত আধুনিকতার লক্ষণ।

বইছে। চলন্ত গোরুর গাড়ীর উপর 'মাচান'। কয়েকজন মানুষ টানছে মাচানগাড়ী। মাচানে বেশ কয়েকজন মানুষ। সামনে একটি টুলের উপর সাপের ঝাঁপি, তার পিছনে মাটির বাঘ, বাঘের উপর এক অতিবৃদ্ধ গুণীন, গলায় জবার মালা, নাম গোলক মাঝি। এই দলের গুণীনের নাম (যিনি অধিকাংশ সময় খেলা দেখাবেন) নিরঞ্জন ধর্মপণ্ডিত। এঁর দুপাশে দুটি মেয়ে। একজনের নাম চাঁপা ধীবর, কুমারী যুবতী। অনেকগুলি ঢাকে কাঠি পড়ছে, তারই সঙ্গে মাইক বাজছে রিক্সায়, ব্যাণ্ড বাজনাও আছে। মাচানের গুণীন মাঝে মাঝে এক একটা ঝাঁপি খুলছেন, সাপ দাঁড়িয়ে উঠছে সাঁ করে, এই দলেরই জৌলুস বেশী। শব্দে সম্ভারে ঝাঁপানতলা উচ্চকিত করে এদের আগমন। এদের পিছু পিছু এলো শাঁখারি পাড়ার দল। শুধু গরুর গাড়ীর উপর মাচানে চড়ে। এ গাড়ীও মানুষে টানছে। সঙ্গে বাজছে জোড়া ঢাক। ঝাঁপান তলার মাঝখানে এসে মাচান দুটি ঠিক পাশাপাশি দাঁড়িয়ে গেল। ঢাকের শব্দ থেমে গেল। মাইকও থেমে গেছে। মাচানের উপর দু'দলই মনসার গান গাইছে। মাতৃ আবাহনের গান। বড় আন্তরিক আবেগে কাঁপছে সে গানের ভাষা। 'এসো এসো গো মা জয় বিষহরি'—ধুয়া চলছে একটি মাচানে। অন্য মাচানে শুনতে পেলাম—

দেবী এসো গো মা আমার আসরে।
ধূলায় পড়ে ডাকি তোমায় কাতরে।
নম নম নমো মাগো নমো নারায়ণী।

আরম্ভ হয়ে গেছে একের পর এক সাপ দেখানোর প্রতিযোগিতা। সমবেত গান ও গালাগালের মধ্যে। এক দল ব্যঙ্গ করছে অন্য দলকে। 'বাখান' করছে সাপকে, এমনকি 'চ্যাংমুড়ী কানী'[১] মনসাকে। ইতিমধ্যে বৃদ্ধ রাজা বেরিয়ে এসেছেন রাস্তায়, তিনি দূর থেকেই 'নাগদর্শন' করে ভিতরে চলে গেলেন। বৃদ্ধ রাজা আর কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবেন, তিনি যে অসুস্থ।

খোলা ঝাঁপির ভিতর থেকে কোন সাপ উঠছে না। ছন্দে ছন্দে মাথা দুলিয়ে, সাপের মুখের সামনে হাতের মুঠি দুলিয়ে বা ঝাঁপির ঢাকা দুলিয়ে সাপকে আরও দাঁড়িয়ে ওঠার জন্য উৎসাহিত করা হচ্ছে। কোন কোন সাপ উঠছে দু হাত, আড়াই হাত। ফণা বিস্তার করে দাঁড়ানো সাপের কোমর দু হাতে ধরে আছে গুণীন। শাঁখারি বাজারের মাচানেই সাপের প্রদর্শন-

১ সাপের এক চোখ কানা এবং মাথা দেখতে চ্যাং মাছের মতো, তাই মনসা দেবীকে 'চ্যাংমুড়ী কানী' বলে 'বাখান' (গালাগাল) করা হয়।

চমৎকারিত্ব অধিক। উভয় মাচানের গুণীনরাই দেখে নিচ্ছে আড়চোখে, পাশের মাচানের সাপ ঠিক মতো উঠছে কি উঠছে না। ক্যাওটপাড়ার গুণীনদের মুখে ছায়া নামছে। তাদের সাপ তেমন উঠছে না। তবু তারা এক সময় দর্শকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করলো একটি কুটিল দর্শন কুচকুচে কালো সাপ দাঁড় করিয়ে। একটি কাল্ কেউটে, কেউ বললো কেলে খরিস। কিন্তু শেষ জয় হল শাঁখারি বাজার মাচানের, তারা সবচেয়ে বড় 'হুড়পী'টা খুলে বার করলো এক বিচিত্রিত ময়াল সাপ, এ সাপ ফণা তুলতে পারে না, কিন্তু এর বিশালত্ব ও চিত্রিত অঙ্গসজ্জা দেখবার মতো। এক গুণীনের গলায় বুকে হাতে বেড় দিয়ে মোচড় দিতে লাগলো ময়াল। ময়ালের মুখটা কিন্তু টিপে ধরে আছে গুণীন। অন্য মাচানে অর্থাৎ ক্যাওট পাড়ার মাচানে ততক্ষণে উঠে দাঁড়িয়েছে একটি মেয়ে, যুবতী মেয়ে, সে সাপ খেলা দেখাচ্ছে। কিন্তু তবুও তাদের মান রক্ষা হল না। শাঁখারি বাজারের মাচানে একটি যুবক গুণীন, প্যাণ্ট সার্ট পরা, তরজার ঢঙে গানে গানে প্রশ্ন রাখছে পাশের মাচানের দিকে আড়চোখে চেয়ে চেয়ে— নেচে নেচে—

শুন শুন গুণী ভাই ইতিহাস বল,
কোথায় গরুড়ের দর্প চূর্ণ হয়েছিল ?

যুবকটির নাম রামচন্দ্র বেইজ (৩০/৩১)। তার গানের ও নাচের সঙ্গে 'বিষম ঢাকি' বাজছিল, বাজছিল 'তুম্বো বাঁশি'।[১০] দীর্ঘ পৌরাণিক বৃত্তান্ত গানে গানে বর্ণনা করে সে আত্মপরিচয় দিয়ে শেষ করলো—

কালীপদ বিদ্যাবাগীশ আমার গুণীনের নাম।
বাজুক বিষম ঢাকি চলুন ঝাঁপান॥

কালো, দীর্ঘদেহী, একটু কুব্জ কপালে সিঁদুরের লেপ, বৃদ্ধ কালীবাগীশও মাচানের পাশে উপস্থিত আছেন, আর উপরে আছেন শশধর নন্দী। নন্দী,[১১] বেজ, বাগীশ (ব্রাহ্মণ) প্রভৃতি উপাধি বুঝিয়ে দিচ্ছে উচ্চ নিম্ন সর্বশ্রেণীর বর্ণ হিন্দুই সর্প ঝাঁপানের গুণীন হতে পারেন। শুনেছিলাম কালীপদ বিদ্যাবাগীশের কন্যা এবারে খেলা দেখাবেন মাচানে, কিন্তু প্রধান গুণীনের আপত্তিতে তা হয়ে ওঠেনি। শাঁখারি বাজার মাচানে কোন মেয়ে ওঠেনি এ বছর।

১০ লম্বা পেট-মোটা লাউয়ের খোলা ফুটো করে তৈরী বাঁশী, সাপুড়েরা এ বাঁশী খুবই ব্যবহার করে।

১১ নন্দীদের জাতব্যবসা শংখশিল্প, বিষ্ণুপুরে এঁদের শংখশিল্পের অনেক দোকানও আছে।

এ বছর মাত্র দুটি দল, আর কোন দল আসেনি। অন্যান্য বছর মাঝি পাড়া থেকে, কুচিয়াকোল বা বাঁকুড়া শহর বা গড়বেতা থেকেও দল এসেছে। এ বছরের দলের স্বল্পতা প্রমাণ করে কি যে বিষ্ণুপুরে ঝাঁপানের রমরমা কমে আসছে?

৩.

পরণে সাদা ধুতি, সাদা পাঞ্জাবী, রাজা বসে আছেন একটি ইজিচেয়ারে। হাতে তাঁর জ্বলন্ত সিগারেট। রাজ্য রাজসিংহাসন কবে চলে গেছে, তাই রাজার রাজকীয়ত্ব কিছুই নাই। তাঁর সামনে ঝাঁপি খুলে বিষম ঢাকি বাজিয়ে গান গেয়ে সাপ খেলা দেখাতে এসেছেন জয়ী দলের গুণীন। রাজার ভাঙা বারান্দায় উৎসুক মানুষের ভিড় জমে গেল। গুণীন অবশেষে প্রণাম নিবেদন করলেন রাজাকে। রাজা বকশিশ দিলেন এক টাকার একটি নোট। গুণীন ঝাঁপি নিয়ে অন্দরের দিকে গেলেন, রাণীরা নাগদর্শন করবেন, সাপ খেলানো দেখবেন।

আমরা পথে নামলাম। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়েছে। আকাশে পূর্ণ চাঁদের মায়া তখন সোনালি জ্যোৎস্নায় ভুবন ভরিয়ে দিচ্ছে। সমাগত রাখী পূর্ণিমার চতুর্দশী চাঁদ॥
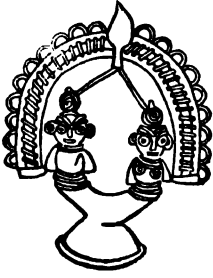
টেরাকোটার কাব্য

টেরাকোটা-মন্দির সম্বন্ধে বাংলা সাহিত্যে কিছু আলোচনা হয়েছে। কিন্তু মন্দির গাত্রের টেরাকোটা শিল্পের বিষয়বস্তু সম্বন্ধে তুলনামূলক আলোচনা স্বতন্ত্র ভাবে হয়নি। এই নিবন্ধটি বিষ্ণুপুরের দুটি শ্রেষ্ঠ মন্দিরের টেরাকোটা শিল্পের বিষয়বস্তুগত তুলনামূলক আলোচনা।

ক.

বিষ্ণুপুরে অনেকগুলি সুদর্শন মন্দির আছে। যে কোন বিষ্ণুপুর প্রেমিক সে তথ্য জানেন। আমরা কেবল মাত্র দুটি মন্দিরের কথা বলবো। শ্যামরায় ও জোড়বাংলা। জোড়বাংলা, যার প্রকৃত নাম প্রায় সবাই ভুলে গেছেন। অবশ্য শ্যামরায় মন্দিরও এখন পাঁচচুড়ো মন্দির নামে চলিত। মন্দির দুটিকে যতবার দেখেছি ততবারই তুলনা করে দেখতে ইচ্ছা হয়েছে। কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে প্রথমে জোড়বাংলা মুগ্ধ করে রেখেছিল। শ্যামরায় যখন দীর্ঘদিন পরে দেখলাম এবং শুনলাম বাংলার সর্বশ্রেষ্ঠ সুন্দর মূর্তিময় মন্দির এই শ্যামরায়, তখনই তুলনার তর্ক জাগলো মনে। তর্ক করতে নেমে ভালোবাসাই সঞ্চিত হয়েছে ফলশ্রুতিতে।

ধাড়ি হাম্বিরদেব! রাজার নাম যে এমন হয় জানা ছিল না। 'ধাড়ি' শব্দটি ব্যঙ্গার্থে আজও ব্যবহৃত হয়। তৎকালে অর্থাৎ সপ্তদশ শতাব্দীতেও এই শব্দটির নিশ্চয়ই চলন ছিল। বাঁকুড়া বিষ্ণুপুরেও চলন ছিল। বীর হাম্বির ছিলেন প্রখ্যাত মল্লরাজ। উগ্র ক্ষত্রিয় হয়েও বৈষ্ণব রসের সাধনায় মগ্ন হয়েছিলেন। ভালোই হয়েছিল। বহু বিপরীতের মেলবন্ধন ঘটানো বিষ্ণুপুর ইতিহাসের, বাঁকুড়া ইতিহাসের, রাঢ় সংস্কৃতির মৌল ধর্ম। বীর হাম্বিরের পর ধাড়ি হাম্বির। নামেও বুঝি বিপরীতের মিলন। তারপর রঘুনাথ মল্লদেব। উত্তরাধিকার সূত্রে রাজা নন। ধাড়ি হাম্বিরের মস্তিষ্ক বিকৃত হল, পাগল রাজার ছেলে আবার বোবা। দেবরকে অভিষিক্ত করলেন মহীয়সী মহারাণী। অর্থাৎ রঘুনাথ মল্লদেব ১৬১৬ খ্রীষ্টাব্দে সিংহাসন আরোহণ করলেন। ১৬৪৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হল শ্যামরায় মন্দির। কালাচাঁদ জীউয়ের মন্দির ১৬৫৫

শ্রীহাবে। শ্যামরায়ের শ্রীমন্দির অর্থাৎ 'পাঁচচূড়ার মন্দির'। আর কালচাঁদের শ্রীমন্দির অর্থাৎ 'জোড়বাংলা'। বয়সে একটি জ্যেষ্ঠ, অন্যটি কনিষ্ঠ। 'The city of Art' বিষ্ণুপুরের মন্দির মণ্ডলীর মধ্যে এই দুটিই আমার নয়ন মন টেনেছে বেশী।

খ.

'কালের কপোল তলে শুভ্র সমুজ্জ্বল এ তাজমহল'—রবীন্দ্রবাণী মুখরিত হয়েছে তাজমহলকে দেখে। বিশ্বের কোন্ কবি, যিনি তাজমহল দেখেছেন অথচ কাব্যবাণীময় বিস্ময় প্রকাশ করেন নি? 'শুভ্র সমুজ্জ্বল' না হলেও কালের স্মৃতিতে আমাদের আলোচ্য মন্দির দুটির মূর্চ্ছনাও অমোঘ। শুভ্র সমুজ্জ্বল নয় কিন্তু রক্তিম রাগান্বিত, শিল্প সুষমাবান। জোড়বাংলা দেখতে দেখতে দু'চোখ ভরে যায় রঙে সেই রঙ এসে লাগে মনের পরতে পরতে, রাঙিয়ে দিয়ে যায় চিরন্তনী রংরেজিনীর মতো, যে রঙের অবলোপ ঘটাতে কোনদিন চাইবে না কোন দর্শক। এমন রঙের অমলিন বিভাবিচ্ছুরণ অন্য কোন মন্দিরে নেই। পাঁচচূড়া শ্যামরায়ের গাত্রবর্ণ ধূসর, ম্লান রক্তিম, তার রক্তিমতার বিভা অবলুপ্ত, সাদা ও কালো রঙের ব্যবহার ঐ রক্তিম বিভায় ছন্দভঙ্গও ঘটিয়েছে। কালো হয়ে গেছে কারুকাজের নানা উত্তল মুখ, চূড়া, বর্ডার। বর্ডারের চারপাশে সাদা চূণ রঙের মিনের কাজ বা জোড়মুখ, অন্যবিধ বৈচিত্র্য ও ঐশ্বর্যদ্যুতি এনেছিল এককালে কিন্তু এখন তা সৌন্দর্যহানি করছে বলেই মনে হয়।

একটু দূরে দাঁড়িয়ে মন্দির চত্বর থেকে দেখলে দুটি মন্দিরের গঠন পার্থক্য সহজ চোখেই ধরা পড়ে। শ্যামরায় মন্দির বিশাল ও বাহুল্য মণ্ডিত। তার পাঁচটি চূড়াই বড় বড় কেন্দ্র চূড়াটি অন্য চারটির তুলনায় বেশ বড়। একটু এলায়িত স্থূল ভঙ্গির দেহ সৌষ্ঠব এই মন্দিরের। কিন্তু জোড়বাংলার সামনে এলে দেখা যায় দৃঢ় পিনদ্ধ বাহুল্য বর্জিত অবয়ব অথচ বিশালতা অনুমিত হয়। একটি মাত্র চূড়া দাঁড়িয়ে আছে মন্দিরটির অদ্ভুত গঠনশৈলীর মাথায়। শ্যামরায় মন্দিরের মাথায় পাঁচটি চূড়াই স্বতন্ত্র মনোযোগ আকর্ষণ করে। কিন্তু জোড়বাংলার চূড়া চোখে না পড়লেও ক্ষতি নেই। জোড়বাংলার দুটি পৃথক মন্দিরের অঙ্গাঙ্গি জোড়, দৃষ্টি বুদ্ধি মন সৌন্দর্যবোধকে টেনে রাখে, প্রশ্ন জাগায়, কারিগরীর অতুলনীয় সামর্থ্য সম্বন্ধে ভাবায়।

কাছে এলে দুটি মন্দিরের গঠন যে সম্পূর্ণ আলাদা তা বুঝে নিতে অসুবিধা

হয় না। শ্যামরায় মন্দির গঠন গরিমায় ভারবহনক্ষম। এর তিনটি অংশ নয়, বলা যায়, এর প্রধান অংশ দুটি। এর ভিত্তি অপ্রধান অংশ। শ্যামরায় মন্দিরের ভিত্তিপীঠ কেন এমন অনুচ্চ, প্রশ্ন জাগবে। মাটি থেকে আধ হাতের মতো উচ্চ। প্রশ্ন জাগবে মন্দিরের ভারে এর ভিৎ কি বসে গেছে? না, তা নয়। বসে যাওয়া সম্ভব নয়। কারণ বাঁকুড়া বিষ্ণুপুর অঞ্চলের মাটি মোরাম সমন্বিত। আর বসে গেলে, মন্দিরে নিশ্চয়ই ফাটল জাগতো। বসে যাওয়ার সম্ভাবনাও নেই। অন্য দিকে জোড়বাংলার ভিৎ বেশ প্রমাণ সাইজের উঁচু। এখানে ভিত্তি, মন্দিরগাত্র ও চূড়া—এই তিনটি অংশে উচ্চতা-গত সমতা বর্তমান অবশ্য জোড়বাংলারও দুটি প্রধান অংশ। পাশাপাশি দুটি প্রধান অংশ, শ্যামরায়ের মতো উপর ও নীচের দুটি আলাদা অংশ নয়। শ্যামরায়ের ভিত্তিপীঠ অপ্রধান, জোড়বাংলার চূড়া অপ্রধান।

উভয় মন্দিরের চূড়ার ভিন্নতা সত্যই দ্রষ্টব্য ও বিশ্লেষণ যোগ্য। শ্যামরায়ের চূড়াগুলি আগে দেখতে হলে মন্দিরে প্রবেশ করে এক কোণের একটি মাত্র সিঁড়ি ভেঙে তরতর করে উঠে যেতে হয়। সিঁড়ি অনায়াসে আরোহণ-যোগ্য। সিঁড়িতে যথাযথ আলো এসে পড়ার জন্য ঝরোখা আছে। কিন্তু জোড়বাংলার উপরে যাওয়ার সিঁড়ি সংকীর্ণ, আয়াসসাধ্য এবং আলোহীন অন্ধকার। শ্যামরায়ের মাথায় পৌঁছালে এক নতুন ভুবন, টেরাকোটার ঐশ্বর্য এখানে ভিন্নতর বাণীবাহক। চারটি চূড়া মন্দিরের কাঁধের উপরে চারকোণে স্থিত এবং মাঝখানে আর একটি। মাঝেরটিই তুলনায় বড়। মাঝের চূড়াটির বাইরে ও ভিতরে চারপাশে ঘেরা ঘোরানো পথ। সেখানে আলোছায়ার ছন্দ। কারণ অনেকগুলি অলিন্দ, অনেক খিলান দেওয়া ছোট ছোট খোলা দরজা। দরজা না বলে বলা যায় ফাঁকা ঝরোখা বা জানালা। প্রধান চূড়ায় মোট এগারোটা—ভিতর ও বাহির মিলে। চারকোণের ছোট চূড়াচতুষ্টয়ের প্রত্যেকটিতে চারটি করে খিলানযুক্ত জানালা। জোড়বাংলার চূড়াটির গর্ভে অপ্রশস্ত চাতাল এবং চারিদিকে চারটি বহির্দরজা। আগে চূড়াগর্ভে প্রবেশ করে তারপর ঐ দরজাগুলি দিয়ে মন্দিরের কাঁধে নামা যায়। এখানে কোন কাজ নেই, শিল্পের, কাহিনীর, গম্বুজের। কিন্তু কবিত্ব আছে। এই চূড়া নিজেকে জাহির করে না, শ্যামরায় মন্দিরের চূড়াগুলির মতো। জোড়বাংলার চূড়াগর্ভে বসে বাইরে চোখ মেলে দিলে দেখা যায় বিষ্ণুপুর নগরী, দেখা যায় আদিগন্ত বিস্তৃত বনশ্রেণী—বর্ষায় গাঢ় সবুজ, শীতে রুক্ষ ধূসর।

এই দেখার আনন্দ অসীম রসানুভূতি সঞ্চার করে, আসনস্থ দর্শককে ক্ষণেকে কবি করে তোলে। কিন্তু শ্যামরায় মন্দির-চূড়াগুলিই আকর্ষিত করে, চূড়াগুলি থেকে চোখ সরে না, তাই আদিগন্ত দেখার সময় মেলে না সেখানে বসে।

জোড়বাংলার চূড়ায় কোথাও টেরাকোটার কাজ নেই। শ্যামরায় মন্দিরের পাঁচটি চূড়ার মধ্যে চারিটিতে টেরাকোটা অলংকরণের অনায়াস প্রাচুর্য। একটি চূড়া একদম ন্যাড়া। কেন? উত্তর নেই। এক কোণের ঐ নিরাভরণ চূড়াটি ছন্দভঙ্গ করেছে। শিল্পী এখানে এসে ক্লান্ত হলেন কেন? এই শ্যামরায় মন্দিরের নিচে উপরে ভিতরে বাইরে কোথাও হস্তপরিমাণ স্থান নেই যেখানে না টেরাকোটার কাজ আছে। অথচ ঐ চূড়াটি অবহেলিত হল কেন? কে উত্তর দেবে? শ্যামরায় মন্দিরের ঐ রিক্ত চূড়াটি থেকে দৃষ্টি সরিয়ে এনে অন্য চারটি চূড়া দেখার আগে নিচের কাজ ভালো করে দেখা দরকার। তাহলে পার্থক্যবোধটি চূড়ান্ত হবে। অবশ্য পার্থক্য বড় কথা নয়, বড় কথা শিল্পসৌন্দর্য।

মূল মন্দিরের নিচের অংশের মতো শ্যামরায়ের উপরের অংশেও আছে গর্ভগৃহ। মধ্যচূড়াটির গর্ভগৃহ অনবদ্য। নিচের গর্ভগৃহের থেকেও এখানে টেরাকোটার কাজ তুলনামূলকভাবে সুবিন্যস্ত, ছন্দোময়, সুন্দর। এখানে কাজের প্রধান সূত্র হচ্ছে—অলমতি বিস্তরেণ। তালভঙ্গ হয়নি কোথাও। না ফুলকারী কাজের আধিক্যে, না বর্ডার নির্মাণের অধিক প্রবণতায়, না মূর্তিময় ঘটনা সমাবেশের বাড়াবাড়িতে। এখানে মূর্তির প্যানেলগুলি মাঝারি সাইজের। এখানে খুব বড় মূর্তি সাজানোর প্রতি আগ্রহ যেমন নেই, খুব ছোট মূর্তি রচনার নিপুণতা দেখানোর চেষ্টাও নেই। প্রধান চূড়া ও পার্শ্বিক চূড়াগুলির প্রত্যেকটি উর্দ্ধমুখী, ভিতরগম্বুজ অপূর্ব ব্যাপাস্প করে ফুলকাটা বৃত্তাকার কাজে সাজানো। চূড়াগুলির বহির্গাত্র ও অভ্যন্তরগাত্রে মনুষ্যমূর্তিরই প্রাধান্য। যদিও একেবারে মেঝের কাছে নিচের প্যানেলে যুদ্ধরত পশুমূর্তির শ্রেণী আছে। কিন্তু সংখ্যায় খুবই অল্প। চূড়ার বহির্গাত্রে গাভী ও বৃষ, হাঁস ও হরিণ, ঘোড়া ও হিংস্র জন্তুর বেশ কিছু মূর্তি আছে। চূড়াগুলির অন্তরভাগে আছে টেরাকোটার ছাঁচে ঢালা ও সাজানো দেবদেবী-মূর্তি। হস্তীপৃষ্ঠে সওয়ার, তীরন্দাজ, সজ্জিত ঘোড়া, নৃত্যশিল্পী, বাদ্যকর, বীণাবাদক, বংশীবাদক, শিঙাবাদক, তাসাবাদক। চূড়াগুলির বহির্গাত্রেও আছে এই ধরণের মূর্তিমালা, তার সঙ্গে গ্রামীণ বাস্তবদৃশ্যও বর্তমান—গোদহনরত নারী, পালকি চলে দুলকি চালে প্রভৃতি। আর একটিতে কি সতীদাহচিত্র? তাই মনে হয়। চূড়াগুলির মাথায় মাথায় রেখদেউলের

মতো রেখার বিন্যাস। কোণের চারটি চূড়ায় বসানো জৈনমন্দিরের মতো প্রস্তরচক্র। মাঝের বড় চূড়াটির মাথায় রেখা আছে, প্রস্তরচক্র নেই। তার বদলে মাঝখানে বসানো আছে উর্ধ্বমুখী লোহার রড, বোধহয় ত্রিশূল ছিল।

জোড়বাংলার চূড়া চারচালা ঢালু কোন্ সমন্বিত। আর চূড়ার পাশে দুটি প্রশস্ত পীঠ—দুটি ভিন্ন মন্দিরের শীর্ষরেখা এবং ঢালু হয়ে গেছে দুই দিকে। অর্থাৎ দোচালা বিশিষ্ট দুটি মন্দির জোড়া দিলে যা হয়। শ্যামরায় মন্দিরের কাঁধ ও পিঠ প্রশস্ত, জোড়বাংলার কাঁধ ও পিঠ অপ্রশস্ত।

শ্যামরায় মন্দিরের চূড়া অংশের কাজ সম্বন্ধে যে সিদ্ধান্ত বারবার উচ্চারিত হবার মতো তা হচ্ছে টেরাকোটা বিন্যাসের সুমিতিবোধ। কোথাও কোন অতিপ্রজ আধিক্য নেই, আছে কাম্য অবকাশ, রিলিফ। অবকাশ না থাকলে কোন শিল্পই অনুধাবন করা যায় না পূর্ণ বিশ্রামে, সম্ভোগ করা যায় না সহজ আনন্দে। অবশ্য শ্যামরায় মন্দিরের নিচের অংশের কাজের অতিবহুলতা প্রথমে না দেখে এলে, উপরের এই সুমিতি সংযম চোখে নাও পড়তে পারে। অতএব আগে মন্দিরটির মূল ভিতর-বাহির দেখা দরকার, তারপর চূড়ায় চূড়ায় পরিক্রমা।

গ.

শ্যামরায় মন্দির ও জোড়বাংলার মন্দির গাত্র, স্তম্ভ, প্রবেশ পথ, অলিন্দ বা ঢাকা বারান্দা, গর্ভগৃহ প্রভৃতি গঠনশৈলীর দিক থেকে যেমন তুলনাযোগ্য, অনুধাবনযোগ্য, তেমনি এদের টেরাকোটার কাজের বাহুল্য ও সংযম, ঘটনা-চিত্রের নির্ধারিত পরিবেশন, স্পষ্টত্ব ও নিপুণত্ব, পৌরাণিক ও সামাজিক বিষয় বিন্যাস, বিষ্ণুপুরের নিজস্ব কাহিনী আহরণ প্রভৃতির তুলনামূলক আলোচনাও আনন্দজনক।

দর্শক-মনে শ্যামরায় মন্দির দেখার প্রধান ফলশ্রুতি বিহ্বলতা, বিস্ময়রস। কোথাও একটুকু স্থান নেই যেখানে না কাজ আছে।[১] যে সামান্য অংশ এখানে ওখানে শূন্য মনে হচ্ছে সেখানেও এককালে কাজ ছিল, কালের হস্তাবলেপে খসে পড়েছে। দেখতে হয় মন্দিরের চারপাশ ঘুরে ঘুরে, বারবার। দেখতে

১ এই প্রসঙ্গ দিনাজপুর জেলার কান্তনগরের কান্তজীর মন্দির ও নদীয়া জেলার শান্তিপুরের জলেশ্বর মহাদেব মন্দির দুটির কথা কারও কারও মনে আসতে পারে।

দেখতে মনে হবে সংখ্যাতীত করে সৃষ্টি করার প্রবণতাই এখানে কাজ করেছে।

শ্যামরায় মন্দিরের চারদিকে চারটি প্রবেশ পথের ব্যবস্থা আছে। ইংরাজী করে বললে বলতে হয় 'গেট'। যথার্থ প্রবেশ দ্বার দুটি, কারণ গর্ভগৃহে প্রবেশ করা যায় সরাসরি দুটি প্রবেশ পথে। গেটের নির্মাণ স্তম্ভ দিয়ে। স্বতন্ত্র ভাবে স্তম্ভগুলিও দেখার মতো। সামনের গেটে অর্থাৎ প্রধান প্রবেশ পথের একদিকে সখীদের রঙ্গবিলসিত বিভঙ্গ শরীর নিয়ে তৈরী হাতীর পিঠে কৃষ্ণ। এটি 'নবনারীকুঞ্জর'। ঐ প্রবেশ পথের মাথায়—উঁচুতে দেখতে পাওয়া যায় রামরাবণের যুদ্ধরত বড় সাইজের মূর্তি। উভয়ের হাতেই উদ্যত ধনুর্বান। রাবণমূর্তিটি দেখবার মতো। তবে এই বৃহৎ প্যানেলটি ছন্দোহীন—পরিসর গ্রহণের দিক থেকে। বিখ্যাত 'রাসমণ্ডলের' ছোট ধরণের উদাহরণ আছে এই প্রবেশ পথের দু'দিকে দুটি ও দুটি চারটি।[২] অন্য প্রবেশ পথের দু'দিকে আছে দুটি মাঝারি সাইজের 'রাসমণ্ডল'। বহির্গাত্রে মিনিয়েচার কাজের আধিক্য। প্রধানত: মূর্তি এবং ফুলকারী কাজ। কিছু জালিকাজ এবং আলপনার কাজও আছে। বিন্যস্ত অজস্র মূর্তির হাতে প্রধানত: বাঁশি অথবা তীরধনু। উদ্যত ধনুর্বান ও ওষ্ঠলগ্ন বাঁশি বিষ্ণুপুরী ঐতিহ্যের প্রতীক। একদিকে মল্ল, সিংহ উপাধিধারী রাজাদের শৌর্যবীর্য সংগ্রাম সমরজয়, অন্যদিকে বৈষ্ণব ভাবভক্তিতে মগ্ন দেবদ্বিজ পূজা—এই দুই মানসবৃত্তির সমন্বয়ে রচিত হয়েছিল বিষ্ণুপুর রাজকাহিনী। মন্দিরের টেরাকোটার কাজ সেই বৈশিষ্ট্যকেই অনুগ্রহণ করেছে, অনুসরণ করেছে। মূর্তিগুলির চারপাশে সুসজ্জিতভাবে ছোটছোট 'স্ল্যাব' পরিয়ে পরিয়ে ফুলকারী কাজ, বর্ডার প্রভৃতি করা হয়েছে। মিনিয়েচার কাজের মধ্যে এক ইঞ্চি, দু'ইঞ্চি, তিন ইঞ্চি সাইজের ছোট কাজ ও মূর্তিও আছে। বহুপ্রকার মূর্তির মধ্যে প্রধান কৃষ্ণরাধা বা ললিতা-কৃষ্ণ-রাধা মূর্তিরই বহুপ্রাধান্য। রাধাকৃষ্ণ বা মধ্যে কৃষ্ণ দুইদিকে দুই সখী দাঁড়িয়ে আছে. নিবিড় ভালোবাসার দৃশ্য রচনা করে। মুখচুম্বন অথবা মুখদর্শন করার দৃশ্য, নায়ক-নায়িকা দাঁড়িয়ে অথবা বসে, এমন অসংখ্য আগ্রহে হাজারে হাজারে রচনা করা হয়েছে যে দর্শকের দৃষ্টি একবার আকর্ষিত হলে আর সরানো যায় না অন্যত্র। মনে পড়ে যায় গীতগোবিন্দের মিলনঘন আবেশচঞ্চল পদ 'শ্লিষ্যতি কামপি চুম্বতি কামপি কামপি রময়তি রামাম্'। অথচ সুধী দর্শক ঐ চাঞ্চল্যের

২ খুব ছোট সাইজের 'রাসমণ্ডল' দেখেছি আঁটপুরের (হুগলী) রাধাগোবিন্দজীর মন্দির গাত্রে।

সময়টুকু পার হলে দেখতে পাবেন কী গভীর তন্ময়তা প্রতিটি কৃষ্ণমূর্তির মুখে—কৃষ্ণ তন্ময় হয়ে দেখছেন সখীমুখ, রাধামুখ, ললিতামুখ।

শ্যামরায় মন্দিরের চারপাশের দৃশ্য খুঁটিয়ে দেখলে পৌরাণিক কাহিনীর বহুসূত্র খুঁজে পাওয়া যায়। তারই মধ্যে একটিতে অনেকগুলি ছোট গড়নের হাতি শুঁড় তুলে ঊর্ধ্বমুখে, তাদের উপর বসেছে একটি সুবৃহৎ পাখী। দেখে মনে হয় তারা যুদ্ধ রত। এটি কোন্ পৌরাণিক কাহিনীর ছিন্ন ঘটনা? হাতির সংখ্যা আট। অষ্টদিগ্‌বারণের সঙ্গে ব্রহ্মাণ্ডজয়ী তরুণ গড়ুরের যুদ্ধ চলছে কি?

মন্দিরের বহির্গাত্র ভালো করে দেখলেই বোঝা যায় মন্দিরের শিল্প সৃষ্টিতে দুটি রসের প্রাধান্য, বীর রস ও শৃঙ্গার রস। যুদ্ধদৃশ্য ও প্রণয়দৃশ্য। তার সঙ্গে উৎসবদৃশ্য অর্থাৎ রাসলীলার সমন্বয়।

জোড়বাংলা মন্দিরের চারিদিকের দেওয়ালের কাজও দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখবার মতো। তবে এ মন্দিরে একটি মাত্র প্রবেশ দরজা বা 'গেট'। অন্য একটি চোরা প্রবেশ পথ আছে, সেটি সুশোভন নয়। সেটিকে খিড়কি পথও বলা যায়।

জোড়বাংলা মন্দিরের বহির্গাত্রের টেরাকোটা কাজের প্রধান বৈশিষ্ট্য দুটি দুটি চারটি তোরণের মডেল। মন্দিরের ডান ও বাম বহির্গাত্রে এ-দুটির কাজ বিশিষ্টতাব্যঞ্জক। আমরা সাঁচীস্তূপের তোরণ সম্বন্ধেই প্রশংসামুগ্ধ, অভিজ্ঞ। তার ছবি, নানা মণ্ডপসজ্জায় তার অনুকরণ আমরা অনেক দেখেছি। কিন্তু জোড়বাংলার দেওয়ালে, পার্শ্ব দেওয়ালে, গড়ে তোলা এই অপূর্ব তোরণের অনুকরণ আমরা কোথাও দেখিনি।[৩] অথচ এটি অনুকরণীয়। তোরণের দুটি প্রধান স্তম্ভ, তার মাথার দিকে আড়াআড়ি একটি বড় ও একটি ছোট। বড় আড়াআড়ি স্তম্ভটির মাঝখানে দুটি পৃথক স্তম্ভ দাঁড়িয়ে আছে তিন সাইজের এবং তাদের মাথায় ধরা আছে দুটি ঢালু চাল। দাঁড়ানো ও আড়াআড়ি ছোট বড় স্তম্ভগুলি গোল বা চ্যাপ্টা এবং নানাবিধ মূর্তিতে, জালিতে, ফুলকারী কাজে অলংকৃত। ওখানে উপরের দিকে মুখোমুখী দুটি বৃহৎ ময়ূর অপূর্ব। মন্দির গাত্রের টেরাকোটা কাজের বিষয়বিন্যাস দেখবার মতো। এখানেও যুদ্ধদৃশ্যের প্রাধান্য। উদ্যত যুদ্ধাস্ত্র নিয়ে সৈন্য চলেছে। চলেছে রথ। চলেছে ময়ূরপঙ্খী

৩ ঐ তোরণের স্পষ্ট ছবি এসেছে একটি আলোকচিত্রে। দ্র: পৃ ১৩০ চ. বাংলায় ভ্রমণ, ২ খণ্ড, ১৯৪০

নৌকা। বামদিকে বহির্গাত্রে একেবারে নিচের দিকে এমনি দাঁড়বাহী তিনটি নৌকা পরপর গাঁথা হয়েছে। অপূর্ব! নৌসাধনোদ্যত বাঙালী সেনানির বিজয়যাত্রা ইতিহাসে ও সংস্কৃত কাব্যে পরিচিত বিষয়। বাঁকুড়া জেলার নদীমালা যে একদিন নাব্য ছিল তার প্রমাণ বোধ হয় এগুলি। এই ধরণের টেরাকোটায় বিশিষ্ট ছবি বাংলাদেশের অন্যান্য মন্দিরগাত্রের ভূষণ হয়ে আছে দেখা যায়। এগুলি নদীমাতৃক বাংলাদেশেরই নিত্যশাশ্বত পরিচয় বহন করছে।

জোড়বাংলা মন্দিরের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য যেমন তোরণচিহ্নে, তেমনি এই নৌযাত্রার টেরাকোটায়। শ্যামরায় মন্দিরের রাসমণ্ডল বিশিষ্ট, তা জোড়বাংলায় নেই। তেমনি জোড়বাংলার ময়ূরপঙ্খী নাও নেই শ্যামরায় মন্দিরে। এক একটি নৌকোয় অনেকগুলি দাঁড়ি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড় টানছে। নৌকার উপর দাঁড়িয়ে আছে পরপর একমুখে অনেকগুলি মানুষ, হাতে তাদের উদ্যত অস্ত্র। কোন্ অস্ত্র? বন্দুক? নৌকাবিলাসের সখীবাহিত নৌকার নিদর্শনও আছে এখানে। যুদ্ধ দৃশ্যের পাশাপাশি আছে পালকি-চলার দৃশ্য, গোচারণ দৃশ্য। গরু মানুষের গ্রামীণ দৃশ্যও দেখা যায়। পশুপক্ষির গড়ন সৌন্দর্যেরও অপ্রতুলতা নেই। কোথাও পুরুষ বসে আছে, নারী পাখা বা চামর নিয়ে ব্যজন করছে। একটি বড় টেরাকোটার 'স্লাব' ভীষ্মের শরশয্যার। কোথাও কালীয় দমনের ঘটনাচিত্রাবলী। বালকৃষ্ণলীলার দৃশ্য, যমলার্জুন, পুতনাবধ প্রভৃতিও সারি বেঁধে এসেছে। একমুণ্ড বহুহাত, চারমুণ্ড পাঁচমুণ্ড দেবতা বা যক্ষের ধনুর্বান নিয়ে যুদ্ধদৃশ্যও বারবার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। একি ষড়ানন কার্তিকেয়, যিনি দেবসেনাপতি? মন্দিরের পশ্চাৎগাত্রে দেখতে পাওয়া যায় এক ত্রিমস্তক মূর্তি চলেছে জন্তুবাহনে চড়ে। যুদ্ধের দৃশ্যের আধিক্যের সঙ্গে শিকারদৃশ্যও দেখতে পাওয়া যায়। পশু শিকার।* হিংস্র পশুর দেহভঙ্গি ও মুখভঙ্গি দেখবার মতো। পশুকে পশু আক্রমণ করে খেয়ে ফেলছে, বন্যপশু মানুষকে কামড়ে ধরেছে— এমন দৃশ্য অনেক। হরিণ, হাতি, ঘোড়া, গরু, ভালুক, হাতিতে হাতিতে লড়াই, ষাঁড়ের লড়াই শিং নামিয়ে, ঊর্ধ্বশৃঙ্গ হরিণ ও হাতির ছুটন্ত দৃশ্যগাঁথা প্যানেলগুলি অনবদ্য। মন্দির গাত্রের নিচের দিকেই পশুপক্ষিমূর্তির ও উপরের দিকে মানুষের প্যানেলের আধিক্য। অর্ধনারী অর্ধময়ূরের প্যানেল মন্দির-

* এমনি শিকারদৃশ্যের আধিক্য অন্যান্য টেরাকোটা মন্দিরের এক লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য। আঁটপুরের রাধাগোবিন্দজীর মন্দিরের শিকারদৃশ্যে প্রায় সর্বত্র শিকারীর সঙ্গে কুকুর চলেছে দেখা যায়।

প্রবেশ-তোরণের খিলানের উপরিভাগে, ভারি সুন্দর ও বিস্ময়কর। তাদের হাতে বীণাও আছে। এই মন্দিরের গায়েও আছে অষ্টদিগ্‌বারণের সঙ্গে গড়ুর পাখীর যুদ্ধ দৃশ্য। পরপর দুটি প্যানেলে। একদিকে হাতির পিঠে, অন্যদিকে ঘোড়ার পিঠে পরস্পর যুদ্ধরত সৈনিক।

বিচিত্ররস ছড়ানো রয়েছে মানবসমাজের দৃশ্যগুলিতে। অতীত বিষ্ণুপুরের, রাঢ় অঞ্চলের খবর এগুলিতে পাওয়া যায়। নৈবেদ্য বা ভেট নিয়ে যাচ্ছে নারী, সপুত্র নারীকে আশীর্বাদ করছে সংন্ন্যাসী বা মোহান্ত বাবাজী। কোন বিপুলবপু মানুষ হুঁকো টানছে। দীর্ঘকেশী নারীর সংখ্যাও অনেক। এক নারী অন্য নারীকে সিঁদুর পরিয়ে দিচ্ছে, এক নারী অন্য নারীর কেশবিন্যাসে রত। পুরুষ শুয়ে আছে আরাম করে, নারী পা টিপে দিচ্ছে। তাকিয়া কোলে নিয়ে বসে আছে ভুঁড়িবিপুল জমিদার। আগুন জেলে দুই নারী আগুন পোয়াচ্ছে (না কি অগ্নিপূজা করছে ?)। পুরুষ ভোজন করছে, নারী পরিবেশন করছে। এই রকম সব পরিচিত জীবনচ্ছবি মন্দির গাত্রে তৎকালীন পরিচিত সমাজকে তুলে ধরেছে।

জোড়বাংলা মন্দির গাত্রের টেরাকোটার কাজের প্রধান বৈশিষ্ট্য বিষয়ের বৈচিত্র্য। শুধু ভাগবত কাহিনীতে আবদ্ধ নয় শিল্পীর মন। শত সহস্র টেরাকোটার কাজের মধ্যে যুদ্ধদৃশ্যের পরই বেশি চোখে পড়ে ভক্তিনত, যুক্ত অঞ্জলি, যুক্তকর নারীপুরুষের সারি। বাদ্যরত ভঙ্গি শ্যামরায় মন্দিরগাত্রের মতো বেশি নয়। ছোট বড় মাঝারি বুটিদার ফুল ও ফুলকলিও আছে অনেক। অতীত পুরাণ থেকে ইতিহাস পথে হাঁটতে হাঁটতে বাস্তববিশ্বে শিল্পী তাঁর দৃষ্টির আলোক ফেলবার পূর্বে প্রকৃতিজগৎকেও দেখেছেন।

কিন্তু শ্যামরায় মন্দিরের শিল্পীমানসের সঙ্গে জোড়বাংলা মন্দিরের শিল্পীমানসের পার্থক্যও সহজে ধরা পড়ে। জোড়বাংলা মন্দিরের সব কাজই মাঝারী দৈর্ঘপ্রস্থের, সূক্ষ্মতার দিকে আগ্রহ তাঁরা দেখান নি। ফুলকারী বা জালিকাটা কাজ আছে পরিমাণ মতো, প্রয়োজন মতো। তবে এক একটি দৃশ্যকে সুদৃশ্য বর্ডার দিয়ে স্বতন্ত্র করে সাজিয়ে দেওয়ার ধৈর্য এঁদের ছিল, বেশ বোঝা যায়। মন্দিরগাত্রে মূর্তিস্থাপনার আধিক্য যেমন নেই, ন্যূনতাও তেমনি নেই। আর লক্ষণীয়, জোড়বাংলা মন্দিরের বহির্গাত্রের অমলিন রঙ। মাত্র দশ বছরের এদিকে ওদিকে শ্যামরায় ও জোড়বাংলা নির্মিত হয়েছে, কিন্তু আজও জোড়বাংলার পোড়ামাটির রক্তমৃত্তিকার ঔজ্জ্বল্য অম্লান আছে। তুলনায় শ্যামরায় বেশ ধূসর, ম্লান, কালচে-খয়েরি।

খ.

মন্দিরের প্রবেশ পথের স্তম্ভগুলি স্তম্ভিত হয়ে দেখবার মতো। দৃঢ় বলিষ্ঠ ভঙ্গি অথচ অনতিদীর্ঘ। কারুমগুনের অপূর্বত্বে অদ্বিতীয়। গ্রীসীয়ান স্তম্ভের মতো গগনচুম্বী নয়, অধুনা নির্মিত গৃহগঠনের গোল সাদা থামও নয়। এর ধরণ সম্পূর্ণ ভিন্ন. একে গঠিত ও সজ্জিত করার মানসিকতা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। শ্যামরায় মন্দিরের চারিদিকেই এমন স্তম্ভ আছে। তাদের শ্রেণীবিন্যাস এই রকম—দুটি পূর্ণাঙ্গ এবং তার দুপাশে দুটি অর্ধাঙ্গ স্তম্ভ। অর্থাৎ পরপর যদি দেখা যায় তাহলে প্রথমে একটি অর্ধাঙ্গ স্তম্ভ ডান দেওয়ালের সঙ্গে লিপ্ত, তারপর দুটি পূর্ণাঙ্গ স্তম্ভ—একটির পর অন্যটি,তারপর আবার একটি অর্ধাঙ্গ স্তম্ভ বাম দেওয়ালের সঙ্গে লিপ্ত। জোড়বাংলা মন্দিরও স্তম্ভসৌন্দর্যবর্জিত নয়, কিন্তু মন্দিরের চার পাশেই স্তম্ভ নেই। এর প্রধান প্রবেশ পথে দুটি পূর্ণ স্তম্ভ, দুটি অর্ধ স্তম্ভ। বিপরীত ভাগে দুটি অর্ধ স্তম্ভ ও দুটি এক-চতুর্থাংশ স্তম্ভ। এখানে প্রবেশ পথের আদল আছে, কিন্তু প্রকৃত প্রবেশ পথ নেই বলেই এমন বিচিত্র গঠনপ্রণালী অবলম্বিত হয়েছে। অনেক স্বর্ণজড়োয়া অলংকারে মুকুট বিভূষিত বিশালাঙ্গী রাজরাণীর মতো এই স্তম্ভগুলি শুধু অভিজাত বাহার দেখাচ্ছে না, মন্দিরের বহিরঙ্গ ও উর্ধ্বাঙ্গের ভার বহন করছে* এবং ঢাকা বারান্দা নির্মাণের সাহায্য করেছে এই স্তম্ভগুলি। তার সঙ্গে গর্ভগৃহে প্রবেশের জন্য প্রবেশপথের ফাঁকও দিয়েছে। কোন্ মন্দিরটির স্তম্ভ সর্বাধিক সুন্দর তা বলা যায় না। তবে শ্যামরায় মন্দিরে স্তম্ভসংখ্যা বেশী বলে যে কোন দিকে দাঁড়িয়েই আমরা স্তম্ভসৌন্দর্য দুচোখ ভরে উপভোগ করতে পারি। জোড়বাংলা সেদিক থেকে ন্যূন হলেও মন্দিরের গায়ে সুদৃশ্য তোরণের মডেল নির্মাণ করে বৈশিষ্ট্যে ও সৌন্দর্যে জিতে যেতে চেয়েছে। স্তম্ভগুলির গায়ের উর্ধ্বমুখী ও নিম্নমুখী কাটাকাটা থাক, কার্ণিশ নির্মাণ, মূর্তি যোজনা ও ফুলকারী কাজের বাহাদুরী চিরকাল প্রশংসা পাবে। স্তম্ভগুলির উর্ধ্বাঙ্গ ও নিম্নাঙ্গ ভারি, কোমর সরু সামঞ্জস্যপূর্ণ। একটি স্তম্ভের সঙ্গে অন্যটির মাথায় মাথায় খিলানের যোগ। খিলানগুলিকেও সুসজ্জিত করা হয়েছে, যার ফলে জোড়ের কর্কশতা সম্পূর্ণ মিলিয়ে গেছে। শ্যামরায় মন্দিরের গর্ভগৃহে প্রবেশের দুটি পথ উন্মুক্ত, দুটি বন্ধ। প্রবেশের যে দুটি পথ বন্ধ কিন্তু প্রবেশ পথের আদল

* অজন্তার গুহাস্তম্ভগুলি ভারবাহী নয়। দ্রঃ পৃ ১১৩, অপরূপা অজন্তা, নারায়ণ সান্যাল

আছে—তাতে কারুকার্য খচিত দুপাল্লা বন্ধ কপাটের নিদর্শন আছে। খুবই সুন্দর কপাটের কারুকার্য।

৬

অলিন্দে প্রবেশ করলে আর একবার থমকে থেমে যেতে হয়। নিরাকার ব্রহ্ম বলেছিলেন—রূপং রূপং প্রতিরূপং বভুবঃ। শ্যামরায় মন্দিরের অলিন্দে অর্থাৎ ঢাকা বারান্দায় ঢুকলে মনে হবে কী আশ্চর্য ভাবে টেরাকোটার সৌন্দর্য রূপে রূপে প্রতিটি রূপে আত্মপ্রকাশ করেছে। এত কাজ, এত মূর্তি, এমন রকমারি বর্ডার, ফুলকারি, এত আলপনা যে ধৈর্য্য ধরে দেখতে দেখতেও ধৈর্য হারিয়ে যায়। মানুষের দু'চোখের গ্রহণ ক্ষমতা আর কতটুকু। বাইরে থেকে সমগ্র মন্দিরটিকে দেখে নেওয়ার বিহ্বলতা, অলিন্দে প্রবেশের বিহ্বলতা থেকে পৃথক। বাইরে থেকে গোটা মন্দির অনেকখানি দর্শন পরিধিতে ছড়িয়ে থাকে, কিন্তু অলিন্দে দর্শনপরিধি ছোট হয়ে আসে। অথচ এই সীমিত পরিধিতেই অমেয় অজস্রতা। অকৃপণ ঐশ্বর্য।

শ্যামরায় মন্দিরের টেরাকোটা কাজের ধর্ম সূক্ষ্মতামুখীন। অলিন্দে সেই সূক্ষ্মতার শ্রেষ্ঠ নিদর্শনগুলি আছে। অলিন্দগাত্রের সর্বনিম্ন ভাগে দেখতে পাওয়া যায় অলংকৃত হাতির পিঠে সওয়ার ও মাহুত, তীর নিক্ষেপকারী শক্তিমদমত্ত সৈন্যদল, ঘোড়া ছুটিয়ে চলেছে ঘোড়সওয়ার—অপূর্ব কারুময় ঘোড়ার জিন ঘোড়ার লাগাম। মুখোমুখি দু'টি দু টি ঘোড়া দু'পা তুলে লড়াই করছে। তারপর উপরের সারিগুলিতে দেখি বাঁশি বাজাচ্ছেন কৃষ্ণ, সুরমুগ্ধ সখীরা দাঁড়িয়ে আছেন। অলিন্দ গাত্রের ছোট ছোট রাসমণ্ডলের গোল গোল কাজ আছে অনেকগুলি।* আছে বাদ্যযন্ত্র হাতে নারী ও পুরুষ। আছে দেব-দেবীর মূর্তি। দশাবতারের এক এক অবতার মূর্তির সবাহন উপস্থিতি।

শ্যামরায় মন্দিরের প্রবেশ পথের মাথায়, প্রথম অলিন্দ পার হয়ে গর্ভগৃহে প্রবেশ পথের মাথায়, সব দিকেই নারী ও পুরুষ এবং পুরুষ ও নারী মূর্তির বিন্যাস। প্রায় সব কটি জোড়েই নারী ও পুরুষ পরস্পরকে আদর করছে, মুখ তুলে ধরে নিরীক্ষণ করছে, কখনো কোন মুখ চুম্বন করছে অন্য একটি মুখ।

* খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতকের একটি 'টেরাকোটার রাসমণ্ডল' সংগৃহীত আছে আশুতোষ মিউজিয়মে। নমুনাটি হুগলী জেলায় প্রাপ্ত। তার তুলনায় শ্যামরায় মন্দিরের যে কোন একটি রাস-মণ্ডলের কাজ অনেক বেশী নৃত্যময়, গতিময়, কারুসুন্দর।

মনে হচ্ছে গৃহে গৃহে কত আলাপ, আদর, আনন্দ বিনিময়। গৃহ না কুঞ্জ? রথের চূড়ার মতো এক একটি ঘরে একটি নারী ও পুরুষ, কখনো বা নারীপুরুষ মিলে মোট তিনজন। ওঁরা যে কৃষ্ণ ও রাধা বেশ বোঝা যায়, বেশ বোঝা যায় ললিতাও আছেন ওঁদের পাশে। তাহলে মহারাসের ছবি ফুটিয়ে তোলা হয়েছে? ষোড়শ গোপিনীর প্রত্যেকের সঙ্গে স্বতন্ত্রভাবে কৃষ্ণ মিলিত হয়েছিলেন-বৃন্দাবনের সেই মহারাসের সৃষ্টি কি মন্দির মধ্যে এই ভাবেই হয়েছে টেরাকোটার সারভূত সৌন্দর্যে? হয়তো তাই। কারণ শ্যামরায় মন্দিরের অলিন্দের পরই গর্ভগৃহে রাসমণ্ডল ও বৃন্দাবন বিপিনের আয়োজনই সর্বাধিক পরিলক্ষিত হয়। সমগ্র বিষ্ণুপুরকে দিঘি, অরণ্য, তোরণ, পশুশালা, মন্দির ও পথের দ্বারা বৃন্দাবনের আদলে সাজিয়ে ছিলেন মল্লরাজারা—তাই শ্রীনিবাস আচার্য বিষ্ণুপুরের অন্য এক নামকরণ করেছিলেন—'গুপ্ত বৃন্দাবন'। টেরাকোটার কুঞ্জে কুঞ্জে সব নারী ও পুরুষ মূর্তি অর্থাৎ সখী ও কৃষ্ণ দাঁড়িয়ে আছেন। এমন করে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মুখ তুলে দেখার আনন্দ-মহাকাব্য আর কোথাও রচিত হয়েছে বলে আমার জানা নেই। কে যে কার মুখ দেখছে, কে যে কার মুখ চুম্বন করছে কে বলবে! এমন কিছু মুখ-দেখার চিত্রমূর্তি জোড়বাংলা মন্দিরেও আছে, কিন্তু এমন ঘটা নেই, এমন রাসোল্লাসময় মহাকাব্যিক অজস্রতা নেই। শ্যামরায়ে কৃষ্ণের মাধুর্যমূর্তির প্রাধান্য, জোড়বাংলায় কৃষ্ণের ঐশ্বর্যমূর্তির প্রাধান্য।

জোড়বাংলা মন্দিরের সামনের অলিন্দে টেরাকোটার কাজ আছে, পিছনের অলিন্দে কোন কাজ নেই, সম্পূর্ণ ন্যাড়া পিছনের অলিন্দ। সামনের অলিন্দের দেওয়াল গাত্রে বড় সাইজের মূর্তির কাজ। ঊর্দ্ধদিকের গম্বুজেও কারুকার্য লক্ষণীয়। খিলানগুলিতেও অপূর্ব প্যানেল যোজিত হয়েছে। অলিন্দের গায়ে বাদ্য ও নৃত্যের ভঙ্গিমান মূর্তিরই প্রাধান্য। অনেকগুলি তার-সমন্বিত একটি চৌকো যন্ত্র বাজাচ্ছে একটি নারী, একটি পুরুষ ফুঁ দিচ্ছে বাঁশিতে, আর একটি নারী তারই পাশে বসে বাজাচ্ছে করতাল। মৃদঙ্গ গলায় ঝুলিয়ে তালে তালে নৃত্য করতে করতে মন্দিরা বাজাচ্ছে—এই ধরণের নৃত্য ভঙ্গিমার অসংখ্য জোড় জোড়বাংলা মন্দিরের ভিতর অলিন্দে। আর বসেছে গানের আসর। সঙ্গীত-রসসুধায় ভরপুর, ভারতবর্ষের সঙ্গীতসমাজে দিল্লীর পরেই সঙ্গীত ঘরাণার বিখ্যাত-শহর বিষ্ণুপুরের সংগীত ইতিহাসের সাক্ষ্য এই ধরণের টেরাকোটার কারুকার্যগুলি আজও বহন করছে। গানের আসরের এমন আধিক্য শ্যামরায় মন্দিরে ঘটেনি। শ্যামরায় মন্দিরের গায়কের হাতে একতারা ও দোতারা প্রভৃতি যন্ত্র দেখা যায়।

অলিন্দের ভিতর অংশের দেওয়ালে মেঝের সন্নিকটে বড় বড় হাঁসের প্যানেল, তারপর গরুর প্যানেল। সুদীর্ঘ ফুলকারি কাজের নমুনাও আছে। এখানের মূর্তিগুলির উচ্চতা তুলনামূলকভাবে বেশি। দীর্ঘদেহী নারী ও পুরুষ দাঁড়িয়ে আছে জোড়বাংলা মন্দিরের অলিন্দের দক্ষিণভাগে—এই লক্ষণ খুব সহজেই চোখে পড়ে। তারই সঙ্গে দেখতে পাওয়া যাবে এখানেও ভক্তিমতী নারী ও সাধুসন্তদের মূর্তিবাহুল্য। টিকি সমন্বিত পুরুষ ও বেণী সমন্বিত নারী মূর্তির বাহুল্য অনেক সময় একঘেয়েমির নিদর্শন বলে মনে হতে পারে। শ্যামরায় মন্দিরের অলিন্দেও দেখা যায় দাড়ি ও জটা সমন্বিত সাধুমূর্তি অনেক, পদ্মাসনে বা যোগাসনে বসে আছে। এবং অনেক বেণীধরা নারী পূজারিণীও আছে। ফকির দরবেশও আছে।

মন্দিরমূর্তিতে সাধুসন্ত ও ভক্তিমতীদের এই প্রাধান্যেরও ইতিহাসগত কারণ আছে। মহারাজ রঘুনাথ দেব, যিনি শ্যামরায় ও জোড়বাংলা নির্মাণ করিয়েছিলেন, তিনিই তাঁর রাজ্যে বহু সংখ্যক 'অস্থল' নির্মাণ করান। 'অস্থল' ছিল সাধুসন্ন্যাসীদের সাময়িক নিবাস। বিষ্ণুপুর রাজধানীতে সাধুসন্ত বৈষ্ণববাউলদের আগমন-আধিক্য অনুমান করে নিতে পারা যায়। তারই প্রভাব ঐ সব টেরাকোটার কাজে।

অলিন্দ দিয়ে গর্ভগৃহের চতুষ্পার্শ্ব ঘোরা যায় না—জোড়বাংলার এই বৈশিষ্ট্য শ্যামরায় মন্দিরের গঠনের থেকে জোড়বাংলাকে আলাদা করেছে। অর্ধ ও অর্ধ এবং একটি পূর্ণ—এই ভাবে দুটি অংশে চারপাশের অলিন্দ বিভক্ত; আর দুঃখ হয়, পিছনের অংশের অলিন্দ সম্পূর্ণ কারুকার্যহীন দেখে। সম্মুখে ঐশ্বর্য উন্মুক্ত হয়ে আছে, পশ্চাতে রিক্ততা গোপন করে রাখা হয়েছে। অবশ্য একথাও মনে রাখতে হবে, জোড়বাংলার গঠনগত জটিলতার জন্য পশ্চাৎভাগে আলো প্রবেশের তেমন সুযোগ নেই, তাই টেরাকোটার কাজ বর্জন করেছেন শিল্পী পশ্চাৎ অলিন্দে। যেমন আলোর অভাবে কারুকার্য বর্জিত হয়েছে জোড়বাংলা ও শ্যামরায় উভয় মন্দিরের উপরে যাবার সিঁড়িতে।

জোড়বাংলা মন্দিরের আর একটি বৈশিষ্ট্য অলিন্দের কোণের ঘরগুলি। জোড়বাংলা মন্দিরের মাথায় একটি চূড়া, চারকোণে আর চারটি চূড়া নেই শ্যামরায় মন্দিরের মতো। কিন্তু শিল্পী চূড়াঘর এখানে এনেছেন নিচে। অলিন্দের চারকোণে। এই অলিন্দগৃহগুলির ভিতর দেওয়াল সুসজ্জিত। একটি গৃহের মধ্যেকার একটি আলপনার 'স্মাব' চিরকাল স্মরণ করে রাখার মতো।

চ.

মন্দিরের নানা অংশ, সম্মুখভাগ, স্তম্ভ, অলিন্দ, গর্ভগৃহ ও চূড়া। সম্মুখভাগ, স্তম্ভ, অলিন্দ আমরা দেখেছি। চূড়াও দেখে নিয়েছি সর্বপ্রথমে। এবার আমরা প্রবেশ করবো গর্ভগৃহে।

উভয় মন্দিরের গর্ভগৃহেই দেবতা নেই। গর্ভগৃহে দেবতা না থাকুক, শ্যামরায়-এর গর্ভগৃহে আছে বিস্ময়, অপার অনন্ত বিস্ময়। এ বিস্ময়, দেবতা-শূন্যতার দুঃখ ভুলিয়ে দেয়। পূজার দেবতা নয়, সৌন্দর্যের দেবতা শ্যামরায় মন্দিরের গর্ভগৃহে এখনও বাস করছেন। শ্যামরায় মন্দিরের গর্ভগৃহে প্রবেশ দ্বার দুটি। এখানের দেবমূর্তি রাখার পীঠস্থানটি অনন্যসাধারণ টেরাকোটার ঐশ্বর্যে সমৃদ্ধ। ঐশ্বর্য যার আছে সে এমনি করেই পরতে পরতে খুলে দেখায়। শ্যামরায়ের সর্বশেষ সর্বশ্রেষ্ঠ অগাধ সম্ভার যে গর্ভগৃহ, সে বিষয়ে কারও দ্বিমত থাকতে পারে না। বিখ্যাত 'রাসমণ্ডল'এর প্রায় চল্লিশ ইঞ্চি ব্যাসের টেরাকোটার কাজটি এইখানেই আছে। গোলাকৃতি রাসমণ্ডলটি দর্শনে নিখুঁত, গঠনে বৃহৎ। অনেকগুলি পোড়া মাটির টুকরো গেঁথে এমন একটি পূর্ণাঙ্গ দৃশ্য অন্য কোন মন্দিরে রচিত হয়নি। ঐ গোলাকৃতি রাসমণ্ডলটির মধ্যে চক্রায়তন দুই সারি, নৃত্যমূর্তির মালা তৈরী হয়েছে, তার মাঝখানে বংশীধারী ত্রিভঙ্গিম কৃষ্ণ দুই পাশে রাধা ও ললিতা। দুই সারি নৃত্যভঙ্গিমার মালার মাঝখানে সাদা চক্রায়তন বর্ডারের কারুকাজ। এই ধরনের বর্ডার তিনটি। তারপর রাসমণ্ডলের চারপাশে লতাপাতা গাছ ময়ূর-ময়ূরী হরিণ ও ফুলকারি নক্সা এবং বংশীধারী ছন্দিত নারীপুরুষ মূর্তি যোগ করে মণ্ডলটিকে চতুর্ভুজ গঠন দেওয়া হয়েছে।[৭] তখন এক একটি ভুজের দৈর্ঘ হয়েছে প্রায় পঞ্চাশ ইঞ্চি। ঐ রাসমণ্ডল চতুর্ভুজ ক্ষেত্রের মাথায় দুটি ছোট লম্বা প্যানেলে সংকীর্তনের প্রশেসন। দুটি প্রশেসনের মাঝামাঝি আছে রাধা ও কৃষ্ণ, হাত দিয়ে তুলে ধরে রাধার মুখকান্তি দেখছেন কৃষ্ণ। দেবতাবেদীর বাম দেওয়ালে প্রধানত বড় সাইজের কাজ, বৃক্ষ—ডালে ডালে কত না পাখি, হয়তো কদম্ববৃক্ষের বননিকুঞ্জ তৈরী করা হয়েছে এই ভাবে। দেওয়ালের নিচের দিকে মানুষের প্যানেল, মৃদঙ্গ ও করতাল বাদকের সুভঙ্গিম মূর্তিসারি। এই বাম দেওয়ালেই আর একটি রাসমণ্ডলের মাঝারি সাইজের

৭ বহু টুকরো জুড়ে এতবড় একটা স্ল্যাব অন্যত্র দেখিনি। তবে কৃষ্ণনগরের (খানাকুল কৃষ্ণনগর: হুগলী জেলা) রাধাবল্লভ মন্দির মাত্রের স্ল্যাবগুলিও দৈর্ঘ্যপ্রস্থে বেশ বড়। কিন্তু সেগুলি মূর্তিহীন নক্শা মাত্র।

কাজ আছে। গর্ভগৃহের গম্বুজের কাজও আশ্চর্য নৈপুণ্যে গঠিত। এমনকি খিলানগুলি পর্যন্ত শূন্য নয়। গর্ভগৃহের দেওয়ালে সাধারণতঃ মানব মূর্তিশ্রেণীরই প্রাধান্য। অবশ্য মেখেলগ্ন প্যানেলে গরুর সারি আছে। গরু ও নারী পর পর। গর্ভগৃহের একদিকের দেওয়ালের নিচের দিকে মাতা ও স্তন্যপানরত সন্তানের প্যানেল আছে। আর আছে সন্তানকে দুবাহুতে তুলে ধরে আদর করার দৃশ্য। এই ভাবে নৃত্যচুম্বন আলিঙ্গনের দৃশ্য পরিবেশে ভিন্ন রসের সৃষ্টি হয়েছে। মানব-মানবীর মূর্তির প্রাধান্য সত্ত্বেও ফুলকারি কাজের পাড় ও আলপনার প্যানেলও লক্ষণীয়।

ছ.

বৃক্ষতলে পুরুষ নারীমুখ তুলে পরম আদরে দেখছে এমন দৃশ্যও অনেক এই গর্ভগৃহে। মৃদঙ্গ, বাঁশি, সেতার বা বীণা, করতাল, ঢোলক বাদকের সংখ্যাও কম নয়। নারীর নৃত্যভঙ্গিমাও অনেক। করতাল হাতে নিয়ে ও মৃদঙ্গ গলায় ঝুলিয়ে নিয়ে নৃত্যভঙ্গিমাময় নারী ও পুরুষ উভয় মূর্তিই আছে। করতালবাদিকা নারীকে বোঝা যায় বক্ষবাসী স্তনদ্বয়ের উন্নত বর্তুল আকারে। এই রকম নৃত্য-ভঙ্গিমার মূর্তি শ্রেণীবদ্ধ হয়ে আছে হাজারে হাজারে। গর্ভগৃহে প্রধানতঃ, অন্যত্রও আছে। একটি বৃক্ষ, তারপর একটি নারী, আবার মৃদঙ্গবাদকের নৃত্য-ভঙ্গিমা, এইভাবে মূর্তি সাজিয়ে প্যানেল করা হয়েছে। সব মিলিয়ে গর্ভগৃহ জুড়ে অদ্ভুত বৃন্দাবন। ফুলকাটা বর্ডার দেওয়া বংশীধারী একক কৃষ্ণমূর্তিও অনেক। বড় থেকে খুব ছোট মূর্তির সমাবেশ ঘটেছে গর্ভগৃহের দেওয়ালে। দু'ইঞ্চির মতো ছোট পরিধির মূর্তিও আছে। এইভাবেই সূক্ষ্ম কাজের প্রতি শ্যামরায় মন্দিরের ভিতরে বাহিরে আগ্রহের নমুনা ছড়িয়ে আছে। গর্ভগৃহে রাস উৎসবের ছবি আমরা দেখি। দেখি নৃত্য, দেখি তা তা থৈ থৈ আনন্দ। শুধু তাই নয়, ধ্বনিও শুনি। ঐ নির্জন গর্ভগৃহে মূর্তিমালা দেখতে দেখতে যদি দর্শন-ইন্দ্রিয়ের চেতনা ক্ষণকাল স্তব্ধ করে রাখি তাহলেই শুনতে পাবো অশ্রুত সঙ্গীতধ্বনি। করতালে, মৃদঙ্গে, বংশীরবে মিলিত সুরের উল্লাস ছড়িয়ে পড়বে দর্শকের চেতনায়। শ্যামরায় গর্ভগৃহে দাঁড়িয়ে এমন সংগীত উৎসবে যিনি দোলায়িত না হয়েছেন তিনি ভাগ্যহীন। সৌন্দর্যের সাগরতীরে দাঁড়িয়েও কল্লোল শুনতে না পাওয়ার মতো ভাগ্যহীন।

শ্যামরায় মন্দিরের গর্ভগৃহে প্রবেশদ্বার দু'টি। এই দুটি প্রবেশ দ্বারের দুই

পাশে ও উপরে অজস্র কাজ। কুলুঙ্গীও আছে। আর বিষ্ণুপুরের 'দশাবতার তাস' সাইজের গোল মনোগ্রামের মত 'রাধাকৃষ্ণললিতা' মূর্তির কাজ খুবই সংযত ও সুন্দর। এই ধরণের গড়নের কিছু ফুলও আছে, কোটা এবং কুঁড়ি। প্রবেশ পথ দুটির টেরাকোটার কাজে শুধু নৃত্যভঙ্গি ও বাদ্যভঙ্গিরই আধিক্য নয়, যুদ্ধ দৃশ্যও আছে। অস্ত্রধারী যুদ্ধরত, শত্রুপাতনকারী বানর সৈন্যদেরও দেখতে পাওয়া যায়। হাতিতে হাতিতে যুদ্ধদৃশ্যও আছে। পাঁচ দশ ইঞ্চির মতো চওড়া-লম্বা মূর্তিও আছে। অঞ্জলিবদ্ধ বা বদ্ধকর প্রণামের ভঙ্গিতে ধরে থাকা ভক্তি বিহ্বল মানুষের মূর্তিসারিগুলিও দেখবার মতো। গর্ভগৃহে প্রবেশ পথের একটি দেওয়ালে 'অনন্তশয্যা'র কাজটিও খুবই লক্ষণীয়।

জোড়বাংলা মন্দিরের গর্ভগৃহে দেবতা নেই। এবং ততোধিক বিস্ময় যে এখানে কোন টেরাকোটার কাজও নেই। দেবতা না থাক, শ্যামরায় মন্দিরের গর্ভগৃহের মতো সৌন্দর্যদেবতার উপস্থিতিও এখানে ঘটলো না কেন? জোড়-বাংলার পশ্চাৎ অলিন্দ যেমন নেড়া, গর্ভগৃহও তেমনি রিক্ত। অবশ্য এর গর্ভ-গৃহের গঠনবৈচিত্র্য লক্ষণীয়। দুটি মন্দিরকে পাশাপাশি জুড়ে দিলে মধ্যেকার গর্ভগৃহ কিরকম হবে ভাববার বিষয়। সেই ভাবনায় একটি বিস্ময়কর উত্তর গর্ভগৃহে প্রবেশের পথগুলি। জোড়বাংলার গর্ভগৃহে প্রবেশের পথ কয়েকটি, শ্যামরায়ের মন্দিরের মতো দুটি মাত্র নয়। প্রবেশ পথের নির্মাণ শৈলী বিচিত্র। এর প্রবেশ পথে ছোট, বড়, মাঝারি মূর্তিই বেশি। এখানে ফুলকারি কাজ ছাড়া সূক্ষ্ম কাজ নেই।

গড়নে সুবিশাল অথচ কারুকার্যে সূক্ষ্মত্বের জন্য শ্যামরায় মন্দির স্মরণীয়। জোড়বাংলা গড়নে সুবিশাল নয়, ক্ষুদ্রও নয়, সূক্ষ্ম কারুকার্যের জন্যও দৃষ্টি আকর্ষণকারী নয়, কিন্তু দুটি হৃদয়ের মতো দুটি মন্দিরের এই সংযুক্তি সব মানুষকেই বিস্মিত করে। শ্যামরায় টেরাকোটার অরূপণ রাজকীয় ঐশ্বর্যে আর জোড়বাংলা সংযমিত সৌন্দর্যে বিশিষ্ট। কিন্তু দুটি মন্দিরের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কোনটি? এমন প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে পণ্ডিতেরা বলেছেন, শ্যামরায় মন্দির বাংলা তথা ভারতবর্ষের মৃৎনির্মিত ও টেরাকোটাশিল্প সমৃদ্ধ বাংলা প্যাটার্নের মন্দিরগুলির মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। সর্বশ্রেষ্ঠত্বের বিস্ময় শ্যামরায় নিশ্চয়ই জাগায়, কিন্তু জোড়বাংলা পায় নিগূঢ় প্রেম। গর্ভগৃহে থাকবে প্রেমের দেবতা তাই জোড়বাংলার গর্ভগৃহে কারুকলার প্রগলভতা বর্জিত হয়েছে। চূড়াগৃহে প্রেমিকযুগল দেখবে একে অপরকে, তাই সেখানেও কারুকলা নীরব, উহ্য। শ্যামরায় ঐশ্বর্যময় টেরাকোটার

মহাকাব্য, সুঠাম শরীর সুষমারক্তিম জোড়বাংলা হচ্ছে টেরাকোটার গীতিকাব্য। বেশ বোঝা যায় শ্যামরায় মন্দির নির্মাণের পর অভিজ্ঞতাজ্ঞানী শিল্পীদল জোড় বাংলা নির্মাণে হাত দেন। মহাকাব্য রচনায় বিপুল শক্তি তখন গীতিকাব্য রচনায় নিপুণ প্রতিভায় পরিণত হয়েছে! এ যুগ, মহাকাব্য নয়, গীতিকাব্যের যুগ, জোড়বাংলার যুগ। শ্যামরায় মন্দিরের লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি মূর্তি ও কারুকলার সমাবেশ যেন লক্ষকোটি তরঙ্গ ভঙ্গিম কারুকার্যময় সমুদ্র। এবং সেই অযুত ভঙ্গ তরঙ্গকে গণনা করবে কে? তাই মন্দির মূর্তিমালার অংশে অংশে দৃষ্টি ফেলে দেখায় যে আনন্দ তার থেকে অনেক বেশী বড় বিস্ময় জাগে মন্দিরটিকে সমগ্রভাবে দেখে। এমন দৃষ্টিরম্য মূর্তি-সমাবেশ আর কোথাও আছে কি না জানি না। শুধু শ্যামরায় নয়, জোড়বাংলা সম্বন্ধেও ঐ কথা সে, তাজ-মহলের গাত্রসৌন্দর্য অপূর্ব জানি, কিন্তু তা বহুমূল্য মণিমাণিক্য ও সুচিক্কন প্রস্তর সমাবেশে সম্ভব হয়েছে, কিন্তু শুধু মূল্যহীন মাটি পুড়িয়ে এমন সৌন্দর্য সাধনা কে করে কোথায় করেছে? শ্যামরায়ের সমস্ত মন্দিরটা যেন রঙ্গনৃত্য করছে। কোথাও কোন মূর্তি জৈন মহাবীর বা বুদ্ধমূর্তির মতো স্থির শান্ত নয়, Static নয়, dynamic—গতিভঙ্গিম, প্রাণময়। সব মূর্তিই প্রাণচাঞ্চল্যের প্রতীক এবং অলংকার সমন্বিত।[৮] এত প্রাণচাঞ্চল্য সর্ব্বাঙ্গে এমন করে জড়িয়ে নিয়ে কোথায় কোন্ মন্দির যুগ যুগ ধরে দাঁড়িয়ে আছে? পাশ্চাত্য শিল্পী ভিনসেণ্ট ভ্যান গগের বিখ্যাত গীর্জার ছবির মতো শ্যামরায় মন্দিরটিও যেন এখনি নড়ে উঠবে মনে হয়। অবশেষে একটি ত্রুটির কথাও বলতে হয়।

মন্দির মধ্যে মূর্তি সমাবেশে কোথাও কোথাও মাধুর্য ভঙ্গ হয়েছে। শৃঙ্গার রসময় ক্রিয়াবন্ধুর মূর্তিশ্রেণীর মাঝখানে হঠাৎ যুদ্ধদৃশ্যর তীরন্দাজ বা ঘোড়-সওয়ার কেন? শ্যামরায় মন্দিরের মধ্য চূড়াটিতে এই রকম রসভঙ্গের নিদর্শন আছে। মাধুর্যের সঙ্গে বীররসের ঐ মিশ্রণ গৌড়ীয় বৈষ্ণব রসশাস্ত্র সম্মত নয়। তবে পণ্ডিতেরা বলতে পারেন—এটি বিষ্ণুপুরের ঐতিহ্য—মল্লরাজারা বীর, মল্ল-রাজারা বৈষ্ণব, তাই বীর্যের সঙ্গে মাধুর্যের মিশ্রণ। এই উক্তি ইতিহাসের বিচারে মান্য কিন্তু রসের বিচারে অমান্য। অবশ্য এমন রসবিভ্রাট অন্যত্র টেরাকোটা মন্দিরেও লক্ষণীয়।

৮ অবশ্য স্থির মহাবীর মূর্তিও শ্যামরায় মন্দিরে আছে বলে মনে হল। গর্ভগৃহের প্রবেশ পথের দেওয়ালে একটি দেখেছি। জোড় বাংলার অলিন্দেও বেশ কিছু বড় বড় নিকিরী দণ্ডায়মান যুক্তকর সাধু সন্ন্যাসী মূর্তি আছে, সেগুলি সৌন্দর্যহীন এবং টেরাকোটার ছন্দময়তা বর্জিত।

স্বর্ণমুখীর পঁচিশরত্ন

মন্দিরের চূড়াকে বলা হয় রত্ন। আর স্বর্ণমুখী দেবীর নামেই সোনামুখী শহরের নামকরণ। সোনামুখীর পঁচিশ রত্ন মন্দিরটির নাম শ্রীধর মন্দির। মন্দিরটি দেখতে দেখতে কেন মন্দিরতত্ত্ববিদ শ্রীযুক্ত অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় পঁচিশ রত্ন মন্দিরের প্রতি বীতরাগ প্রদর্শন করেছিলেন বোঝা যায়। তিনি লিখেছেন—

> "চূড়ার সংখ্যা অযথা বাড়িয়ে সমস্ত ইমারতটিকে কিছুটা জবরজং করে ফেলবার এই প্রবণতার অনুমানযোগ্য কারণ আছে। 'জবরজং' শব্দটি আমি ইচ্ছা করেই ব্যবহার করেছি। মন্দির স্থাপত্যে পরিমিত অঙ্গ-সন্নিবেশের মধ্য দিয়ে একটি চিত্তাকর্ষক রূপারোপে স্থপতিরা যখন অপারগ হন, তখনই অনাবশ্যক অলংকরণের সাহায্যে দর্শককে অভিভূত করবার প্রয়োজন দেখা দেয়। সাবেক স্থাপত্যরীতির অনাড়ম্বর লালিত্য (grace) যতই ম্লান হয়ে পড়ে ততই এজাতীয় চটকদার বাহুল্যের প্রবর্তন হয়ে থাকে।"[১]

সোনামুখীর শ্রীধর মন্দির দেখে এমন ক্ষোভ জাগা স্বাভাবিক। মন্দিরটি মাঝারি গড়নের। বর্ধমান জেলার অম্বিকা-কালনা শহরে আছে দুটি পঁচিশচূড়া মন্দির —লালজী মন্দির ও কৃষ্ণচন্দ্রের মন্দির এবং তারই কয়েক মাইল দূরে হুগলী জেলায় আনন্দভৈরবানী মন্দির আছে সুখরিয়া গ্রামে, এটিও পঁচিশ চূড়া মন্দির। এই তিনটি মন্দিরের যোগ এই যে এগুলি একই গঙ্গাপ্রান্তিক অঞ্চলে অবস্থিত এবং একই সময় পরিধির মধ্যে নির্মিত। বাঁকুড়ার মল্লরাজাদের মন্দির স্থাপত্যের পর শ্রীধর মন্দির দেখলে মনে হতেই পারে যে অনাবশ্যক বাহুল্যে

১ পৃঃ ১০৬, বাঁকুড়ার মন্দির, অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

মস্তকভাগে বহুসংখ্যক চূড়া যোগ করা হয়েছে। পঁচিশ চূড়া যে লালজী, কৃষ্ণচন্দ্র ও আনন্দ ভৈরবানীর মন্দিরের পক্ষে অনাবশ্যক বাহুল্য নয় সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। মন্দির তিনটি যেমনি বিশাল তেমনি স্থাপত্যশৈলীর অপূর্ব নিদর্শন বহন করেছে। লালজী মন্দিরের বিশালত্ব হতবাক করে দেয়, তার পঁচিশ চূড়ার সমাবেশকে শুধুই 'জবরজং' বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। অম্বিকা-কালনার রাজবাড়ীর চৌহদ্দীর মধ্যেকার প্রতাপেশ্বর শিবমন্দিরটির সুঠাম[২] একহারা গঠন ও টেরাকোটার শ্লোকগুলি দেখে যাঁদের মনে হবে অনবদ্য গীতিকবিতা[৩], তাঁরাই লালজী মন্দিরটিকে নিকট ও দূর থেকে বারবার দেখে ভাববেন—এটি মন্দির মহাকাব্যের এক অতুলনীয় উদাহরণ। মন্দির মস্তকের তিনটি তলে পঁচিশটি চূড়া সমাবেশেই নয়, মন্দিরের চারটি স্বাভাবিক কোণের জায়গায় বারোটি কোণ ও বারোটি 'মৃত্যুলতা', মন্দিরের সম্মুখ অলিন্দের সঙ্গে বিশাল নাটমণ্ডপ যুক্ত করে দেওয়া, প্রশস্ত গর্ভগৃহ, সুপ্রশস্ত অলিন্দ প্রভৃতি সুদক্ষ স্থাপত্যশৈলীর দাবী রাখে। লালজী মন্দিরটিকে অবশ্য উড়িষ্যার মন্দিরের জগমোহন সমন্বিত স্থাপত্যরীতির অনুকারক মনে হয়, মনে হয় সেই কারণেই যেন একটু এলায়িত। বিষ্ণুপুরের পাঁচচূড়া শ্যামরায় মন্দিরটিকেও আমাদের কিছুটা অসংযমী স্থাপত্যের উদাহরণ মনে হয়েছে[৪] যদিও তাতে চূড়ার বাহুল্য নেই এবং সম্মুখভাগে নাটমণ্ডপও যুক্ত নয়। কিন্তু অম্বিকা-কালনার তৃতীয় সর্বোত্তম[৫] মন্দির কৃষ্ণচন্দ্রের মন্দিরটি পঁচিশরত্ন মন্দির হলেও সুসংহত মন্দির। বিশালত্বের সঙ্গে এমন সুসংহতির যোগ দেখেছি সুখরিয়ার আনন্দভৈরবানী মন্দিরে। তবে আলোচ্য কৃষ্ণচন্দ্রের মন্দিরের সম্মুখলগ্ন দোচালা নাটমণ্ডপটির মতো কোন যুক্তমণ্ডপ আনন্দভৈরবানী মন্দির সম্মুখে নেই। বাংলা রীতির মন্দির স্থাপত্যের উদাহরণ ঐ অঞ্চলে ভাগীরথীর পশ্চিমকূলে কম নেই।

২ ঠিক একই গড়নের মন্দির সোনামুখীর শ্রীধর মন্দিরের সন্নিকটে চন্দ্রপাড়াতে আছে, এটিও শিবমন্দির।

৩ তবে পার্থক্যও আছে। প্রতাপেশ্বর শিবমন্দিরটি (অম্বিকা কালনা) উচ্চ ভিত্তিবেদীর উপর অবস্থিত। ১০৮ শিবমন্দির দেখে রাজবাড়ীর গেট দিয়ে প্রবেশ করেই মন্দিরটি বাম দিকে অবস্থিত দেখতে পাওয়া যাবে।

৪ পূর্ববর্তী 'টেরাকোটার কাব্য' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

৫ সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতাপেশ্বর শিবমন্দির, দ্বিতীয় লালজী, তৃতীয় কৃষ্ণচন্দ্র মন্দির—আমাদের মতে।

ঐ অঞ্চলের সোমড়া, সুখরিয়া, বলাগড়, শ্রীপুর, গুপ্তিপাড়া[৬], ত্রিবেণী, বাঁশবেড়িয়া প্রভৃতি স্থানের মন্দিরপ্রাচুর্য প্রমাণ করে যে 'চটকদার বাহুল্যের' জন্যই মন্দিরের পঁচিশচূড়া তৈরী করা হয়নি। তৈরী করা হয়েছে নবতর শিল্পসৌকর্য ও স্থাপত্যকলার উৎসাহে। নবতর উৎসাহের কারণ পাশ্চাত্য শিল্পকলার প্রভাব। ঐ অঞ্চলে গীর্জা ও মসজিদ বহুল সংখ্যায় গড়ে উঠেছে। এই প্রসঙ্গে একদিকে পাণ্ডুয়া অন্যদিকে ব্যাণ্ডেল চন্দননগর শ্রীরামপুরের স্থাপত্যকলার কথা মনে রাখতে হবে। হিন্দু দেবদেবীর জন্য নির্মিত বাংলা শৈলীর মন্দিরের সংখ্যাধিক নিদর্শন অম্বিকাকালনায় থাকা সত্ত্বেও[৭] বিদেশী স্থাপত্যপ্রভাব গ্রহণ করার উদারতার প্রমাণ হিসাবেই এই পঁচিশরত্ন মন্দিরগুলিকে শ্রদ্ধা করা ও ভালোবাসা উচিত। আলোচ্য মন্দিরগুলির চূড়াবিন্যাসে ত্রিতল বর্তমান, সোনামুখীর শ্রীধর মন্দিরে অবশ্য দ্বিতল। প্রতি তলে কোণে কোণে তিনটি করে বারো+বারো মোট চব্বিশটি চূড়া এবং মূল মধ্যচূড়াটি দ্বিতলের মধ্যভাগে অবস্থিত, তার জন্য আলাদা একটি তালবিন্যাস করা হয়নি।[৮]

অবশ্য শুধু স্থাপত্যের গরিমার দিক থেকে সোনামুখীর শ্রীধর মন্দির স্মরণীয় সৃষ্টি নয়। প্রথমেই বলেছি মাঝারি গড়নের এই মন্দিরটি সুখরিয়ার অম্বিকাকালনার তুলনায় নিতান্তই সাধারণ। মন্দিরটির ভিত্তিপীঠ ১৪/১৫ ফিট বর্গাকার ক্ষেত্রে অবস্থিত এবং উচ্চতা প্রায় ৩৪/৩৫ ফিট। মন্দিরটি অর্বাচীন কালে নির্মিত এবং যেসব মন্দিরের সঙ্গে তুলনা করেছি তাদের মধ্যে কনিষ্ঠতম (?)।[৯] শ্রীধর মন্দিরের পূর্বগাত্রে অর্থাৎ পশ্চাৎভাগে একটি লিপি-প্রস্তর আছে। তাতে দশ লাইনে যা লেখা আছে তার সব পড়া যায় না। তবু বোঝা গেল মন্দিরটি ১৭৬৭ শকাব্দে ও ১২৫২ বাংলা সনে প্রতিষ্ঠিত। ''শ্রীধর মন্দির······সম্পূর্ণ পঞ্চবিংশতি চূড়া···কানাঞি রুদ্র দাসেন তন্তুবায়েন

---

৬ গুপ্তিপাড়ায় দশনামী সম্প্রদায়ের মঠের এক অঙ্গনে তিনটি বিশাল মন্দির কার না বিস্ময় উদ্রেক করে?

৭ এখানে এক জায়গাতেই বৃত্তাকারে (দুটী বৃত্তে—৭৪+৩৪=১০৮) একশো আটটি শিবমন্দির আছে। আর আছে গঙ্গার ঘাটে ঘাটে দ্বাদশ শিবমন্দিরের সমাবেশ।

৮ তল বিন্যাসে অর্থাৎ সমতল ছাদ বিন্যাস করে পাশ্চাত্যরীতিতে মন্দির নির্মাণ যে কতদুর চল হয়েছিল ঐ অঞ্চলে তার প্রমাণ সুখরিয়ার নিস্তারিণী কালী ও হরসুন্দরী কালীমন্দির দুটি দেখলেও পাওয়া যায়।

৯ কৃষ্ণচন্দ্র ১১৫৯, আনন্দভৈরবানী ১২২০, শ্রীধর ১২৫২ সনে প্রতিষ্ঠিত।

যন্ত্তঃ নির্ম্মায়িত বরসৌধ নানাচিত্র সমন্বিত···ম্লেচ্ছাবনী···হরিসূত্রধরেণ বিনির্ম্মিত'—এইভাবে জানা গেল যে মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা কানাই রুদ্র দাস নামক একজন তন্তুবায় এবং স্থপতিকারের নাম হরি সূত্রধর। সূত্রধরের গ্রামের নাম ম্লেচ্ছাবানী (?)।

বিশেষভাবে লক্ষণীয় এই যে মন্দিরটি মাত্র একশ বত্রিশ বছর পূর্বে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।[১০] তখন বাঁকুড়ার মন্দির রেনেসাঁসের যুগ শেষ হয়ে গেছে বিষ্ণুপুরের মল্লরাজবংশের পতনের পর। মল্লরাজবংশ বাংলা শৈলীর মন্দিরের প্রতি সর্বাধিক অনুরাগ দেখিয়েছিলেন। বাঁকুড়ার রেখদেউলের স্থাপত্যনিদর্শনও কম নয়। বিষ্ণুপুরেও রেখদেউল আছে। কিন্তু সোনামুখীতে পঁচিশরত্ন মন্দির নির্মাণের মানসিকতা প্রতিষ্ঠাতা কানাই রুদ্র দাসের কি ভাবে তৈরী হল বোঝা যায় না। সোনামুখী বিষ্ণুপুরের প্রায় মাঝামাঝি স্থানে দ্বারকেশ্বর তীরবর্তী ধরাপাটের জৈন রেখদেউটির প্রভাবে পার্শ্ববর্তী পাত্রবাগড়া, পাইকপাড়া, জয়কৃষ্ণপুর প্রভৃতি গ্রামে অগণিত রেখদেউল মন্দিরমালা রচিত হয়েছে।[১১] কিন্তু শ্রীধর মন্দির রচিত হল কোন্ পঁচিশরত্ন মন্দিরের প্রভাবে? সুদূর অম্বিকাকালনা বা সুখরিয়া থেকে শিল্পীগোষ্ঠী কি সোনামুখীতে সাময়িক ভাবে আমন্ত্রিত হয়েছিলেন? এর উত্তর আমরা পাইনি।

নিন্দা থাক, সংশয় থাক, প্রশ্ন থাক। অথচ থাক বললেই নিন্দা থেমে থাকে না, কুণ্ঠা অবলুপ্ত হয় না। মন্দিরকে যে কিভাবে কতখানি অবহেলা করা যায় তার চরম উদাহরণ পেতে হলে শ্রীধর মন্দিরের সামনে আসতে হয়। বাজার পাড়ায় অবস্থিত এই মন্দির। বাজারপাড়ায় জমির প্রয়োজন ও মূল্য বড় বেশী। তাই মন্দিরের গাত্রসংলগ্ন ঘরবাড়ী উঠেছে, দালানকোঠা দোকান-পসরা তৈরী হয়েছে। প্রকৃতির হাতে মন্দির মার খাচ্ছে এ উদাহরণ সর্বত্র। সর্বত্র দেখেছি মন্দির ধ্বংস করতে বদ্ধপরিকর প্রকৃতির নীরব ষড়যন্ত্র। কিন্তু এও দেখেছি, হিন্দু দেবদেবীর শত্রু, হিন্দু দেবদেউলের সংহারক মামুদ, চেংগিস, ঔরংজীব, কালাপাহাড় নয়, সংহারক স্বয়ং হিন্দু দেবভক্ত, দেব-পূজারী, পৌত্তলিক হিন্দু। আলোচ্য শ্রীধর মন্দিরের গর্ভগৃহে অন্ধকার, শ্রীধর নেই। আছেন একটি ছোট শিলাখণ্ড, তিনিই পূজিত হচ্ছেন শ্রীধররূপে।

১০ আমরা মন্দিরটি দেখতে গিয়েছিলাম

১১ প্রবন্ধান্তরে আমরা বলবো ধরাপাটের প্রভাবে কেমন করে বাংলা শৈলীর মন্দির স্থাপত্য ঐ অঞ্চলে বিশেষ মর্যাদা পায়নি।

মন্দিরের সামনে দাঁড়াবার অপ্রশস্ত অঙ্গন, পিছনে ও পাশে যাবার উপায় নেই। পিছনে আধকাঠা জায়গায় বাগান—বাগানের দরজায় তালাবন্ধ। মন্দিরের উত্তরভাগ উঁকি দিয়ে আড়চোখে দেখতে হয়—সেদিকে কারা বাড়ী করেছেন, আধ হাত জায়গাও ফেলে রাখতে পারেন নি। দক্ষিণ দিক একটু ফাঁক কিন্তু প্রাচীর, গলি, দরজা প্রভৃতি গোলকধাঁধা নির্মাণ করেছে, সেদিকটাও সুস্থিরভাবে দেখা যায় না।

অথচ দেখবার মতো এ মন্দির। তাই উদবেজিত মনকে শান্ত করতে হবে, একাগ্র করতে হবে দৃষ্টিশক্তি। এই মাঝারি গড়নের মন্দিরটির চারদিকেই বড় মমতায়, সায়ত্ত নিপুণতায় পোড়ামাটির অলংকরণ করা হয়েছে। এত প্রাচুর্য এবং এমন অবিসংবাদিত চারুত্ব যে মনে হবে দেবরাজ ইন্দ্রের রথও বোধ হয় এত সুন্দর নয়। ভারতশিল্পজ্ঞানী প্রখ্যাত পণ্ডিতশিল্পী ও. সি. গাঙ্গুলী এই মন্দিরের ছবি তুলে আপন গ্রন্থে সন্নিবদ্ধ করে দেখিয়েছেন বিশ্ববাসীকে।[১২] দেখাবার মত সৌন্দর্যই বটে! বিষ্ণুপুরের বিখ্যাত মন্দিরগুলি দেখবার পরও, বহুলাড়ার জৈনমন্দিরের টেরাকোটার বিশেষ রীতির চমক মনে-প্রাণে গ্রহণ করার পরও, আলোচ্য শ্রীধর মন্দিরের অলংকরণ মুগ্ধ করবে। যে কোন কাজেই আসুন না, সোনামুখীতে এলে শ্রীধর মন্দির দেখতে ভুলবেন না।

এই মন্দিরগাত্রে সমাবেশিত মূর্তিমালার দুটি ধারা—একটি বড় গড়নের মূর্তিমালা, অন্যটি ছোট গড়নের মূর্তির সংখ্যাই সর্বাধিক। মূর্তিগুলি ছোট হতে হতে এত ছোট হয়েছে যে মাত্র ১/১ ইঞ্চি দৈর্ঘ-প্রস্থের টাইল সাজিয়ে মন্দিরগাত্র অলংকৃত হয়েছে। ছোটোর মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর টাইলগুলি অধিকাংশই 'মুখ'। শুধু মুখের, নর ও নারীমুখের সারিবদ্ধ সংযোজন 'হংসলতা'র মতো মন্দিরের পদভাগে এমন করে সাজানো আজও পর্যন্ত অন্য কোন মন্দিরে দেখিনি। ভারি ভালো লাগে দেখতে। এর থেকে একটু বড় গড়নের মূর্তিগুলি, দুই/দেড় ইঞ্চি গড়নের মূর্তিগুলি প্রায় সবই সৈনিকশ্রেণীর মূর্তি। সৈনিক দলের লম্বা লম্বা প্যানেল দিয়ে মন্দিরের তিন দিকেই নানা স্থান সজ্জিত। মন্দিরটিতে নিয়মানুযায়ী 'হংসলতা' নেই, কিন্তু 'মৃত্যুলতা' আছে।

অম্বিকাকালনার লালজী মন্দিরে বা আঁটপুরে (হুগলী) রাধাগোবিন্দজীর মন্দির বা দশঘরার (হুগলী) রাধাগোপীনাথ মন্দিরের মৃত্যুলতা যেমন চওড়া, সুগঠন ও সুগ্রথিত, শ্রীধর মন্দিরে তা নয়। মন্দিরের চারকোণে (লালজী

১২ বইটির নাম 'INDIAN TERRACOTTA ART.'

মন্দিরের বারো কোণে) ঝুলন্তভাবে 'মৃত্যুলতা' বিশেষ কারিগরী নিপুণতায় যুক্ত করা হয়, এখানে তা করা হয়নি। এখানে মন্দিরের সম্মুখ ভাগে ফুলকারি বা কল্পলতা কাজের সংযুক্তির মতো দু'পাশে বসানো। সম্মুখ ভাগের ত্রিখিলান স্তম্ভের দুপাশে। সাধারণভাবে যেমন অন্যান্য পোড়ামাটির টাইল মন্দির গাত্রে বসানো হয় সেইভাবেই বসানো হয়েছে।

আর একটি লক্ষণীয় বিষয়, এই মন্দির গাত্রে র.মরাবণের যুদ্ধদৃশ্য সম্বলিত মূর্তিমালা নেই। বাংলা মন্দিরের, এমন কি বাঁকুড়ার মন্দিরের ঐ চিরন্তন motif এই মন্দিরে বর্জিত হল কেন? তাছাড়া এই মন্দিরে টেরাকোটার উপাদান বৈচিত্র্যের মধ্যে কালীমূর্তির একাধিক সমাবেশ ঘটেছে। কালী দুর্গা জগদ্ধাত্রী ও দশমহাবিদ্যার অন্তর্গত অন্যান্য মূর্তি সমাবেশ লক্ষণীয় হয়ে উঠেছে। অনেকটা যেন আঁটপুরের (হুগলী) মন্দির ও দুর্গামণ্ডপের শক্তিমূর্তি নির্মাণের প্রবণতা এখানেও কাজ করেছে, তবে আঁটপুরের মূর্তিগুলির মতো সৌন্দর্যে অপরূপা নয়, শ্রীধর মন্দিরের শক্তিমূর্তিগুলি। আরও লক্ষণীয় যে পৌরাণিক বিচিত্র বিষয়ের প্রতি শ্রীধর মন্দিরের শিল্পীগোষ্ঠীর যত আগ্রহ ছিল, সামাজিক বিষয়ের প্রতি তার ভগ্নাংশ মাত্র অবশিষ্ট ছিল না। পুরাণ-আশ্রিত মধ্যযুগ সমসাময়িক বাস্তব বিষয়ের প্রতি কত তীক্ষ্ণ ও ব্যাপকভাবে যে আগ্রহান্বিত ছিল তার উদাহরণ মন্দিরে মন্দিরে নিরন্তর দেখেছি অথচ অর্বাচীনকালে রচিত, যে কাল বাস্তববাদী মনোভঙ্গি অর্জন করতে চলেছে[১৩]—এ মন্দির বাস্তবের দিকে মুখ ফিরিয়ে রইলো! এও বড় বিস্ময়। তবে মানবিক উপাদানের প্রতি এই মন্দিরশিল্পীরা যে অধিক আগ্রহী ছিলেন তার প্রমাণ পূর্বকথিত মুখের মুখর উপস্থিতির মধ্যে আছে।

রাম আশীর্বাদ করছেন প্রণত: হনুমানকে, বল্কলবসন ত্রিমুণি, অনন্তশয়ান বিষ্ণু তাঁর নাভিপদ্মে ব্রহ্মা, গরুড় বাহন বিষ্ণু, কার্ত্তিক-জননী দুর্গা ও মহাদেব, দশাবতার, দশমুণ্ড রাবণ, কৃষ্ণের গোবর্দ্ধন ধারণ, ত্রিমুণ্ড ব্রহ্মা প্রভৃতি পৌরাণিক মূর্ত্তিগুলি সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। হস্তী কোলে নিয়ে এক দেবতা পদ্মের উপর বসে আছেন (কোন্ দেবতা?) মন্দিরের পশ্চাৎ গাত্রে এবং এখানেই আছে নৌকায় নদী পার করে দিচ্ছে গুহক চাঁড়াল রাম-সীতা-লক্ষ্মণকে। এই

১৩. উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে মন্দিরটি নির্মিত হয়েছিল, উনবিংশ শতাব্দী বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি সাগ্রহে গ্রহণ করার মানসিকতায় দীক্ষা নিয়েছিল।

ধরণের মূর্তিগুলি তুলনামূলকভাবে সবই বড় আকারের ৮/১০/১২ ইঞ্চি পরিমাণ লম্বা।

মন্দিরের ত্রিখিলান সমন্বিত স্থাপত্যের আশ্চর্য উদাহরণ স্তম্ভগুলি। বিষ্ণুপুরের মন্দিরগুলির তুলনায় আলোচ্য মন্দিরটির স্তম্ভ মিনিয়েচার সাইজের কিন্তু দেখতে দেখতে মনে হয় এগুলির রঙ যদি পোড়ামাটির লাল রঙ না হত, তাহলে বলা যেত হাতীর দাঁতের সর্বশ্রেষ্ঠ কাজ। অসীম ধৈর্য ও নিষ্ঠায় এগুলি অলংকৃত হয়েছে। বিষ্ণুপুরের জোড়বাংলা বা শ্যামরায় মন্দিরের স্তম্ভগুলি ভারি ও মোটা ও ধনীগৃহিনীর মতো সুসজ্জিত। কিন্তু তৎসত্ত্বেও সেগুলি যে ভারবাহী সেকথা ভোলা যায় না। শ্রীধর মন্দিরের স্তম্ভগুলি সুন্দর সৌখীন আর ভারবাহী নয়। এই স্তম্ভগুলি ঘুরে ঘুরে দেখলে কত যে মনোরম চিত্র ও নকাশি কাজের পরিচয় পাওয়া যায় তার ঠিক নাই। মন্দির অলিন্দ ছোট, কিন্তু গর্ভগৃহে প্রবেশ দ্বারের দুপাশে দেওয়ালে পংখের কাজ এখন অনেকাংশে ম্লান হয়ে গেছে।

মন্দিরের টেরাকোটার কাজ এখনো অটুট আছে। নোনা ধরেছে এমন টাইল কচিৎ চোখে পড়েছে। কিন্তু দু'বছর আগে ঝড়ের প্রকোপে মন্দিরের মূল মধ্যরত্নটির পতাকাদণ্ড ও মস্তকভাগের কিছু অংশ ভেঙে গেছে। এটুকু সংস্কার করার দরকার। আর পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রত্নদির্শন সংরক্ষণ বিভাগ যদি এই মন্দিরটি সুরক্ষার ব্যবস্থা করেন তাহলে একটি অবশ্য করণীয় কাজ হবে বলে মনে করি এবং শহর সোনামুখীতে বহিরাগত দর্শক ও ভ্রমণকারীর একটি প্রিয় শিল্পবস্তুর সামনে এসে দাঁড়াবার সুযোগ পাবেন।[১৪]

১৪ বর্ধমান শহর থেকে বাসে করে সোনামুখী আসা যায়। দুর্গাপুর থেকেও বাস ঘুর পথে বেলিয়াতোড় হয়ে সোনামুখীতে আসে। তাছাড়া বাসে বিষ্ণুপুর থেকেও আসা যায় সোনামুখীতে।

১০

তিনটি জৈন মূর্তির রহস্য

প্রায় ত্রিকোণাকার বাঁকুড়া জেলাকে দুভাগে ভাগ করে প্রবাহিত হচ্ছে দ্বারকেশ্বর নদ। এই নদের জল এখন শুষ্ক, বর্ষায় সাময়িক প্লাবন নামে। একদিন এই নদীপথে বাঁকুড়া তথা মধ্য রাঢ় অঞ্চল আর্য অধ্যুষিত হয়েছিল জৈন-সাধক তীর্থংকরদের দ্বারা। সেইজন্য এই নদীপ্রান্তে এককালে তাঁদের ধর্ম পীঠস্থান প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এক্তেশ্বর, সোনাতোপল, বহুলাড়া, ধরাপাট, ডিহর প্রভৃতির দেবদেউলগুলি পর পর দেখলে বোঝা যাবে কোথাও স্থাপত্য নিদর্শনের মধ্যে, কোথাও বা দেবদেবীমূর্তির মাধ্যমে অতীত জৈন অধ্যুষণের চিহ্ন কেমন করে আজও বেঁচে আছে। তার থেকে বড় কথা এই স্থানগুলি এক মোহন রহস্যে আবৃত হয়ে আছে। ঐ দেবস্থানের অধিকাংশই হিন্দুধর্মের বিভিন্ন পর্বের দ্বারা সাঙ্গীকৃত হয়েছে। এই সাঙ্গীকরণের কাজে শিবের মহিমাই সর্বাধিক। বর্তমানে এক্তেশ্বর, বহুলাড়া ও ডিহর শিবমন্দির রূপে বিপুল গৌরবে অধিষ্ঠিত হয়ে আছে। কিন্তু সোনাতোপল জীর্ণ মুমূর্ষু এবং শূন্য, এটিকে কেউ বলেছেন জৈন মন্দির, কেউ বলেছেন সূর্যমন্দির, কেউ বলতে চান বৌদ্ধ মন্দির। ডিহর শৈলেশ্বর শিব মন্দির রূপে বহুল ভক্তমণ্ডলীকে আকর্ষণ করলেও বারবার মনে হয় এটিও জৈনদেরই অতীত কীর্তি। ধরাপাটের রেখদেউল আজও অটুট। কিন্তু গর্ভগৃহ শূন্য, তেমন করে ভক্তমণ্ডলীকে আকর্ষণ করে না। তবু এক নবতর রহস্য গড়ে উঠেছে এই দেউলটিকে ঘিরে। ধরাপাট বাঁকুড়া জেলার বিখ্যাত মন্দির ও দেউলগুলির সঙ্গে সরাসরি স্মরণীয়, আর আমাকে এই দেউলটির সৌন্দর্য যেমন আকর্ষণ করেছে তার থেকে বেশি আকর্ষণ করেছে তিনটি জৈনমূর্তিকে ঘিরে ত্রিস্তর রহস্য।

ধরাপাট যেতে হলে বিখ্যাত বিষ্ণুপুর থেকে বাসে জয়কৃষ্ণপুর স্টপেজে নেমে

পশ্চিমমুখী তিন মাইল হাঁটতে হবে। জিপ বা মোটর যাবার মত চওড়া লাল মোরাম কাঁকরের রাস্তা চলে গেছে বর্ধিষ্ণু গ্রাম অযোধ্যা পর্যন্ত। এই রাস্তাটির উপরেই বিখ্যাত ধরাপাটের রেখদেউল। একক ও নিঃসঙ্গ দেউল। দক্ষিণেই চোখে পড়বে দ্বারকেশ্বর নদীখাত। জয়কৃষ্ণপুর—ধরাপাটের পথে আসতে আসতে সংখ্যাতীত দেউল ও মন্দির চোখে পড়বে। মনে হবে ধরাপাট দেউলটির সন্তানসন্ততি যেন এই দেউল ও মন্দিরগুলি। সবই প্রায় শিব, না হলে রাধাকৃষ্ণ মন্দির। ক্বচিৎ মনসা মন্দির। অর্থাৎ বিষ্ণুপুর যেমন মন্দিরের ও টেরাকোটা সৌন্দর্যের এক বিশিষ্ট অঞ্চল তেমনি ধরাপাটকেন্দ্রিক এই মৌজাটিও দেউল বিন্যাসের আগ্রহে একটি বিশিষ্ট অঞ্চল সৃষ্টি করেছে।

স্থানটির নাম কেন ধরাপাট? সে উত্তরও জানা নেই। চৈতন্য পরিকরদের দ্বাদশ জনের নামে যে 'দ্বাদশপাট' তার মধ্যে এটি পড়ে না। এখানে মল্লভূমের বৈষ্ণব রাজাদের গুপ্ত বৃন্দাবন রচনার প্রভাব পড়েছিল। বিষ্ণুপুরের আশপাশের গ্রামগুলিকে নব নামকৃত করেছিলেন তাঁরা। সেই ভাবেই হয়তো ধরাপাট নামকরণ সম্ভব হয়েছে।

ধরাপাটের দেউলটির বর্তমান রূপ প্রমাণ করে যে এটি অর্বাচীন কালের। কিন্তু সঠিক প্রমাণ নেই। পাশের পুরানো কোন দেউল বা মন্দিরের ভগ্নাবশেষ এককালে স্পষ্ট ছিল, আজ আর নেই। কিন্তু ধরাপাটের দেউলটির গর্ভগৃহে প্রবেশদ্বার দুটি কেন? একটি দক্ষিণে, অন্যটি পশ্চিমে। এতাবৎকালে বাঁকুড়া, হুগলী, বর্ধমানে যত রেখদেউল দেখেছি তাদের মধ্যে কোনটিতে দুটি প্রবেশদ্বার দেখেছি বলে মনে পড়ে না। রেখদেউলের রথ পগ বিন্যাসেও ধরাপাট অভিনব, সরাসরি উড়িষ্যার দেউল স্থাপত্য রীতি অনুকরণ করেনি। এই ভাবে দেউলটি দেখতে দেখতে একটি রহস্যের আমেজ আসে মনের কোণে।

এখন দক্ষিণ দ্বারের সামনে দাঁড়িয়ে দেখুন। একটি শিলালিপি চোখে পড়বে। কি লেখা আছে শিলালিপিটিতে তা দেখার আগে শিলাটির আকৃতিটাই প্রশ্ন জাগাবে মনে। বর্গাকার বা আয়তাকার নয় শিলাটি। শিলাটির উপরের অংশ বর্গাকার ও নিচের অংশ আয়তাকার। মনে হবে, ভিন্ন ভিন্ন সময়ে একই শিলার উপর দুবার খোদাই করা হয়েছে লিপি। কি লেখা আছে লিপিটিতে? এই ভাবে লেখা আছে—

বি ক্র ম ব দে ...
স ক ১ ৩ ২ ৩
ম ল্ল ম হী পা ল
স কা ব্দা ১ ৩ ২...
....

শ্রী রাম	শ্রী মতি পুষ্প দেবী	শ্রী রাম
দে কামিনা	বৈষ্ণব শ্রী পরমানন্দ শর্ম্মণ	বিসাস

শিলালিপিটির উপরের অংশ যেন প্রাচীন কালে লেখা, এর অক্ষরগুলি ক্ষয়ে গেছে, অস্পষ্ট হয়ে গেছে। নীচের অংশ যেন অর্বাচীন কালে লেখা, অক্ষর অনেকাংশে অটুট আছে। দ্বিতীয় লাইনের শকাব্দ ১৩২৩ নিয়ে রহস্য ঘনীভূত হয়েছে। মন্দির তত্ত্ববিদ শ্রীঅমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর বাঁকুড়া বিষয়ক প্রথম বইটিতে পড়েছেন ১৬১৬ শক বা ১৬২৬ শক। দ্বিতীয় বই ইংরাজী বাঁকুড়া গেজেটিয়ারে ঐ একই শক পড়েছেন। কিন্তু তৃতীয় বই 'বাঁকুড়া জেলার পুরাকীর্তি' বইটিতে ১৫২৫ শক। বিস্ময়কর, এই পাঠ পরিবর্তনের কোন কারণ তিনি দেখান নি। তিনি হয়তো ইতিমধ্যে প্রকাশিত শ্রীবিনয় ঘোষের পশ্চিম-বঙ্গের সংস্কৃতি বইটির দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন। বিনয়বাবু ঐ শিলালিপিটিতে ১৫২৫ শক পড়েছেন। এবং তিনি ঐ সময়কালের সঙ্গে মল্লরাজ বীর হাম্বিরের রাজত্বকালের সময় মিলিয়ে দিতে পেরেছেন। ঐ শিলালিপিটির পঞ্চম লাইনে তাঁরা উভয়েই 'শ্রীহম্বির সিংহ' বাক্যটি পড়েছেন। যা আমরা পড়তে পারিনি। কেন ১৫২৫ শক বা 'শ্রী হম্বির সিংহ' পড়তে পারলাম না, সে রহস্য কে উদ্ঘাটন করবে! আমরা বিভিন্ন সময়ে তিনবার ঐ দেউল গাত্রের লিপিটি পড়তে গেছি, কিন্তু একবারও আমরা পূর্ববর্তী দুই মহাপণ্ডিতের দৃষ্টি পাইনি। তাছাড়া ঐ লিপির শেষ দু লাইনের 'রাম দে' বা 'রাম বিসাস' কি রকম বেমানান। প্রাচীনে, অর্বাচীনে, নবীনে এমন এক নিবিড় রহস্য গড়ে তুলেছে ঐ একটি মাত্র মন্দিরলিপি যা বহু মানুষকে ভাবিয়েছে এবং আরও ভাবাবে।

রহস্যের এখানে সূচনা মাত্র। রহস্যের প্রথম অঙ্ক বলা যায়। দেউলের পণ্ডিভাগে এবার দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে হবে। পশ্চিম, উত্তর গণ্ডিগাত্রে দুটি জৈন তীর্থংকর মূর্তি দেওয়ালের সঙ্গে গাঁথা আছে আর পূর্ব গণ্ডিগাত্রে গাঁথা আছে

একটি বিষ্ণু (বাসুদেব) মূর্তি। যে দেবদেউলের গর্ভগৃহে কোন মূর্তি নেই, তার বাইরের দেওয়ালে প্রমাণ সাইজের তিন তিনটি মূর্তি! একই দেউলে একই সঙ্গে জৈন ধর্ম ও ব্রাহ্মণ্য ধর্মের আধিপত্যের ইতিহাস!

দেউলের পশ্চিম দিকের গণ্ডি অংশে যে দিগম্বর মূর্তিটি আছে সেটি প্রায় ৫০ ইঞ্চি লম্বা এবং ২৫ ইঞ্চি চওড়া একটি ধূসর কালো পাথরের উপর নির্মিত। মূল মূর্তির পাভাগের দুপাশে আছে দুটি ১০/১২ ইঞ্চি আকারের দণ্ডায়মান মূর্তি। উভয়েরই ডান হাতে চামর। মূল মূর্তিটির দুপাশে আছে চার+চার মোট আটটি মূর্তি ও মুখ। মূল মূর্তির মাথার উপর আরও দুটি উড্ডীন মূর্তি। মূল মূর্তিটির পায়ের নিচে আছে কিছু কারুকার্য। মূল মূর্তিটি নগ্ন।

দেউলের উত্তর গাত্রে গণ্ডি অংশে আর একটি জৈন তীর্থংকর নগ্ন মূর্তি। এরই পায়ের নিচ দিয়ে প্রশস্ত লাল কাঁকরের (পূর্ব বর্ণিত) রাস্তা। বড় সুন্দর এই মূর্তিটি। কারণ এটি প্রায় প্রমাণ সাইজের, এর দীঘল কান, দীঘল চোখ, সৌষ্ঠব-সুন্দর অঙ্গ সংস্থান, আজানুলম্বিত সুললিত বাহুদ্বয়, তীক্ষ্ণ উন্নত নাসা, আত্মস্থ মুখমায়া, সুবলয়িত নগ্ন পদদ্বয় প্রভৃতির জীবন্ত সুগঠন সমস্ত পথচারীকে আজও আকৃষ্ট করে। যারা মিউজিয়মের চার দেওয়ালের আবছা আলো আঁধারে এই ধরণের মূর্তি দেখতে অভ্যস্ত তাঁরা একবার যদি এখানে আসেন, তাহলে বুঝতে পারবেন একটি মূর্তিকে তার যথার্থ সৌন্দর্যে দেখতে হলে এমন আকাশঢালা আলোর দরকার, এমনি আদিগন্ত বিস্তৃত পরিধি দরকার, দরকার এমনি নিবিড় নির্জন নীরবতা। যাই হোক, মূর্তিটি প্রায় ৮৫ ইঞ্চি লম্বা ও প্রায় ৩৫ ইঞ্চি চওড়া একটি ধূসর কালো পাথরের উপর নির্মিত। মূর্তিটির পায়ের নিচে পদ্ম, পদ্মের নিচে ষাঁড়, সিংহ ও দুটি ক্ষুদ্র নারীমূর্তি খোদিত আছে। প্রধান মূর্তিটির পাভাগের দু'পাশে দুটি চামরধারী দণ্ডায়মান ত্রিভঙ্গমূর্তি। প্রধান মূর্তির দেহের দুপাশে দু'সারিতে ছয় ছয় মোট বারোটি মূর্তির স্ল্যাব বর্তমান। প্রতি স্ল্যাবে আবার দুটি করে মূর্তি আছে। অর্থাৎ মোট চব্বিশটি মূর্তি ছয় ইঞ্চি গড়নের। মূল মূর্তির মতো এগুলিও দিগম্বর মূর্তি। পা: ভাগের চামরধারী মূর্তি দুটি দিগম্বর নয়, বসন আছে কটি দেশে। মূল বৃহৎ মূর্তিটির মাথার দুপাশে এখানেও দুটি উড্ডীন যক্ষযক্ষিণী মূর্তি। সমস্ত মূর্তিমালা ও মূর্তি-সজ্জা এখনও অটুট অভগ্ন অবস্থায় আছে। দীর্ঘ-পুরুষ তীর্থংকরের সমাহিত দৃষ্টি পথচারীদের মনে এখনো শান্তির সুস্থিতির স্পর্শ রাখছে।

এবার রহস্যের কথা বলি। দেউলের পূর্বদিকের গণ্ডিতে, অন্য দুটি জৈন-

মূর্তির মতো, তৃতীয় একটি জৈনমূর্তি নেই কেন? পূর্ব গণ্ডির কুলুঙ্গীতে কেন একটি বিষ্ণু-বাসুদেব মূর্তি! কারা, কবে, কি উদ্দেশ্যে বাসুদেব মূর্তিটি এখানে স্থাপন করলেন? এই বাসুদেব মূর্তির কুলুঙ্গীতে কি ধারণা মত একটি জৈন মূর্তি ছিল? যদি উত্তর হয় ছিল, তাহলে সেই মূর্তিটি কোথায় গেল?

প্রশ্ন ও প্রশ্নসম্ভব রহস্যের জটাজাল উন্মোচন করার আগে বিষ্ণুবাসুদেব মূর্তিটি ভালো করে দেখে নেওয়ার দরকার। বাসুদেব মূর্তিটি ৫০ ইঞ্চি লম্বা ও ২৬ ইঞ্চি চওড়া একটি বেলে পাথরের উপর নির্মিত। মূর্তিটি যেন জৈন মূর্তি দুটির অনুকরণে নির্মিত। অর্থাৎ পরবর্তীকালে রচিত। কিন্তু বাসুদেব মূর্তিটি অটুট নেই, হাঁটু ক্ষয়ে গেছে, পা ভাগের চামরধারির অনুকরণে রচিত বীণাবাদিনী মূর্তিটির বুক ভেঙে গেছে। বিষ্ণুবাসুদেব মূর্তিটির চারটি হাত, গলায় প্রলম্ব মালা ও উপবীত। বামদিকের নিচের হাতে শংখ আঁকা ও উপর হাতে চক্র। ডান দিকের নিচের হাতে পদ্ম আঁকা এবং উপর হাতে গদা। মূর্তিটির সর্বাঙ্গীণ গঠন সুচারু সৌন্দর্যমণ্ডিত নয়, নয় balanced. মূর্তিটি আদৌ ভক্তি জাগায় না। জাগায় প্রশ্ন।

ছন্দ ভঙ্গ করে মূর্তিটি এখানে এলো যদি, ছন্দরক্ষাকারী তৃতীয় জৈন মূর্তিটি কোথায় গেল? তৃতীয় মূর্তিটিকে দেউলের উত্তর প্রান্তে কাঁকরের লাল রাস্তার ওপারে রাখা হয়েছে, একটি সমতল ছাদ সাধারণ ভাবে কয়েক বছর আগে রচিত একটি ঘরের মধ্যে। এই ঘরটির নাম 'মনসামাড' অর্থাৎ মনসামণ্ডপ বা মনসামন্দির।

এইখানে এসে রহস্যের ঘনঘটা তৃতীয় অংক স্পর্শ করেছে। এই মনসা-মাড়ের মধ্যে জৈন মূর্তিটি মনসা রূপে পূজিত হচ্ছেন। পুংলিঙ্গ সমন্বিত একটি জৈন তীর্থংকর দিগম্বর মূর্তি মনসারূপে পূজিত হচ্ছেন কেন এবং কেমন করেই বা তা সম্ভব হচ্ছে! জৈন মূর্তিটির মাথায় সপ্ত সর্পফণার ছত্রবিন্যাস দেবী মনসার মাথার সর্পফণারূপে সহজেই স্বীকৃতি পেয়েছে। কিন্তু দুটি নিম্নমুখী লম্বিত হাতের ভোল, পদস্থাপনার ভঙ্গি, বক্ষদেশের সমতল সৌন্দর্য, মুখকান্তি ও কারু আজও বুঝিয়ে দিচ্ছে এটি তীর্থংকর মূর্তি। যদিও সুস্পষ্ট পুরুষলিঙ্গটি কবছর আগেও ছিল, এখন ভেঙে দেওয়া হয়েছে। মূর্তিটির বেদীতে অনেকগুলি 'বারিঘট' রীতিসম্মতভাবে সাজানো আছে। মাথার উপর দেওয়ালে লেখা আছে 'ওঁ মা'।

কিন্তু এইখানেই রহস্যের শেষ নয়। এই মূর্তিটির পাথর পূর্ববর্তী জৈন-

মূর্তি দুটির পাথরের মতো ধূসর কালো এবং বাসুদেব মূর্তিটির সঙ্গে মাপে এক হয়েই অবস্থিত। এই জৈনমূর্তিটিকেও কোন এক সময় বিষ্ণু-বাসুদেব মূর্তি করে তোলার চেষ্টা কার্যকরী হয়েছিল। মূল মূর্তিটির কাঁধের দুদিক থেকে দুটি হাত খোদাই করে বার করে দেওয়া হয়েছিল। খোদাই হাত দুটি আজও স্পষ্ট। মূল নিম্নমুখী প্রলম্বিত হাত দুটির পাতার দুপাশে বিষ্ণুচিহ্ন দুটি খুবই স্পষ্ট করে খোদাই করা। উত্তোলিত ও প্রলম্বিত চার হাতের ডান দিকে গদা ও শংখ, বাম দিকে চক্র ও পদ্ম বর্তমান। নিম্নমুখী প্রলম্বিত হাত দুটি পুষ্পমাল্য দিয়ে ঢাকা দেওয়া আছে। মূল মূর্তির পা ভাগের দুপাশে খোদাই করে দেওয়া হয়েছে সরস্বতী ও লক্ষ্মী।

তাহলে কি দাঁড়াচ্ছে? এই মূর্তিটি আদিতে ছিল দিগম্বর তীর্থংকর মূর্তি, তারপর তাঁকে করা হল বিষ্ণু-বাসুদেব। এখন তিনি হয়েছেন দেবী মনসা। শুধু ধর্মান্তর নয়, একেবারে লিঙ্গান্তর। আর অভিজাত দেবগোষ্ঠী থেকে লোকায়ত দেবীগোষ্ঠীতে অবতরণ।

শেষ অংকে আরও রহস্য! ধরাপাটের এই বিখ্যাত দেউলটির নাম কি? কি নামে এখানকার জনমণ্ডলী দেউলটিকে স্মরণ করে? স্থানীয় নরনারী বলেন 'ন্যাংটা শ্যামচাঁদের মন্দির'। এই দেউলের নাম শ্যামচাঁদের মন্দির কেন, শ্যামচাঁদ কেনই বা ন্যাংটা—এই বিস্ময়ের সূত্র অন্বেষণ করতে হলে এখানের অতীত ইতিহাসের আরও কয়েকটি পাতা ওল্টাতে হবে। রতন কবিরাজ রচিত 'মদনমোহন বন্দনা' নামক একটি পুঁথিতে বলা হয়েছে যে এখানে অম্বেষরাজ নামক একজন মল্লভূম রাজার (বিষ্ণুপুর) অধীনস্থ সামন্তরাজ এই দেউলে স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে রাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্তি স্থাপন করেছিলেন। বছর ১০/১২ আগে মূর্তি দুটি চুরি হয়ে গেছে। সেই থেকে দেউলটি শূন্য। ঐ শ্যামচাঁদের নামেই বৈষ্ণব অধ্যুষিত মল্লভূমের মানুষ দেউলটিকে শ্যামচাঁদের মন্দির বলতো। কিন্তু দেউল বর্তমানে শূন্য হলেও মানুষের ভক্তিভাবিত মন শূন্য থাকেনি। তারা দেউলগাত্রের উত্তরমুখী বৃহৎ জৈন তীর্থংকর মূর্তিটিকে আজ ন্যাংটা শ্যামচাঁদ রূপে পূজা করে। বন্ধ্যা নারীরা ঐ মূর্তিটির পায়ে সিঁদুর লেপন করে দিয়ে পুত্র কামনায় মানৎ করে। এই ভাবে লোকমানসের সহজ আবেগে শ্রদ্ধায়, পূর্বকথিত মনসার মত ঐ বৃহৎ জৈন মূর্তিটিও লোকায়ত দেবতায় পরিণত হয়েছে। দেউলটির চলিত নাম হয়েছে ন্যাংটা শ্যামচাঁদের মন্দির।

না আর রহস্যকথন নয়। এবার সামগ্রিক সৌন্দর্য দর্শন। ধরাপাটের রেখদেউলের গঠন সৌন্দর্য, তার আমলক কলস, তার পাশের সবুজ বকুলবৃক্ষ ও পুষ্করিণী, অপার উচ্চাবচ মাঠ, কাশ ও বেনা বন—সব মিলিয়ে যে সৌন্দর্যের নম্র রহস্যলেপ দান করে দর্শকের মনে তা আনন্দে আস্বাদনের যোগ্য। তাই ধরাপাট দর্শনার্থীর চরণচিহ্ন কামনা করে।

১১

বহুলাড়ার বিস্ময়

পায়ে পায়ে লাল ধুলোর চওড়া রাস্তা মাড়িয়ে চার মাইল হাঁটতে হল। পথ চলেছে এঁকে বেঁকে, কিন্তু মন্দিরের চূড়া দেখা যাচ্ছে না। কোথাও কোন মন্দিরের চিহ্ন মাত্র নেই। গাছের আড়ালে আড়ালে লুকিয়ে আছে কোথায় বহুলাড়ার[১] মন্দির কে জানে! হাওড়া-আদ্রা রেল পথের ওন্দা ষ্টেশন থেকে তিন মাইলের মতো পথ। আর কলকাতা-বাঁকুড়া বাসে এলে, ওন্দা বাসষ্ট্যাণ্ড থেকে আর একটু বেশী। বাসষ্ট্যাণ্ড থেকে রিক্‌সা পাওয়া যায়। পথ খারাপ বলে একটু বেশী ভাড়া চাইবে, যেতে আসতে ৮/১০ টাকা। তবু দরদাম করে রিক্‌সা নেওয়াই ভালো। আমরা রিক্‌সা না নিয়ে হেঁটে চলেছি। হাঁটতে হাঁটতে ক্লান্ত দেহে মনে অবশেষে একটি ভাঙা কুয়োতলায় আমগাছের ছায়ায় দাঁড়িয়েছি। শেষ চৈত্রের সূর্য ভয়ংকর জ্বলছে মাথার উপর। একটু জল, একটু বিশ্রাম দরকার। বেশ বড় সাইজের নক্‌শা-কাটা কাঁচের গ্লাসে করে এগিয়ে দেওয়া ঠাণ্ডা জল ঢক্ ঢক্ করে খেলাম। সঙ্গিনীর সাদা শাড়ীর নিম্নাংশে গেরুয়া রং ধরেছে ধুলোয়। সেই ধুলোর আস্তরে একবার চোখ পড়লো। কখন জানি না, চোখ তুলে তাকাই ধূসর গগনে এবং বুকের মধ্যে চকিতে বিপুল আলোড়ন জাগিয়ে চোখে পড়ে অদূরে মন্দিরের মাথায় রৌপ্য ঝলকিত নক্‌শা কাটা ত্রিশূল।

রইলো পড়ে জল খাওয়া, ছায়া আর বিশ্রাম, পায়ের চটি হাতে নিয়ে ছুট দিলাম সামনের দিকে। অপূর্ব, সুবিশাল, মন্দির দাঁড়িয়ে আছে উত্তুঙ্গ অবয়ব নিয়ে। মনে হল, বহুলাড়ার সিদ্ধেশ্বর মন্দির যিনি না দেখেছেন, বৃথা তাঁর সৌন্দর্য-তৃষিত দৃষ্টি। মনে মনে অভিজাত প্রণাম করলাম মন্দিরকে। দেবতার প্রতি ভক্তিতে নয়, হৃদয় জুড়ে আনন্দের যে সমুদ্র-উচ্ছ্বাস উঠলো তা ঐ মন্দিরের জন্য। আর মন্দির শিল্পীদের জন্য বিনীত বিস্ময়ে অভিভূত হল মন। সেদিন

১ স্থানীয় নাম 'বোল্যাড়া'। বিনয় ঘোষ লিখেছেন 'বাহুলাড়া'। আর অমিয় বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন—'বহুলাড়া'।

ছিল চৈত্র গাজনের মেলা। তখনও ভক্ত সমাগম জমজমাট হয়নি, তবু ব্রতচারী সন্ন্যাসীদের 'জয় বাবা সিদ্ধেশ্বরের সেবা লাগে মহাদেব' ধ্বনি উঠছে মাঝে মাঝে। দু-একজন সিক্ত বসনা নারী ভক্তা চিৎ হয়ে শুয়ে আছেন মন্দির সংলগ্ন বেদীতে। ধুনো পুড়ছেন তাঁরা। পেটের উপর রাখা মাটির সরায় আখের খুয়ার আগুন জ্বালিয়ে তাতে ধুনো ছিটোচ্ছে পুরোহিত। কোন কামনাময়ী নারী মানৎ করেছে শিবের কাছে, উপুড় হয়ে শুয়ে শুয়ে দণ্ডী কেটে আসছে দূর থেকে, মন্দিরের চারপাশে ঘুরছে। চারপাশে বড় বড় পুকুরের পাড়ে দোকান পাট বসেছে। পুকুরের পাড়ে, মন্দিরের বিস্তৃত মুক্ত প্রাঙ্গণে, বট, অশ্বত্থ, বেল, দেবদারু গাছের ছড়ানো ছিটানো অবস্থান।

পণ্ডিতেরা বলেছেন, এ মন্দির এক হাজার বছরের পুরানো, প্রায় দশম শতাব্দীতে নির্মিত। কেউ বা আরো দু'এক শতাব্দী কম বা বেশী বলেছেন।[২] এ মন্দির জৈন, বৌদ্ধ, না হিন্দু মন্দির স্থাপত্যের নিদর্শন, তা নিয়েও মতভেদ আছে। তবে মতভেদ নেই, এই মন্দিরের স্থাপত্যকলার অনবদ্য বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে। উড়িষ্যার রেখ-দেউলের ঘরানা অনুসরণ করে এই বিশালাকায় অথচ সুঠাম শরীর মন্দিরটি তৈরী হয়েছিল। বাঁকুড়ায় বাংলা মন্দির শৈলীর প্রাধান্য, কিন্তু বহুলাড়ার মন্দিরে ভারতীয় নাগর শৈলীর অনুসরণ। ইতিহাসের কোন এক নতুন ধারায় হাজার হাতের হাজার মনের সাধনায় এ মন্দির পরম নিষ্ঠা ও চাতুর্যের সঙ্গে সৃষ্টি হয়েছিল। পাতলা পোড়া ইঁট বসিয়ে পোড়া মাটির টালি কেটে কেটে ছন্দময় নিপুণ সজ্জায় গাঁথা হয়েছিল এর আকাশচুম্বী অবয়ব। তার উপরে করা হয়েছিল সাদা সিমেন্টের কারুকার্য। আজ সেই মহাকাব্যিক কারুকর্মের প্রায় ৬০ ভাগ নষ্ট হয়ে গেছে। অদূরে দাঁড়িয়ে বিহ্বল দৃষ্টিতে দেখতে দেখতে চোখ ফেটে জল আসে আনন্দে ও বেদনায়। আনন্দ—এমন অপরূপ সৃষ্টি চোখে দেখতে পাওয়ার সৌভাগ্যে, বেদনা—কালের হাতে সেই সৃষ্টি ধীরে ধীরে অবধারিত ভাবে নষ্ট হওয়ার জন্য।

প্রায় দশ ফুট উঁচু চৌকো সুপ্রশস্ত একটি ভূমিভাগের উপর মন্দিরটি প্রতিষ্ঠিত। মন্দিরটির চূড়া অর্থাৎ 'আমলক' ও 'কলস' অংশ ভেঙে গেছে, তাদের কোন চিহ্ন মন্দির চূড়ায় নেই। মন্দিরের মাথাটা তাই কাটা শশার মতো নেড়া। মন্দিরটির অবয়ব সংস্থান প্রধানতঃ পাঁচ ভাগে বিভক্ত।

২ দ্রঃ পৃ ১৩৮, বাঁকুড়ার মন্দির, অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৩৭১ এবং পৃ ১০৯, পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি, বিনয় ঘোষ, ১৩৬৩।

(এক) মন্দিরের ভিতের কাজে অর্থাৎ 'জাড্য' অংশে পাঁচটি রেখা, পাঁচটি পদ্মপাপড়ি যেন উর্ধ্বমুখে ফুটে আছে। টালি কেটে কেটে কার্ণিশের কাজ করে এই পাপড়ি-ধরণ সাজানো। (দুই) তার উপরের অংশ সমতল দেওয়ালের মতো কিছু কার্ণিশের কাজ সুঅলংকৃত। (তিন) তার উপরিভাগে আবার খাড়া দেওয়াল। (চার) খাড়া দেওয়াল শেষ হলে উর্ধ্বভাগে আবার অনেকগুলি কার্ণিশের কাজ। (পাঁচ) তার উপরের অংশ সুদীর্ঘ সুউচ্চ— এই অংশই মন্দিরের প্রধান অংশ। এই 'গণ্ডি' অংশের কাজ একক ছন্দের তানে বাঁধা। কিন্তু অফুরন্ত অলংকরণের সমাবেশে সফেন সমুদ্র তরঙ্গের সংহত রূপ ধরে রেখেছে যেন। 'বেঁকি', আমলক আর কলস অংশ ছিল তার উপরে, একেবারে চূড়ায়, যা লুপ্ত হয়ে গেছে। ভেঙ্গে না গেলে বলতাম মন্দিরটি প্রধানতঃ ছয় ভাগে বিভক্ত। অবশ্য পতাকাদণ্ড ত্রিশূলটি প্রোথিত আছে মাথার উপরে। এটি অর্বাচীন কালে দেওয়া হয়েছে, না হলে সূর্যরশ্মি প্রতিফলিত করে এত ঝকঝক করছে কেন? যত সহজে এই বর্ণনা পড়া যাবে, তত সহজ কারুকলায় গড়া নয় এ মন্দির। উড়িষ্যার রেখদেউল নির্মাণ পদ্ধতির পাঠ যিনি ভালো ভাবে নিয়েছেন তিনিই জানবেন উপর নীচে টানা রেখাগুলো কত কবিত্বময়, নির্মাণচাতুর্যের স্বাক্ষরে কত ঐশর্যময় এই মন্দির। তল পত্তন, পা ভাগ, বন্ধনা, বরণ্ড, বাঢ়, দেওয়ালের ভিতর দেওয়াল, রথ ও পগ প্রভৃতি সুসমঞ্জস ব্যবহারে বিশাল এই বস্তুপিণ্ডকে সৌন্দর্য-সফল চারুকলায় যাঁরা পরিণত করেছেন তাঁদের কথা ভাবতে ভাবতে আপনার মনে পড়বে খাজুরাহো ও কোনার্কের চিত্রকল্প।

মন্দিরের নিম্নভাগের ঘের ধীরে ধীরে উপরের দিকে কমে এসেছে শুক-নাসার মতো। পঞ্চরত্ন বা নবরত্ন বাংলা মন্দিরের অজস্র উদাহরণ যাঁরা বিষ্ণুপুরে বা অন্যত্র দেখে এসেছেন তাঁদের কাছে এই বহুলাড়া সিদ্ধেশ্বর মন্দিরের সামগ্রিক শিল্পরূপ এক অভিনবত্ব বহন করে আনবে। উড়িষ্যার রেখদেউলের পাথর নয়, বঙ্গভূমির মাটি পুড়িয়ে এই রসের আধান করা হয়েছে। টেরাকোটার কাহিনী নির্ভর মূর্তিমালার বিন্যাস এই মন্দির গাত্রে নেই বললেই হয়। তবে সাদা সিমেন্ট দিয়ে হারের মত নকশা, জাফরির মত অজস্র শিল্পকলা, পদ্মের পাপড়ির মতো বন্ধনা ও বরণ্ডের বিন্যাস দিয়ে গড়া এই মন্দির যে বাঁকুড়ার বাংলা চালের মন্দিরের আগের যুগের নিদর্শন সে বিষয়ে সন্দেহ নেই[৩]। মন্দিরের চূড়াটি যে কেমন ছিল

৩ বহুলাড়া মন্দিরের পূর্বে নির্মিত অন্য সব মন্দির প্রায় সবই লুপ্ত হয়ে গেছে। কিছু নিদর্শন জরাজীর্ণ হয়ে এখনো পড়ে আছে বাঁকুড়ায়।

তাও অনুমান করে নেওয়ার সুযোগ দেয় এই মন্দির গাত্রের কারুকাজ। মন্দির গাত্রের নিম্নভাগে কয়েকটি অঙ্গ শিখরের নিদর্শন আছে। এগুলিকে 'মিনিয়েচার' মন্দিরও বলা যায়। বাংলা মন্দিরের রত্ন বা চূড়ার অভাব এই অঙ্গ শিখরগুলি যেন পূরণ করতে চেয়েছে। মন্দিরের বহির্গাত্রে কয়েকটি কুলুঙ্গি আছে, তার মধ্যে একটি দুটিতে এখনও পোড়া মাটির মূর্তি গাঁথা আছে। অন্যগুলি থেকে খসে গেছে, না হলে সে কুলুঙ্গিগুলি ফাঁকা কেন? পূর্বে সুদীর্ঘ ফুল-মালা সাজানোর মতো হারের কথা বলেছি, তার সঙ্গে কিছু নারী ও পুরুষমূর্তি, নৃত্য-ভঙ্গিম পরী বা নভবিহারী গন্ধর্বমূর্তি আছে। মূর্তিগুলি ক্ষুদ্র কিন্তু সালংকার।

মন্দিরটির গর্ভগৃহে প্রবেশ করতে হলে প্রশস্ত উচ্চ অঙ্গন পার হতে হবে। তারপর কিছু ভগ্নগৃহ ও প্রাচীর। মনে হয় নাটগৃহ ছিল। মন্দিরগর্ভে প্রবেশের পথ মাত্র একটি। পথদ্বার খিলানযুক্ত। ছোট খিলানযুক্ত দ্বারটি পার হলে আর একটি দ্বার। তারপরেই গর্ভগৃহ। প্রায় সব শিবমন্দিরেই যেমন অপ্রশস্ত গর্ভগৃহ থাকে এখানেও তেমনি চতুষ্কোণ গর্ভগৃহ। গর্ভগৃহের ভেতর দেওয়ালে কোন কারুকাজ নেই। একদম সাদা সাধারণ দেওয়াল। পলেস্তারা খসে গেছে বহু স্থানে। গর্ভগৃহের মেঝেতে প্রোথিত শিবলিঙ্গ[8], একটু হেলানো যেন। প্রায় হাত খানেকের মতো মাথা তুলে আছে মেঝে থেকে। তার পিছনে দেওয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড় করানো আছে তিনটি কালো কষ্টি পাথরের অপূর্ব সুন্দর মূর্তি। ডান দিকে মহিষাসুরদলনী দুর্গা, মধ্যে মহাবীর পার্শ্বনাথ, বামপার্শ্বে সিদ্ধেশ্বর গণেশ। এতক্ষণ যাঁরা বাইরে দাঁড়িয়ে মন্দির অবয়ব দেখে মুগ্ধ হয়েছেন, এবার তাঁরাই আর একবার চকিত চমক অনুভব করবেন মূর্তি তিনটি দেখে। কতকাল ধরে এই মূর্তিত্রয় এখানে সস্মিত সৌন্দর্য নিয়ে বিরাজ করছে কে জানে! আজও পার্শ্বনাথ দাঁড়িয়ে আছেন দীঘল সুঠাম শরীরে, উন্নত মস্তক উঁচে তুলে। তাঁর পদদ্বয়ের কদলীকাণ্ডের মতো বর্তুলতা, তাঁর দেহপার্শ্বে সংস্থিত সুগঠন বাহু, তাঁর বলিষ্ঠ বাহুর সঙ্গে ছন্দ রেখে মাথায় কেশচূড়া সমন্বিত ধ্যানস্তিমিত দুটি চোখ আর শান্তশ্রী করুণাময় মুখ এক আশ্চর্য ব্যঞ্জনা এনেছে। তাঁর পুরুষ লিঙ্গ দেখা যাচ্ছে এবং মাথার উপর সংযুক্ত সপ্তফণাছত্র। এই প্রধান মূর্তিটির চারপাশে একই পাথরের উপর নানা ছোট ছোট মূর্তি খোদাই করা। পাশে সুকুমারী মহিষমর্দিনী দাঁড়িয়ে আছেন আর একটি পাথরের বুকে। দশ হাতে প্রহরণ-ধারিণীর যুদ্ধভঙ্গি, কিন্তু খুবই সহজ ভঙ্গি।

---

৪ মন্দির-প্রাঙ্গণে দুটি জায়গায় আরও দুটি শিবলিঙ্গ আছে।

মুখে স্মিত হাসি, মাথায় মুকুট নেই। তাঁর সিঁথিতে সিন্দুর লেপন করে দিচ্ছেন ভক্তিমতীরা এবং স্বয়ং পূজারী।[৫] দেবীর বাহন সিংহকে প্রায় দেখা যাচ্ছে না, এত ছোট। তবে মহিষ ও অসুর দুজনকেই বোঝা যাচ্ছে। কষ্টি পাথরকাটা তৈলচর্চিত গণেশের বিপুল মূর্তিটিও দর্শনীয়। এটি উপবেশনের মূর্তি, অন্য দুটির মতো দণ্ডায়মান নয়। পার্শ্বনাথ নিরাবরণ ও নিরাভরণ, কিন্তু দেবী দুর্গা ও গণদেবতা গণেশ উভয়েই অলংকারবাহুল্যে সমৃদ্ধ। স্থূলোদর, আনন্দিত, ভোজন পরায়ণ গণেশ, সুখ উপচে পড়ছে তাঁর সারা অঙ্গে। তিনটি মূর্তিই আলাদা আলাদা তিনটি পাথরের উপর খোদাই করা। তিনটি মূর্তিই যেন বলছে—'আমাকে আগে দেখ'।[৬]

নাম সিদ্ধেশ্বর শিবের মন্দির, কিন্তু এর মধ্যে পণ্ডিতেরা আবিষ্কার করেছেন তিন ধর্ম-সংস্কৃতির সমন্বয়। জৈন, বৌদ্ধ ও হিন্দু ধর্ম সংস্কৃতি। রাঢ় বঙ্গের অদূরে পরেশনাথ পাহাড়ের চূড়াগুলি ছিল জৈন সাধকদের সাধন পীঠ। সাধনায় সিদ্ধি-লাভ করে তাঁরা এককালে নেমে এসেছেন সমতল ভূমিতে। তাঁদের গমনা-গমনের পথ ছিল দ্বারকেশ্বর, কংসাবতী ও কুমারী নদীগুলির স্রোতপথ ও দুই কূল। তাই এই সব নদীতীরেই তাঁরা তাঁদের তীর্থক্ষেত্রগুলি গড়ে তুলেছিলেন মন্দির, স্তূপ, সংঘ। বহুলাড়া মন্দিরের অদূরে দ্বারকেশ্বর নদীখাত। মন্দিরের ভূমি-ভাগ দেখে অনুমান হয় যে নদী এককালে মন্দির পরিখিলগ্ন হয়ে প্রবাহিত হত। বন্যার প্রকোপ থেকে বাঁচবার জন্যই বুঝি মাটি ফেলে মন্দিরপীঠ এত উঁচু করা হয়েছিল। জৈন নিদর্শন হিসাবে মন্দিরের ভিতরের পার্শ্বনাথ মূর্তিটি যেমন সাক্ষ্য বহন করছে, তেমনি প্রত্নতাত্ত্বিক খননকার্য চালিয়ে আরও কিছু নিদর্শন পাওয়া গেছে। আজও বোঝা যায়, মন্দিরের চারপাশে এককালে সুউচ্চ প্রাচীর বেষ্টনী ছিল। এক পাশের ভগ্নস্তূপ খনন করে কয়েকটি জৈন স্তূপ আবিষ্কৃত হয়েছে। মন্দিরের ডান দিকে এই স্তূপগুলি যে জৈন সাধকদের সমাধি সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ হতে চেয়েছেন পণ্ডিতেরা। আর বহুলাড়া (বহুলাঢ়া) গ্রাম নামের 'লাঢ়' শব্দটি যে জৈন শাস্ত্র নির্দিষ্ট শব্দ তাও কেউ কেউ বলতে চেয়েছেন।

অবশ্য কেউ কেউ এখানের বৌদ্ধ-সংস্কৃতির নিদর্শনকে অঙ্গীকার করতে চেয়েছেন। কেউ বলেছেন, ঐ স্তূপগুলি অর্থাৎ ইটের গড়ন দেওয়া সমাধিগুলি

৫ পূজারত পুরোহিতের নাম মাণিকচন্দ্র গাঙ্গুলী, বাড়ী বহুলাড়া গ্রামেই।

৬ মন্দিরের ভিতরে আরও যা আছে—একটী মৃৎপ্রোথিত বিশালাকার ত্রিশূল, দেওয়ালে আছে তিনটি বাঁধানো পিকচার—ছোট সাইজের দেবদেবীর ছবি আছে তাতে।

বৌদ্ধ শ্রমণদের সমাধি।[৭] এগুলিকে 'শারীরিক চেতিয়' বলা হয়েছে। ঐ ইঁটের গোল, চৌকোণ[৮] কাটামোগুলির নিচে নাকি বৌদ্ধ শ্রমণদের দেহাভস্মাবশেষ আছে। তবে একথাও স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন অন্যান্য পণ্ডিত যে জৈন সাধকদের দেহ ভস্মাবশেষও এইভাবে মাটির মধ্যে প্রোথিত করার রীতি ছিল। যাই হোক, বাঁকুড়ার জৈন সংস্কৃতির উদাহরণ সংখ্যাতীত, তুলনায় বৌদ্ধ নিদর্শন অঙ্গুলিমেয়। নেই বলিলেই চলে। এই স্তূপগুলির মৃত্তিকানিম্নভাগ খোঁড়াখুঁড়ি করলে কি পাওয়া যাবে জানি না। উপরিভাগে বৌদ্ধ নিদর্শন কিছুই চোখে পড়ে না। এই মন্দির, ইতিহাসের নিয়মে হিন্দুদের অধিকারে এসেছে। অবশ্য কবে এসেছে সঠিক বলা যায় না। এখন মন্দিরের মধ্যে সিদ্ধেশ্বর শিব আছেন, সিদ্ধেশ্বর গণেশ আছেন, আর আছেন দেবী দুর্গা। জৈন ধর্ম আচারের কোন জীবন্ত নিদর্শন বর্তমানে বাঁকুড়ায় প্রায় নেই, এখানেও নেই। ধর্ম সমন্বয়ের, সংস্কৃতি সমন্বয়ের যে কৃতিত্ব হিন্দুধর্ম ও সংস্কৃতি অন্যত্র দেখিয়েছে, সেই কৃতিত্ব পাঠ এখানেও সহজে লাভ করা যায়। মহাবীর পার্শ্বনাথ সরাসরি বিষ্ণুরূপে পূজা পাচ্ছেন এমন প্রমাণ বহুলাড়ার মতো বাঁকুড়ার গ্রাম পথে পথে অনেক আছে। সংস্কৃতি সমন্বয়ের এই স্বরূপ ও চরিত্র রাঢ়বাংলা বাঁকুড়ার সংস্কৃতির দিগ্‌দর্শন। বহুলাড়া শুধু তীর্থক্ষেত্রই নয়, সমন্বয় ক্ষেত্রও। ইতিবেত্তার ক্রান্তিদর্শী আবেগে বলতে ইচ্ছা করে—'জয় বহুলাড়ার জয়'।

মন্দিরের সামনের চত্বরে দাঁড়িয়ে দূরদিগন্ত রেখায় দৃষ্টি নিবদ্ধ করে এবার আপনাকে ভাবতে হবে মন্দিরটির ভাগ্যের কথা। হাজার বছর পার হয়ে এলেও আর কতদিন এই সমুন্নত বিশালত্ব দাঁড়িয়ে থাকবে অভ্রংলেহী হয়ে? মন্দির চূড়ার আমলক কলস ভেঙেছে, অঙ্গের অলংকরণ খসেছে, ভিত্তি অংশের ইঁটে নোনা ধরেছে—গভীর হচ্ছে ক্ষত, কার্ণিশের কিছু অংশও ভেঙে গেছে, মাথায় গাছ গজিয়েছে,গর্ভগৃহের ভিতর দেওয়ালের চুণবালির আস্তরণ খসে খসে গেছে। ধূলি বাতাসের অন্ধবেগ ঝড়ে, শিলাবৃষ্টি ও বৃষ্টিধারায়, বজ্র পতনের আক্রোশে, প্রখর রৌদ্রের নির্মমতার মধ্যে কতদিন আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারবে এ মন্দির? বিষ্ণুপুরের বিধ্বস্ত মন্দিরগুলি এবং সোনাতোপলের জরাজীর্ণ দেউলের কালদষ্ট কংকাল যাঁরা দেখে এসেছেন, তাঁদের বুকে ভয় জমবে। ভয়ের ভাষা কানে কানে বলবে—অচিরে একদিন এ মন্দিরও ধ্বংস হয়ে যাবে। আর আমরা নীরব উপেক্ষায়

৭. মন্দিরের ভিত-এর পাশেই ২৫টিরও বেশী সমাধি পীঠ।

৮. এর মধ্যে একটির গড়ন বেশ বড় সাইজের খড়মের মতো।

পথ হাঁটবো পাশের রাস্তা দিয়ে। অত দূরের উদাহরণ তুলতে হবে কেন! এই সিদ্ধেশ্বর মন্দিরের চারপাশ ঘিরে উচ্চ প্রাচীর ছিল, ছিল এই মন্দিরের আগে আরও একটি বড় মন্দির, অন্য পাশে আটটি উপমন্দির এবং ভোগের দালান, গর্ভমূলের পুরোভাগে ছিল নাটগৃহ, সব নষ্ট হয়ে গেছে—মাটির সঙ্গে হয়েছে মাটি।

আপনি যত নিস্পৃহ দর্শকই হোন না কেন, আপনার মনে অবশ্যই প্রশ্ন জাগবে—কেমন করে রক্ষা পাবে এই শিল্প-সুমহান ঐতিহ্য, হাজার বছর ধরে দাঁড়িয়ে থাকা এই সুন্দর বৃদ্ধকে কে রক্ষা করবে?

চারপাশে হতশ্রী গ্রামের মাঝখানে এমন একটা মন্দির দেখতে পেলে তাই বিস্ময়ের বাণী করুণ কান্নায় পরিণত হয়। এঁরা—এই তিলি, সদগোপ, খয়রা, ধীবর, কায়স্থ, ব্রাহ্মণ, নায়েক গ্রামবাসীরা প্রণাম করেন দেবতাকে, শিবের কাছে বর চান সন্তান জন্মের, ধন ঐশ্বর্যের, শত্রু নাশনের। কুমারী কন্যা গ্রামীণ মাধুর্যে পূর্ণ হয়ে, সখীর কাঁধে হাত রেখে, নবযৌবনের ভারে দুলতে দুলতে শিবকে কত কথা বলতে আসে প্রিয়জন ও প্রেমিকজন সম্পর্কে। ওপাশে সন্ন্যাসীর আখড়া থেকে চুপিসার রাতে গঞ্জিকার ধোঁয়া ওঠে তন্ত্রবিভূতির আবেশে। কিন্তু কেউ কি এই সিদ্ধেশ্বর শিবের কাছে প্রার্থনা করে—"তোমার দেউল এই মন্দির-সৌন্দর্যকে রক্ষা কর ঠাকুর, রক্ষা কর!"

কেউ করে না।

আপনি পথশ্রমী পথিক, বিষ্ণুপুরে এলে বহুলাড়া যেতে ভুলবেন না। আর যদি প্রণাম নিবেদন করেন সৌন্দর্য-দেবতার কাছে, দয়া করে, মনে মনে প্রার্থনা করবেন—"তোমার অস্তিত্ব অটুট রেখো, হে কালের প্রহরী, বিদিশা বেবিলনের মতো যেন না হারিয়ে যায় এই বহুলাড়া!"

১২
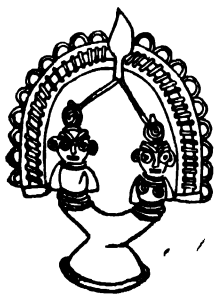
একটি মৃত মন্দির

মন্দির দেখা আমার কাছে এক অপার আনন্দের ব্যাপার। কর্মের অবকাশ পেলেই, সংসারের কর্ত্তব্যের ফাঁক দেখলেই ছুটে গেছি, দূর নিকট কোন না কোন মন্দিরের পাদদেশে। মন্দিরে যে দেবতাকে প্রণাম করার সুযোগ হয়! ভক্তির দেবতা, সৌন্দর্যের দেবতা। ভক্তের ভগবান থাকেন মন্দিরের মধ্যে গর্ভগৃহে, সৌন্দর্যের দেবতা থাকেন মন্দিরের অঙ্গে অঙ্গে, অলিন্দে খিলানে স্তম্ভে চূড়ায়, মন্দিরের পার্শ্বগাত্রে, মন্দিরের পা-ভাগে, গণ্ডিতে বাঢ়ে মস্তকে। অজস্র টেরাকোটা মূর্তিতে, মন্দিরের স্থাপত্য কলার বৈশিষ্ট্যে ও বৈচিত্র্যে। প্রেয়সীর মুখে দৃষ্টি রাখার মতো পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে দেখি মন্দির, আনন্দ পাই, স্মৃতিতে সঞ্চিত করি সেই আনন্দরেণু। মন্দির বোবা নয়, মন্দির যে কথা কয়। তাই একটি মহান মন্দিরের পাঠ মহাকাব্য পাঠের মতো কত না অলংকার ছন্দ ধ্বনি শব্দ অর্থের সুষমায় ভরা।

কিন্তু জানতাম না মন্দির দর্শনে এত বেদনা আছে। বাঁকুড়া শহর থেকে ৫/৬ মাইল দূরবর্তী দ্বারকেশ্বর নদের তীরে দাঁড়িয়ে থাকা একটি সুপ্রাচীন মন্দির দেখতে গিয়ে প্রথম দর্শনেই যে দুঃখের বেদনার আঘাত বুকের মধ্যে অনুভব করি তার চিহ্ন আজ কবছর পরেও মুছে ফেলতে পারিনি। মন্দিরটি একক ও সুবিশাল। চারিদিকে ধানক্ষেত, পান বরোজ, 'চকচকিয়া' দীঘি প্রভৃতি। শীতের কুয়াশা জড়ানো সকাল। আমরা কংসাবতী ফিডিং ক্যানেলের পাড় ধরে হাঁটছি উত্তর মুখে। মালাতোড-বালিয়াড়া গ্রামের রাধাশ্যাম রাসমঞ্চ পার হয়ে ঢুকলাম সোনাতোপল গ্রামের দক্ষিণদিকের মাঝিপাড়ায়। ঘরে ঘরে সকালের নরম রোদকে চমকে দিয়ে ঢেঁকির পাড পড়ছে, চিঁড়ে কোটা হচ্ছে। পাড়ার ঘন বাঁশবনটা পার হতেই বড বেদনাদায়ক দৃশ্য চোখে পডলো। চোখে পড়লো সোনাতোপলের দেউল। থমকে দাঁড়ানো ছাড়া উপায় ছিল না। শরীরের

মধ্যেকার চলৎশক্তি···যেন এক মূহুর্ত্তে কে শোষণ করে নিয়েছে। এটা দেউল, মন্দির নয়। সুবিশাল ও সুউচ্চ। কিন্তু মস্তক ও পা-ভাগ ক্ষয়ে গেছে, ধসে গেছে, তাই দেখাচ্ছে যেন এক বিশাল 'মাকু' দাঁড়িয়ে আছে। এখনও প্রায় ৫০/৫৫ ফুট উঁচু।

এই মন্দিরটি যে কত প্রাচীন ও কত গরিমাময় ছিল তা বোঝা যাবে কয়েক মাইল দূরের বহুলাড়ার সিদ্ধেশ্বর শিবমন্দিরটি দেখলে ও উভয় মন্দিরের তুলনা করলে। সিদ্ধেশ্বর শিবমন্দিরটিও দেউলরীতির এবং ইঁটের তৈরী, হাজার বছরের প্রাচীন। সোনাতোপল মন্দিরটি দেউল এবং ইঁটের তৈরী। তবে এই মন্দিরটি চরম অবহেলিত, গর্ভগৃহে কোন মূর্তি বা দেবদেবী নেই। সম্পূর্ণ শূন্য গর্ভগৃহের মাপ বাইরের দিকে ২৫ ফুটের মতো অর্থাৎ মন্দিরের বেড় ২৫/২৫ ফুট, এটি বর্গাকার। গর্ভগৃহের ভেতরের মাপ ১২/১২ ফুট। ভেতরের অংশও বর্গাকার। দেওয়াল অভাবিত রকম মোটা। ধসে ধসে পড়ে গেছে তবু বোঝা যায় দেওয়াল পা-ভাগের দিকে মোটা প্রায় ৪½ ফুটের মতো, প্রধানতঃ দু ধরণের ইটের প্রাধান্য, যদিও ভাল করে দেখলে দেখা যাবে ইঁট ব্যবহৃত হয়েছে চার রকম গড়নের। খেজুরা ও তালি ইঁটেরই প্রাধান্য, আর গাঁথনির কাজে কোন চুন-বালি সুরকির মশলা ব্যবহৃত হয়নি, সম্পূর্ণ কাদার গাঁথনি অর্থাৎ গ্যারার গাঁথনির মন্দির এই সোনাতোপল। কাদার গাঁথনি দিয়ে কোন সৌধকে যে হাজার বছরের আয়ু দেওয়া যায়—এই বিস্ময়ই সোনাতোপলের প্রধান বিস্ময়।

এটি জৈন মন্দির না বুদ্ধ মন্দির না শিবমন্দির না সূর্যমন্দির তা নিয়ে নানা মতভেদ আছে। মন্দিরটির একটিই খাঁজ-কাটা অদ্ভুত গড়নের প্রবেশ দ্বার। ১৩টি খাঁজ এখনো দেখা যাচ্ছে। পূর্ব্বমুখী মন্দির বলে এটিকে সূর্যমন্দির বলা হয়েছে। বলা হয়েছে কয়েক বছর আগে মন্দিরের সামনের মাটি খুড়ে একটি সূর্যমূর্তি আবিষ্কৃত হয়েছিল এবং অদূরবর্তী (২ মাইল পূর্বে) বীরসিংহ গ্রামে সূর্যপূজারী ব্রাহ্মণদের বাস ছিল, তাঁদের বলা হত 'দৈবক'। তাঁরা কোষ্টি ইত্যাদি গণনা করতেন, তাঁরা ছিলেন 'শাকদ্বীপীয় ব্রাহ্মণ' (পণ্ডিতদের মতে) অর্থাৎ সূর্য-পূজারী। এবং 'সোনাতোপল' শব্দটি এসেছে 'স্বর্ণতপন' শব্দটি থেকেই[১], মন্দিরের সোনার সূর্যমূর্তি পূজিত হত আদিকালে। এইসব সূত্রে এটিকে সূর্যমন্দির বলা

১. কিন্তু স্থানীয় প্রবীণ ব্যক্তিরা 'সোনাতোপল' নামের দুটি ব্যাখ্যা দিয়েছেন। (১) এখানে খুব ভালো ফসল হয় বলে নাম সোনাতোপল। (২) গোপদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত গ্রামদেবী 'সোনাসিনি'র নামানুসারে গ্রামের নাম সোনাতোপল। যুক্তি দুটি অনুধাবনযোগ্য।

হয়েছে। কেউ কেউ বলেছেন এটি বুদ্ধমন্দির বা শিবমন্দির। স্থানীয় গ্রামবাসী-দের মধ্যে এই দুটি মতই বেশী প্রচলিত। প্রায় ৭০ বছরের বৃদ্ধ স্থানীয় গ্রামবাসী রামরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় বললেন, মন্দিরটি বুদ্ধ মন্দির, অশোকের সময় নির্মিত। গ্রামের পশ্চিম প্রান্তে পলাশতলায় 'সোনাসিনি'র থান। সেখানে একটি ৭/৮ ইঞ্চির মত পাথরের মুখ শোওয়ানো আছে, এ কি বুদ্ধ মূর্তির মুখ? আর একটি মুখ ২/২ ইঞ্চির মতো, কিন্তু কিসের মুখ বোঝা যায় না। স্থানীয় গ্রামবাসীরা আরও বললেন ঐ সোনাসিনি থানে একটি ধাতুমূর্তি ছিল, ৪ ইঞ্চির মতো, সম্ভবত বুদ্ধ (মহাবীর) মূর্তি—মাথার চুল চূড়া করে বাঁধা, দুই হাত নীচের দিকে নামানো, এক পা ভাঙা, পায়ের পাতা খালি। মূর্তিটি কয়েক বছর আগে চুরি হয়ে গেছে দেউলটি যে শিবমন্দির সে বিষয়েও কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে। সোনাতোপল দেউল যে শিবমন্দির সে বিষয়ের এই দাবী খুব প্রাচীন নয় অর্বাচীন কালের অবশ্য এখানে শিবলিঙ্গ বা শিবমূর্তি নেই। দেউল থেকে দূরে সোনাসিনি থানের পাশে আঁকড় ও খ্যাওড়াতলায় আছে ক্ষয়প্রাপ্ত একটি শিবলিঙ্গ ও যোনিপট্ট। তার পাশে আছে বেলে পাথরের একটি ভগ্ন মূর্তি, মনে হয় বিষ্ণুমূর্তি—ডান উর্ধ্ব হাতের গদাটা দেখা যাচ্ছে। সোনাতোপলের প্রধান দেউলটির সামনে থেকেও শিবমূর্তি বার হতে পারে ১০/১২ হাত খুঁড়লেই—এই বিশ্বাস স্থানীয় লোকেদের। কিছুদিন আগে 'বাগাল' (রাখাল) ছেলেরা দুটী শিবলিঙ্গ কুড়িয়ে পেয়েছিল। আরও বিশ্বাস বা কিম্বদন্তী যে মূল মন্দিরের ভিতর একটি পিতলের শিব ছিল। পূজারী সাধু মণিমাণিক্যের লোভে রোজ রাত্রে সেই শিব মূর্তিটিকে কাটতো। শিব যন্ত্রণায় কাঁদতো। কান্না শুনে ছুটে আসতো সাহসী লোকজন। তারা এলে দেখতো সাধু কাঁদছে। এটা দুষ্টু সাধুটার দুষ্টুমি। তারপর একদিন শিব চক-চকিয়াতে অর্থাৎ পাশের দীঘিতে ঝাঁপ দেয়। আরও শোনা যায় এটি ছিল শালিবাহন রাজার গড়। এর পূর্ব নাম ছিল 'হামির ডাঙা'. কিন্তু কোন সন্দেহাতীত ভাবে সুস্থির সিদ্ধান্ত নয়। মন্দিরটির বহির্ভাগে এখনও কি দেখতে পাওয়া যায় সে দিকে দৃষ্টি দেওয়া যাক। মন্দিরটির চূড়ায় কি ছিল, আমলক কলস দণ্ড ছিল কিনা আজ আর জানা যায় না। তবে রথ ও পগ চিহ্ন যেন এখনও বোঝা যায়। মন্দিরের পশ্চাৎভাগ আগেই ধসে পড়েছে। বর্ষার ঝড়ে এখনও ধসে ধসে পড়ছে মন্দিরের চতুর্গাত্রের সব অংশ থেকেই। তবু দেখা যায় মন্দিরের বহির্ভাগে ঈশান কোণে একটি উপবিষ্ট মূর্তি। ৬/১২ ইঞ্চির মতো। পদ্মাসনে বসা, মাথা উচু, ডান হাত ডান হাঁটুর উপর ন্যস্ত। চুনবালির পলেস্তারায় গঠিত

এই মূর্তিটিকে দেখে কেউ উল্লসিত হয়ে বলেছেন এটি বুদ্ধমূর্তি বা জৈন মহাবীর মূর্তি। কিন্তু তা নয়। আমরা ডিহরের অর্ধভগ্ন পাথরের দেউল দুটি দেখতে গিয়েছিলাম, ওখানের দেউল গাত্রের কোণে কোণে এমন মূর্তি অনেক। এগুলি কার্নিসের কারুকাজ, উপরের কৌণিক ভার বহন করার জন্য তৈরী। তাই সোনাতোপল মন্দিরের ঐ ঈশান কোণের মূর্তিটিকে দেখে দেউলটিকে বৌদ্ধ বা জৈন দেউল বলা বোকামির নামান্তর। দেউলগাত্রের পলেস্তারার নকশা যেন বহুলাড়া মন্দিরের নকশার মতো ছিল মনে হয়। মন্দিরের উত্তর গায়ে হংস-মূর্তিমালা ছিল, ২/১টি হাঁস এখনো দেখা যাচ্ছে। দুপাশে দুটি হাঁস মাঝখানে ঘট—এই রকম প্যানেল উপর থেকে নীচ পর্যন্ত। মন্দিরের প্রবেশ দ্বারের মাথার উপর বাম ভাগে ছিল একটি বৃহৎ হনুমান, এখনও যার লেজটী (?) দেখা যাচ্ছে। আর আছে একটি পদ্ম।

বর্তমানে এই যা দেখা যায়। কিন্তু বেগলার সাহেব বলেছেন, এটির ছিল 'চারটি চাল (?) আর ছিল পদ্মের প্রলেপে আবৃত প্রভূত ও উৎকৃষ্ট অলংকরণ'। এখন সেসব কিছুই নেই। তবে স্থানীয় লোকেরা বলেছেন—মন্দিরের উত্তর গায়ে একটি প্রমাণ সাইজের মূর্তি ছিল, বসা মূর্তি, বুদ্ধমূর্তি। কেউ কেউ বললেন—মন্দিরের গায়ে দীর্ঘ দীর্ঘ সূর্যরশ্মির মতো অলংকরণ ছিল। গদা হাতে চার পাঁচটী চতুর্ভুজ মূর্তিও ছিল। ঘট ও কলাগাছের খুব বড় নকশাও কেউ কেউ দেখেছেন। এই মন্দিরটির সামনে আর একটি মন্দির ছিল, যার ভগ্নস্তূপ এখন 'ভাঙা দেউলের ঢিবি' নামে খ্যাত। যাই হোক, সোনাতোপলের মন্দির এখন সব দিক দিয়েই মৃত মন্দির। এই মন্দিরটির সংস্কারের ইচ্ছা ও চেষ্টা নাকি চলছে। কিন্তু মৃত মন্দিরকে সংস্কার করে লাভ কি? সোনাতোপলের অতীত জীবনের সৌন্দর্য তো আর কোন ভাবেই ফিরে পাওয়া যাবে না!